



সাইয়িদা ফাতিমা বিনতে খলীল ফিরে এসো নীড়ে

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

প্রকাশনায় রাহনুমা প্রকাশনী [™]

www.QuranerAlo.net

ফিরে এসো নীড়ে

মূল : সাই

প্রচ্ছদ

: সাইয়িদা ফাতিমা বিনতে খলীল

তৃতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১৮ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

অনুবাদ : শফিকুল ইসলাম

: মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ : শাহারিয়ার প্রিনি

: শাহারিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০।

একমাত্র পরিবেশক : রাহনুমা প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আভার্ঘাউভ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য: 88০/- (চারশো চল্লিশ টাকা মাত্র)

FIRE ESO NEERE

Writer: Fatima Binte Khalil. Published by: Rahnuma Prokashoni. Price: Tk. 440.00, US 5 15.00 only.

ISBN: 978-984-92211-8-0

www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

আমার বুবুকে, আমার মায়ের পরই যার স্থান;
কুরআন ও সুন্নাহর আলোছায়া
তাঁর জীবনকে রাখুক
আলোকিত ও ছায়াময়—সবসময়।
শঞ্চিকুল ইসলাম

অনুবাদকের কথা

আল্লাহর শোকর, হৃদয়ে মৃদু পুলক অনুভব করছি; মনে হচ্ছে, মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে বাংলাভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাকে একটি ভালো বই উপহার দিতে পারছি; আল্লাহ করুন সত্যিই যেন তা হয়। বইটি প্রখ্যাত আরবলেখিকা ও দাঈয়া সাইয়িদা ফাতিমা বিনতে খলীল মুহামাদ মুহসিন রচিত দাওরুল মারআতিল মুসলিমাহ বাইনাল আসালাহ ওয়াল মুআসারাহ-এর বাংলা অনুবাদ। সঙ্গত কারণেই অনুদিত গ্রন্থের নাম দিলাম—ফিরে এসো নীড়ে।

মূল আরবী বইটি আরব্য গ্রন্থসমুদ্রে অমূল্য রত্ন—
মাকতাবা শামেলা, সয়দুল ফাওয়াইদ-সহ আরবিশ্বের
অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থশালায় উজ্জ্বল হয়ে আছে
আপন মহিমায়। বিশ্বখ্যাত মক্কা উম্মূল কোরা
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধতম গ্রন্থশালা মাকতাবাতু ড. খলীল
হুদারীরও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা এই বই। বিশ্বের অন্যান্য
ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, নারীদের বিষয়ে একজন নারীরই লেখা। যেন প্রিয় বোনের প্রতি প্রিয় বোনের উপদেশ এবং প্রিয় বোনের পক্ষে প্রিয় বোনের ওকালতি—যে তাদের মন বোঝে, প্রয়োজন বোঝে। যার অকৃত্রিম আন্তরিক উপদেশে নারী পাবেন একজন আদর্শ স্ত্রী, একজন আদর্শ মা, সমাজের একটি অংশের যোগ্য প্রতিনিধি এবং অপর অংশের সফল কারিগর; সর্বোপরি দীনের একজন একনিষ্ঠ দাঈয়া হিসেবে একটি নতুন জীবন শুরু করার প্রেরণা। পুরুষও পাবেন অনেক কিছু। বইটির

কিছু কিছু অংশ অধ্যয়ন করা পুরুষ-সমাজের জন্য হবে বিবেকের আয়নায় আত্মদর্শনের মতো—মমতাময়ী মায়ের কিংবা স্নেহময়ী বড় বোনের গঠনমূলক সমালোচনায়। মুসলিম মনীষীদের অগণিত লেখার সারনির্যাস। বর্তমান প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত।

বইটির উপজীব্য—ইসলামী জীবনদর্শনে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান, মুসলিম পরিবার ও সমাজব্যবস্থায় নারীর কর্তব্য ও অধিকার; দেশ ও জাতির প্রতি, জীবন ও জগতের প্রতি মৌলিকত্ব-বিচার ও সমকালীন ভাবনায় নারীর ভূমিকা ও অবদান। প্রতিপাদ্য—ইসলামী পরিবারব্যবস্থার অনন্যতা। মূলত নারীর জীবনপথের পাথেয় এটি। এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে নারীর প্রতি ইসলামবিদ্বেষীদের তথাকথিত কল্যাণকামিতার স্বরূপ। উন্মোচিত হয়েছে আপাতমধুর সব প্রোপাগান্ডার ভেদ। বক্তব্যে আছে ঘন গাঢ় আবেগ, ধারালো তীক্ষ্ণ যুক্তি, আছে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও চেতনার দ্যুতি।

মূল আরবীর মতো বাংলা অনুবাদও পাঠকসমাজের উপকারে আসবে এমনটিই প্রত্যাশা করছি।

> বিনীত শফিকুল ইসলাম

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। যিনি দীন ও ইলমের নূরে মানবহৃদয়কে করেন আলোকিত, পুনর্জীবিত। যিনি স্রষ্টা নর ও নারীর। যিনি নারীকে গড়েছেন নর হতে। যিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَ مِنْ الْيَهِ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُوَاجًا لِتَسْكُنُوۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শনাবলির একটি এই যে, তিনি তোমাদের সপ্তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জুড়ি। যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ কর তাদের কাছে। আর তিনি স্থাপন করেছেন তোমাদের মাঝে প্রীতি ও মায়া। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। সুরা রুম: ২১

দর্মদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ মানব, শ্রেষ্ঠ রাসূল সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সকল অনুসারীর প্রতি। ...

তাগুতি শক্তি ইসলাম ও আহলে ইসলামের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা মানবসভ্যতার নিয়ন্ত্রণ দখল করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সিঁড়ি বেয়ে মানবতাকে নিয়ে গেছে বস্তুবাদের চরম পর্যায়ে। তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপে ধর্ম ও চরিত্র-বিবর্জিত মানবতা যেন সর্বস্বান্ত; যেন পতনোনাখ কোনো ধ্বংসাবর্তে। জলে-ডাঙায় দেখা দিয়েছে বিপর্যয়।...

শক্ররা আমাদের ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে আমাদের ঐতিহ্য ও শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য বের করে ফেলেছে। তারা ধরে ফেলেছে আমাদের মাহাত্য্যের মূল,

ফিরে এসো নীড়ে

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি। তাই তাদের টার্গেট—আমাদের ধর্ম, আমাদের বিশ্বাস; যা স্থ্ল পার্থিবতা ও জাগতিক চেতনাকে ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে। তারা উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের হৃদয় থেকে আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস হরণ করার জন্য। আমাদের হৃদয় থেকে শাশ্বত সুন্দরের প্রতিচ্ছবি চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য। তারা কাজ করছে—ছলে, বলে, কৌশলে।

তাদের সর্বতোমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার মুসলিম-জাতি ইসলাম থেকে দূরে সরে চলেছে—একটু একটু করে, অনেক অনেক দূরে। সরলপ্রাণ মুসলমানের মগজ-ধোলাইয়ে শেয়াল-মামাদের পারঙ্গমতা বিস্ময়কর, অবলম্বিত পন্থা নিত্যনতুন; বাগাড়ম্বর বাক্যালাপ অদ্ভূত, অভিনব। এমনকি তারা বলে, নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি ঐশ্বরিক উপহার, একটি অমূল্য উত্তরাধিকার; কিন্তু বর্তমান যুগে এর প্রয়োগ কঠিন। তাই একে রাখতে হবে সর্বোচ্চ সম্মানে, মণিমাণিক্য ও হিরে জহরতের তাকে, স্বর্ণখিচিত মখমল গেলাফে অমূল্য ক্ষটিকের আধারে—চরম আবেগে, পরম ভালোবাসায়। ...

মুসলমান দূরে সরে চলেছে ইসলাম থেকে, ইসলামী জীবনদর্শন থকে; অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক করে গেছেন বিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের মতো। ইসলামী আদর্শ ও জীবনদর্শন থেকে সরে গিয়ে আমাদের কী পরিণতি হতে পারে, তাও ব্যক্ত করে গেছেন প্রাক্ত অভিভাবকের মতো। ইমাম আবু দাউদ রাহ, তদীয় সুনানে হযরত সাওবান রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: يُوْشِكُ أَنْ تُدَاعى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ كَمَا تُدَاعى الأَكلَةُ إلى قَصْعَتِها فقال قَائل: أَو مِن قِلَّةٍ خَنُ يَومئذٍ؟ قال: بَلْ أَنتم يَوْمئذٍ كَثِيرٌ ولكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَعْثاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ الله منْ صُدُورِ عَدُوَّكُم المَهَابَة مِنْكم وَلَيَقْذَفَقَ فِي قُلُوبكم الوَهَنَ، فقال قائل: يا رسول الله وما الوَهَن؟ قال: يا رسول الله وما الوَهَن؟ قال: عُبُّ الدُنْيَا وَكَرَاهِيَة المؤتِ

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'অচিরেই সকল জাতি ও সম্প্রদায় এক হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে রব তুলবে; খাদকেরা যেমন পরম আনন্দে দস্তরখানে পরস্পরকে ডাকাডাকি করে ঠিক তেমন করে।' জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের এই দশা হবে কি আমাদের সংখ্যালঘুতার কারণে? তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা তখন অনেক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে প্রোতে ভেসে যাওয়া খরকুটোর মতো। আল্লাহ তোমাদের প্রতি শক্রদের সমীহবোধ দূর করে দেবেন। এবং তোমাদের অন্তরে ঢেলে দেবেন দুর্বলতা।' কেউ আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল, কী জাতীয় দুর্বলতা? তিনি বললেন, 'দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর ভয়।'

সত্যিই আজ মুসলমানদের দশা— যেমনটা কবি বলেছেন,

> زأيته كالطير مقصوصاً جناحاه أنَّ نظرتُ إلى الإسلام فِي بَلَد تام نظرتُ إلى الإسلام فِي بَلَد تامام ইসলামের দিকে তাকাই, দেখি, ডানাকাটা পাখিটা অসহায়।

এমন অরাজকতাপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশেই বেড়ে উঠছে আমাদের ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম। সে পথ পায় ঠিকই; কিন্তু হোঁচট খায় বারবার। শিখতে পারে না, কীভাবে উঠে দাঁড়াতে হয়, কীভাবে পথ চলতে হয়। সে নিজের ভুল স্বীকার করে, নতুন করে সঠিক পথে চলার পণ করে; কিন্তু আবার পণ ভেঙে ফেলে।

এমনই দ্বিধাগ্রস্ত নত্ন প্রজন্ম। সে পরাজিত প্রতিকূল স্রোতের মুখে। এমনই দ্বিধাগ্রস্ত তরুণ-তরুণীতে ভরা আমাদের সমাজ—আমাদের মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—সব। সবই যেন নাট্যমঞ্চ। সকলে প্রতিযোগিতা করছে পাশ্চাত্যপ্রিয়তার। প্রতিযোগিতা করছে পশ্চিমাসাজে নিজেকে সজ্জিত করার। এটাই তাদের কাছে মনে হচ্ছে প্রগতি, আধুনিকতা। ফুলের মতো নিম্পাপ মেয়েদের যখন দেখি, পশ্চিমা নায়িকা গায়িকার অন্ধ অনুকরণের শিকার; যখন দেখি, পুবালি বাতাসের মতো প্রাণোচ্ছল টগবগে তরুণেরা ধর্মবঞ্চিত, চরিত্রবিবর্জিত, তখন দুঃখে কষ্টে হ্রদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, হতাশায় ছেয়ে যায় মন। বারবার জিজ্জেস করি নিজেকে—কেন, কেন এমন হয়?

অবশেষে আমার মনে হয়েছে, বর্তমান প্রজন্ম যে সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, মিখ্যা ও অসুন্দরের পথে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তার পেছনে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে থাকছে নারী। নারীই মূলত ইসলামবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মূল টার্গেট।

শক্ররা আমাদের মহান পূর্বসূরিদের শক্তি ও মাহাত্য্যের রহস্য আবিষ্কার করে ফেলেছে। সুতরাং মুসলিম নারীকে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার কোলে আর যেন কোনো শাসক, সাধক, বীর, বিদ্বান গড়ে উঠতে না পারে—এ জন্যই এত আয়োজন।...

তারা উঠে পড়ে লেগেছে মুসলিম নারীকে ঘরছাড়া করে রাস্তায় নামিয়ে তাকে তার প্রকৃতিপ্রদন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে দিতে। ক্ষতি হবে মুসলিম নারীর, ক্ষতি হবে মুসলিম জাতির। পশ্চিমারা বাগবাগ খুশিতে।...

ভূলে গেলে চলবে না, একটি সমাজ-গঠনে নারীই মূল ভিত্তি। সমাজের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে নারীরই ওপর। সে ইচ্ছে করলে নতুন প্রজন্মকে যোগ্য বানাতে পারে। ইচ্ছে করলে ভাসিয়ে দিতে পারে স্রোতে। সে একই সাথে মা, স্ত্রী, বোন, শিক্ষিকা, প্রতিপালনকারিণী। নারী একই সাথে জাতির অর্ধেক অংশের প্রতিনিধি, অপর অর্ধেক অংশের কারিগর। এ অর্থে পুরো জাতিই সে। সেই পারে ইসলাম ও মুসলমানের ক্রান্তিকালে কিছু একটা করতে।

প্রতিটি মুসলিম নারী কিছু খাঁটি ঈমানদার তৈরি করতে পারেন। জাতিকে উপহার দিতে পারেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। গড়তে পারেন প্রকৃত মুমিন মুসলিম প্রজন্ম। যে প্রজন্ম কিছু বিরল গুণ ও বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, বেড়ে ওঠে ঐশী বিশ্বাসের কোলে; হৃদয়ে ধারণ করে আল-কুরআন,

উপলব্ধি করে তার মর্মবাণী; সজ্জিত হয় নববী আদর্শে, অনুধাবন করে তার মূল সুর। সালাফে সালেহীনের জীবনাদর্শ যার আলোকবর্তিকা। যে আত্মপ্রকাশ করে জাতির দিশারি হয়ে, পূর্বসূরিদের যোগ্য উত্তরসূরি হয়ে। যার চলাফেরায় বদলে যাবে সমাজ, পাল্টে যাবে প্রেক্ষাপট। বিশ্বশক্তির মানদণ্ডে যার ভার—হার মানাবে সকল শক্তিকে। পুনরায় পৃথিবী হবে ইসলামের, মুসলমানের। ...

নারী যদি ক্রআনিক প্রজন্ম গড়ার এই মহান ব্রত নিয়ে আবারও জীবনে অবতীর্ণ হয়, তা হলে সারা পৃথিবীতে যারা শ্লোগান তুলেছে, 'ইসলাম ধ্বংস করো, মুসলিম নিধন করো', অচিরেই ব্যর্থতার গ্লানি তাদের মুখ কালো করে দেবে, সন্দেহ নেই।

ঈমান ও কৃফরের চিরন্তন লড়াইয়ে বিগত শতাব্দীর ফলাফল যদি এই হয় যে, ইসলাম বিতাড়িত হয়েছে, তা হলে এটা যে শুধুই অন্ত নির্দেশ করে তা নয়; কেননা, অন্তের পর আছে নতুন উদয়। আবারও শিশিরসিক্ত সোনালি উষা হেসে উঠবে পৃথিবীর বুকে। ... আমরা জানি, সবকিছুর একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন সময় হবে, তখন আবারও মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। পাখি যেমন ফিরে আসেনীড়ে—শান্তি সুখের নীড়ে।

আল্লাহর শোকর, আধুনিক সমাজে মুসলিম নারীর অবস্থান এবং অবদান কী হতে পারে, এ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও সংগঠনে বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ লেখার ও বক্তৃতা উপস্থাপন করার সুযোগ হয়েছে। মনে হলো, বিষয়গুলো একত্রিত করে ঢেলে সাজালে মুসলিম নারীর জন্য একটি সুন্দর উপহার হতে পারে। হতে পারে তার জীবন চলার পথের উত্তম পাথেয়। ... বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে মৌলিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি:

- নারীর মর্যাদা ও অবস্থান : যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে, প্রাক-ইসলামী আরবে এবং ইসলামে।
- ২. সমাজে নারীর ভূমিকা : একজন মা হিসেবে, নতুন প্রজন্মের কারিগর হিসেবে; একজন স্ত্রী হিসেবে এবং আল্লাহর পথের একজন

দাঈয়া হিসেবে। আলোচনায় স্থান পেয়েছে নারীর কর্তব্য এবং অধিকারও।

আলোচনায় নির্ভর করেছি কুরআন, সুন্নাহ, সিয়ার ও তারীখ্যন্থের ওপর। কাজে লাগিয়েছি আমার ব্যক্তিজীবনের কিছু অভিজ্ঞতাও। আশা করি, ইসলামের যথার্থ বাস্তবায়ন যে আজকের সমাজেও সম্ভব, তা হাতে ছোঁয়া ও চোখে দেখার মতোই মূর্তরূপে প্রকাশ পাবে।

- ৩. আলোচনা করেছি নারী-অধিকার ও নারী-স্বাধীনতার মতো নারী-বিষয়ক বহুল আলোচিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তুলে ধরেছি পর্দা, বাল্যবিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, নারীর কর্ম, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আধুনিক আলোচিত সমালোচিত বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি; এবং প্রতিপন্ন করেছি ইসলামের ওপর উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তির অসারতা।
- ৪. আলোচনা করেছি ইসলামবিদ্বেষীদের বিভিন্ন অপতৎপরতা নিয়ে। তাদের প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য কী, তারা মূলত কী চায়; তাদের কথায় কান দিয়ে নারী কতটুকু কী পায়, কতখানি কী হারায়—তুলে ধরেছি তার স্বরূপ।

সবশেষে প্রত্যাশা করি, এ সামান্য প্রয়াস নূর ও হুদার মশাল হোক প্রতিটি মুসলিম নারীর জন্য, যিনি ইসলামকে গ্রহণ করতে চান জীবনের পথ ও মত হিসেবে। আমার বোনদের জন্য এ কোনো পূর্ণাঙ্গ পাথেয় নয় জানি, এ বরং দুর্বলের দুর্বল প্রয়াস; কিন্তু আশা করি, আমার আল্লাহ আমাকে আজর ও সওয়াব দান করবেন; কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে নেক আমলের পাল্লায় এই আমলটুকু রাখবেন; যেদিন সম্পদ, সন্তান কিছুই কাজে আসবে না; যেদিন সুস্থ হৃদয়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনকারীই শুধু পাবে নাজাত। اللَهُمُ وَكِمْنِكُ (হে আল্লাহ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা গাহি।)

আল্লাহর দয়ার ভিখারিনী ফাতিমা বিনতে খলীল মুহাম্মাদ মুহসিন (উম্মে হুযায়ফা) কুদস, আবু দাইস; বৃহস্পতিবার, ৭ মুহাররাম ১৪২৩ হি./২১ মার্চ, ২০০২ ঈ.

সূচিপত্ৰ

প্রথম অধ্যায় ২৫-২৮ ইতিহাসে নারী : মর্যাদা ও অবস্থান

গ্রিক সভ্যতায় নারী--২৫
রোমক সভ্যতায় নারী--২৬
হিন্দু ধর্মে নারী--২৬
ইহুদি ধর্মে নারী--২৬
খ্রিস্ট ধর্মে নারী--২৭
প্রাক-ইসলামী আরবে নারী--২৮

দিতীয় অধ্যায় ২৯-৩৯ ইসলামে নারী : মর্যাদা ও অবস্থান

- ১. বেঁচে থাকার অধিকার--৩০
- ২. স্বত্বাধিকার ও হস্তক্ষেপ--৩১
- ৩. বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান--৩১
- ৪. শিক্ষা অর্জনের অধিকার--৩২
- ৫. স্বামী থেকে বিচ্ছেদ-গ্রহণের অধিকার--৩৩ নারী পুরুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট--৩৩ ইহুদিদের আরোপিত অভিশাপ থেকে মুক্তি--৩৪ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সম্মান--৩৫
- ৬. রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অধিকার--৩৭

তৃতীয় অধ্যায় ৪০-৫৭ ইতিহাসে মুসলিম নারীর অনন্য দৃষ্টান্ত

চতুর্থ অধ্যায় ৫৮-৮৫ নর ও নারী: একে অপরের পরিপরক

বিবাহব্যবস্থা--৬২ কাজ্জ্বিত কল্যাণ--৬২

ক, মানবজাতির সংরক্ষণ--৬২

খ, চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা--৬৩

গ. মনের স্থিরতা ও প্রশান্তি--৬৪

ঘ. জৈবিক চাহিদা পূরণের সঙ্গত পন্থা--৬৪

বিবাহের বিধান--৬৪

ক. প্রাথমিক প্রস্তাব--৬৪

খ. বিবাহচুক্তি--৬৫

গ. বিবাহচুক্তির সাক্ষী--৬৬

ঘ. অভিভাবকের উপস্থিতি ও একাত্মতা--৬৬

ঙ. মোহর পরিশোধ করা--৬৭

চ. প্রকাশ্যে বিবাহের ঘোষণা--৬৯

ছ. বিবাহ অনুষ্ঠান বা ওলিমা--৬৯

বিবাহপূর্ব প্রেম: একটি ভুল পথ--৬৯ এই অনিষ্ট রোধে--৭১

ক. তাকওয়া ও খোদাভীতি--৭১

খ. ঘরে প্রবেশে অনুমতি-প্রার্থনা--৭২

গ, একান্ত সাক্ষাৎ পরিহার করা--৭২

ঘ. দৃষ্টির হেফাজত--৭৩

ঙ. হিজাব ও পর্দা--৭৫

হিজাব শরীআহ-সম্মত হতে হলে--৭৬

প্রথম শর্ত--৭৬
দ্বিতীয় শর্ত--৭৬
তৃতীয় শর্ত--৭৬
চতুর্থ শর্ত--৭৭
প্রথম শর্ত--৭৭

ষষ্ঠ শৰ্ত--৭৭

সপ্তম শর্ত--৭৮ অষ্টম শর্ত--৭৮

একটি আক্ষেপ, একটি আকৃতি--৭৮ পর্দানশীনরা পিছিয়ে থাকে না--৮১ দাস্পত্যজীবন--৮৪

পঞ্চম অধ্যায় ৮৬-১০২ দাম্পত্যজীবন: নারীর কর্তব্য

ভালো স্ত্রীর গুণাবলি--৮৭

- ১. উত্তম আনুগত্য--৮৭
- ২. পারিপাট্য ও সৌন্দর্য--৮৮
- ৩. স্বামীর ভালোবাসা অর্জন--৮৯
- ৪. অল্পেতুষ্টি--৯২
- ৫. হতাশ না হওয়া--৯৫
- ৬. সবর ও তাওয়াকুল--৯৬
- ৭. সুখে দুখে পাশে থাকে--৯৯
- ৮. কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা--১০১

ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৩-১৩০ দাম্পত্যজীবন: নারীর অধিকার

১. ভরণপোষণ--১০৪ অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান বনাম স্বত্ব-সামিত্ব-প্রভূত্ব--১০৫

২. আলাদা ও আরামদায়ক বাসস্থান--১০৬
ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা--১০৭
সে-ই সর্বোত্তম যে পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম--১০৭
স্ত্রীকে সহযোগিতা করলে পুরুষের
অসম্মান হয় না--১০৭
নারীর দেবারও আছে, নেবারও আছে--১০৮
নারীর ওপর পুরুষের একটি বিশেষ মর্যাদা--১০৯
দোষগুণ মিলেই নারী--১০৯

-2

৩. ন্যায় ও উত্তম ব্যবহার--১১০ গালিগালাজ, মারধর পরিহার করুন--১১১ উত্তম ব্যবহারের দাবি--১১৩

ক. হাসিখুশি থাকা--১১৩

খ. ভালোভাবে কথা বলা--১১৩

গ্, আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা--১১৩

ঘ. ধৈর্য, উদারতা ও সহনশীলতা--১১৪ হ্যরত উমরের ধৈর্য ও উদারতার দৃষ্টান্ত--১১৪

ঙ. স্ত্রী ও তার পরিবারের সম্মান বজায় রাখা--১১৫

চ. স্ত্রীর মতামত যাচাই ও মূল্যায়ন--১১৬

ছ. স্ত্রীর স্বাস্থ্যসুরক্ষায় যত্নশীল হওয়া--১১৬

জ. স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতা--১১৭

তিক্ত হলেও সত্য--১১৮

দায়িত্বহীনতার পরিণতি--১১৯ প্রকৃত সফল পুরুষ--১২১ মায়ের ভূমিকা এক, বাবার ভূমিকা অন্য--১২২ স্ত্রীর অবমূল্যায়ন করবেন না--১২৩ মুসলিম ভাই, একটু ভাবুন--১২৪ স্ত্রীর সাথে আমোদপ্রমোদ অনর্থক নয়--১২৪ পরিবারের জন্য খরচ করলে অধিক সওয়াব--১২৫

ন্ত্রীর মনোরঞ্জন--১২৫
সন্তানদের প্রতি স্লেহ--১২৬
ন্ত্রীর সাথে পরামর্শ--১২৬
এখনো কি সম্ভব?--১২৭
ড. সাইফ আল বান্নার বক্তব্য--১২৮
ড. সানা আল বান্নার বক্তব্য--১২৮

সপ্তম অধ্যায় ১৩১-১৩৫ একজন আদর্শ মা মাহাত্ম্যের উৎসমূল, নেতৃত্বের লালনক্ষেত্র

অষ্টম অধ্যায় ১৩৬-১৬৪ শিশুর লালন-পালন

জন্মলগ্নে--১৩৬

- ১ শিশুর কানে আজান দেওয়া--১৩৬
- ২, তাহনীক করা--১৩৭
- ৩. সুন্দর নাম রাখা--১৩৭
- ৪. আকীকা--১৩৭
- ৫. সদকা--১৩৮
- ৬, খতনা--১৩৮
- ৭. স্তন্যদান--১৩৮

তিন বছর বয়স পর্যন্ত--১৩৯

বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত--১৪১

ক. ঈমানী তরবিয়ত--১৪১

- ১. আকীদা বিশ্বাস--১৪১
- ২. পিতামাতার আনুগত্য--১৪২

সাত বছর বয়সে--১৪২

- ১. পবিত্রতা ও নামায--১৪৩
- ২. রমযানে রোযা--১৪৩

সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশের তাৎপর্য--১৪৪

- ৩. বিনয় ও মনোযোগিতা--১৪৪
- 8. একমাত্র আল্লাহর জন্য--১৪৫
- ৫. আল্লাহর ধ্যান ও কল্পনা--১৪৬

খ সামাজিক শিষ্টাচার--১৪৬

- ১ অন্যদের প্রতি ভালোবাসা--১৪৬
- ২. পানাহারের শিষ্টাচার--১৪৭
- ৩. শোয়ার আদব--১৪৮
- ৪. পরিচ্ছন্নতা--১৪৯
- ৫. দৃষ্টির শিষ্টাচার ও অনুমতিপ্রার্থনা--১৫০
- গ, শিক্ষা-দীক্ষা--১৫১
- ঘ, চারিত্রিক শিষ্টাচার--১৫৬

সত্যবাদিতা--১৫৬
আবদুল কাদির জিলানী ও ডাকাতদল--১৫৬

২. বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা--১৫৮

৩. বাগ্পাণ্ডিত্ব ও কথা বলার শিষ্টাচার--১৫৯
এক বালকের বাগ্মিতা--১৬০
খলীফা আবদুল মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি--১৬০
খলীফা হারুনুর রশিদের দৃষ্টিভঙ্গি--১৬১
শিশুর শিষ্টাচার কঠিন কিছু নয়--১৬২
দৃষ্টির হেফাজত ও পর্দা--১৬৩

মা বাবাই শিশুর সবচে অন্তরঙ্গ বন্ধু--১৬৪

নবম অধ্যায় ১৬৫-১৮২ সন্তান লালনপালন : কিছু সফল পদ্ধতি

১. হিকমাহ ও মাওইযায়ে হাসানাহ--১৬৫

হিকমাহ ও মাওইযায়ে হাসানাহ অবলম্বনে—১৬৬

ক. আল্লাহর সাথে শিশুর দৃঢ় সম্পর্ক গড়ন--১৬৬

খ. শিক্ষকের হাতে শিশুকে সঁপে দিন--১৬৮

গ. সন্তানের জন্য সৎ সঙ্গ নিশ্চিত করুন--১৬৯

২. তদারকি ও দেখাশোনা--১৬৯

ক, পরোক্ষ উপদেশ--১৭০

খ. শিশুর সাথে গল্প করা--১৭১

গ্ৰত্যক্ষ উপদেশ ও সংশোধন--১৭১

ঘ. নিন্দা করুন আচরণের—শিশুর নয়--১৭১

ঙ. প্রশংসা--১৭২

চ. সন্তানদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা--১৭২

৩. অভ্যাস-গঠন--১৭৩

৪. আদর্শ স্থাপন--১৭৪

৫. উপযুক্ত শাসন--১৭৪

প্রতিপালন ব্যর্থ হয় কেন?--১৭৭

১. মাত্রাতিরিক্ত শাসন--১৭৮

- ২. মা-বাবার মধ্যে অতিরিক্ত ঝগড়া-বিবাদ--১৭৯
- ৩. অতিরিক্ত আদর-আহ্লাদ ও আরাম-আয়েশ--১৮০
- ৪. ছেলেমেয়েকে অনর্থক বসিয়ে রাখা--১৮১
- ৫. বৈষম্য--১৮২

দশম অধ্যায় ১৮৩-১৯০ বয়ঃসন্ধি ও তারুণ্যে সন্তানের প্রতি বিশেষ শুরুত্বারোপ

একাদশ অধ্যায় ১৯১-২১১ মিডিয়া এবং আমাদের সন্তান

দ্বাদশ অধ্যায় ২১২-২৭৩ দাওয়াতের ময়দানে নারী

- ১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস--২১৮
 - ক. দুনিয়ার মায়া-মোহ--২২০
 - খ, হিংসা--২২১
 - গ. ক্রোধ--২২১
 - ঘ, আত্মপ্রতারণা--২২২
 - **ঙ. অহংকার--২২২**
 - চ, শিরকে আসগার--২২৩
- ২. ধর্মীয় এবং সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান--২২৪
- ৩. আমলি ও আখেরাতমুখী জিন্দেগি--২২৮
 - ৪. সময়ের মূল্যায়ন--২৩১
- ৫. হ্রদয়ের গভীরে পৌছে দিন আহ্বান--২৩৮
 - ৬. প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশ--২৪৪
 - ৭. ধৈর্য ও অবিচলতা--২৪৮
 - ৮. চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব--২৬১
 - ৯. হালের কথা জানুন--২৬৮
 - ১০. চাই প্রিয় নেতৃত্ব--২৭১

ত্রয়োদশ অধ্যায় ২৭৪-২৯১ নারী এবং দাওয়াহ: আধুনিক অঙ্গন

চতুর্দশ অধ্যায় ২৯২-৩২০ কয়েকটি বহুল আলোচিত বিষয়

একাধিক স্ত্রী-গ্রহণ--২৯৩
উত্তরাধিকার--২৯৫
বাল্যবিবাহ--২৯৬
আত্মীয় বিবাহ--৩০২
তালাক--৩০৫
নারীর কর্ম--৩১২
জনানিয়ন্ত্রণ--৩১৭

পঞ্চদশ অধ্যায় ৩২১-৩৩৯ ফিরে এসো নীড়ে

ষোড়শ অধ্যায় ৩৪০-৩৫২ আমাদের প্রত্যাশা

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসে নারী : মর্যাদা ও অবস্থান

গ্রিক সভ্যতায় নারী

প্রিক সভ্যতায় প্রথম পর্যায়ে নারী ছিল সতীসাধ্বী, সুরক্ষিত। তার পুরো জীবন ও জগৎ ছিল চার দেয়ালের ভেতর। জনজীবনে ছিল না কোনো অংশগ্রহণ; কিন্তু পরিণতি ছিল হিতে বিপরীত—বড় ভয়াবহ। সেছিল অবহেলিত, অত্যাচারিত। তাকে ভাবা হতো সমাজের বোঝা, পরিবারের বোঝা, স্বামীর বোঝা। এমনকি, স্বাধীনতা হরণ করে তাকে বানানো হয়েছিল দাসী-বাঁদি। বেচাকেনা চলত অহরহ। সাধ-আহ্লাদ ছিল কল্পনাজগতের কথা। স্বত্ব যা ছিল নামেমাত্র, হস্তক্ষেপের অধিকার ছিল না। জীবনসঙ্গী হিসেবে কাউকে পাওয়া না-পাওয়া ছিল অন্যদের দান-দক্ষিণার ব্যাপার। নারী ছিল পুরুষের শুধুই ভোগের বস্তু।

এক সময় থ্রিক সভ্যতার জয়জয়কার শুরু হলো। বাস্তব জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে নারীরা পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে শুরু করল। সতীত্ব-চরিত্র যেমন পুরুষের কাছে হয়ে উঠল মূল্যহীন, তেমনই নারীর কাছেও হয়ে পড়ল অর্থহীন। কর্মমুখর জীবনের বাঁকে বাঁকে শুরু হলো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। দেখা দিল অনিয়ম-অনাচার, বেহায়াপনা-ব্যাভিচার।

ফিরে এসো নীড়ে

রোমক সভ্যতায় নারী

রোমক সভ্যতার পরিবারব্যবস্থায় গৃহকর্তাই ছিলেন পরিবারের প্রভূ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে তার অধীন। ছেলেদের তাবৎ সম্পদ তার হস্তগত। মেয়েদের কথাই নেই—কী ঘরে, কী বাইরে; কী নিজের, কী পরের—কোনো কিছুতেই তার হস্তক্ষেপ চলবে না।

অবশ্য একসময় রোমকরা সভ্য হতে চাইল। তাই 'ন্যায়সঙ্গত' আইনও বানাল। আইন অনুযায়ী নারীকে স্বত্বও প্রদান করল—সে নিজে যা কামাই করবে সব তার, অভিভাবক মারা গেলে সে নিজেকে যে কারও কাছে বিক্রি করতে পারবে। এ জন্য তারা বিশেষ চুক্তিনামারও অবতারণা করল। নাম দিল—'নারীর ওপর পুরুষের স্বত্বচুক্তি'। নারী এতে স্বাক্ষর করলে বলা হতো—'নারীর স্বত্ব-স্বীকৃতি'।

হিন্দু ধর্মে নারী

'মনু'র ধর্মে পিতা, ভাই ও স্বামী থেকে আলাদা স্বয়ংসম্পন্ন কোনো সন্তা নারীর ছিল না। এমনকি, স্বামীর মৃত্যুর পর বেঁচে থাকারই অধিকার ছিল না তার। সহমরণ বা স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় গমন ছিল দুর্লজ্য বিধান। মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়ে কয়লা হওয়া ছাড়া জীবনে যে ময়লা থেকে যেত! শুধু তাই নয়, দেবদেবীকে প্রসন্ন করতে বলি হিসেবে পেশ করা হতো নারীকে। নারীর প্রতি অবজ্ঞা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, তারা মনে করত—কপালের ক্লেশ, প্রলয়, নিদান, নরক, গরল, বিষক্রিয়া, অগ্নিকাণ্ড নারীর চেয়ে মন্দ কিছু নয়।

ইহুদি ধর্মে নারী

ইহুদি ধর্মে নারীর অবস্থান পরিচারিকার মতো। উত্তরাধিকার বলতে কিছু নেই। আপন ভাইটাই না থাকলে অবশ্য কিছু পায়; কিন্তু অন্যত্র বিবাহ করার সুযোগ শেষ। তাদের কাছে নারী অভিশপ্ত; কেননা, তার কারণেই আদম ধোঁকা খেয়েছিলেন এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। মাসিকের সময় তারা নারীর সাথে পানাহার বর্জন করত। কাছেও ভিড়তে দিত না তাকে। তাদের বিকৃত তাওরাতে আছে,

اَلْمَرَاةُ أَمَرٌ مِن المؤتِ، إِنَّ الصَالِحُ أَمَامَ الله مَن يَنْجُو مِنها، رَجُلًا واحِدًا بَينَ هؤلَاءِ وَحدتُ أَمَّا امرأةً واحدةً بَين كُلِّ أُولِئِكَ لَمْ أَجِدْ

অর্থ: নারী মৃত্যুসম। আল্লাহর কাছে সেই সৎ, যে নারী থেকে বাঁচতে পারবে। এইসব লোকের মধ্যে একজন পুরুষ পেয়েছি; কিন্তু ওইসব লোকের পুরো দলের মধ্যে একজন নারীও পাইনি।

খ্রিস্ট ধর্মে নারী

রোমক সভ্যতায় যে চারিত্রিক ধ্বস ও মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, খ্রিস্টধর্মের ধর্মগুরুরা ধীরে ধীরে সেদিকেই ধাবিত হয়েছিলেন। খ্রিস্টানরা ধরে নিয়েছিল যত অনিষ্টের মূল নারীই, যত দায় নারীরই। তারা মনে করেছিল, বিবাহ একটি গর্হিত কাজ, একে পরিহার করতে হবে। নারী—ট্রটোলিয়ার ভাষ্যমতে—শয়তানের দ্বার, ইবলিসের হাতিয়ার, আল্লাহর বিধানের ক্ষতিসাধনকারী; আল্লাহর প্রকৃতিতে বিঘ্নু সৃষ্টিকারী।

পাঁচশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সেমিনার হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল—নারী কি মানুষ না অন্য কিছু? আলোচনা পর্যালোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারীর সৃষ্টি পুরুষের সেবা-শুশ্রুষার জন্য। সে স্বায়ংসম্পূর্ণ নয়; স্বামী ও অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অর্থসম্পদে হস্তক্ষেপের অধিকার তার নেই।

ইংরেজদের সংবিধান স্ত্রীকে বেঁচে দেওয়ার অধিকারও স্বামীকে দিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় জোরেশোরে নারীস্বাধীনতা ঘোষিত হলেও নারী কী পেয়েছিল? ফরাসি সংবিধানে বলা হয়েছিল—অবিবাহিতা নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোনো চুক্তিই সম্পাদন করতে পারবে না।

প্রাক-ইসলামী আরবে নারী

প্রাক-ইসলামী আরবে নারীর অধিকার বলতে কিছুই ছিল না; উত্তরাধিকার তো দূরের কথা। স্বামীর ওপর তার কোনো জোর কল্পনাও করা যেত না। স্বামী তাকে তালাক দিতে পারত—যখন খুশি, যত খুশি। অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত—যখন খুশি, যত খুশি। কন্যাশিশুর জন্ম হলে লজ্জায় মুখ লুকানোর জায়গা পেত না। বিষয়টি এত দূর গড়িয়েছিল যে, তারা অভাব ও কলঙ্কের ভয়ে মেয়েদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলত।

১. সূরা তাকভীর : ৮-৯।

ফিরে এসো নীডে

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারী: মর্যাদা ও অবস্থান

আরবে নারীকে খাটো করে দেখা হতো। অবলা নারীর অধিকার নিয়ে তামাশা করা হতো। তার সম্মান ও সম্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হতো। অবশেষে ইসলামের আবির্ভাব হলো। এলো আলোকোডাসিত শুদ্র সমুজ্জ্বল জীবনবিধান। স্থাপিত হলো ন্যায়ের নিক্তি। নারী পেল সত্যিকারের মর্যাদা, মানবতার স্বাদ, অধিকারের আনন্দ, সমাজে সম্মানজনক দায়িত্বপালনের গ্রহণযোগ্যতা। ইসলাম তাকে প্রদান করল সুমহান মর্যাদার তাজ। তাকে ভূষিত করল সর্বোচ্চ সম্মানে।

সে নারী হিসেবে পরিবারের বোঝা নয়, জাতির জননী, নতুন প্রজন্মের লালনক্ষেত্র; স্ত্রী হিসেবে পুরুষের বোঝা নয়, সম্মানিতা জীবনসঙ্গিনী, যার আছে অগাধ অধিকার, অগণিত কর্তব্য; মেয়ে হিসেবে সমাজের বোঝা নয়, অমূল্য সম্পদ—তার ইজ্জত-আবরু, সম্মান-সম্ভ্রম সুরক্ষিত দুষ্টলোকের কুদৃষ্টি থেকে; প্রবৃত্তিকামীর লালসা থেকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا النِسَاءُ شَقَائِقُ الرِجَالِ

অর্থ : নারী তো পুরুষের সহোদর।

১. আবু দাউদ।

অর্থাৎ নারী-পুরুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট যুগল; একে অপরের পরিপূরক এবং সমকক্ষ; পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, সহযোগিতার; মানে-পরিমাণে, ধরনে-ধারণে ভিন্নতা থাকলেও মূল্যায়নে সমান।

যুগে যুগে নারীর যে অধিকারগুলো লঙ্খিত-লুষ্ঠিত হয়েছিল, ইসলাম সেই অধিকারগুলো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। নিচে গুরুত্বপূর্ণ এমনই কয়েকটি অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করার প্রয়াস পাব:

১. বেঁচে থাকার অধিকার

জাহেলি আরবে কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকারই অধিকার হরণ করা হয়েছিল। বন্য-বর্বরেরা অভাব ও অপবাদের দোহাই দিয়ে মেয়েদের মেরে ফেলত। শিশুকন্যাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলত। তাদের এই কঠিন শশ্বিকতাকে কঠিনভাবে লাগামবদ্ধ করে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ .. بِأَيِّ ذَنُّ إِ قُتِلَتْ

অর্থ : অচিরেই, যাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? −সূরা তাকভীর : ৮-৯

কন্যাশিশুর জন্মলাভে তারা লজ্জায় গুটিয়ে যেত। মহান আল্লাহ এই ঘৃণ্য মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করলেন এভাবে,

وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ

يَتَوَالى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ الْيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُهُ فِي التُّوَابِ * الاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

অর্থ : যখন কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখ ক্রোধে কালো হয়ে যায়। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা তার কাছে এতই অপ্রিয় যে, সে সমাজ থেকে মুখ লুকানোর জায়গা খোঁজে। ভাবে, অপমান সয়ে নিয়ে একে রেখে দেবে, নাকি (এ জঞ্জাল) মাটিতে

ফিরে এসো নীড়ে

পুঁতে ফেলবে? দ্যাখো, কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের বিচার! –স্রা নাহল : ৫৮-৫৯

২. স্বত্বাধিকার ও হস্তক্ষেপ

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারও দান করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করছেন সন্তানদের ব্যাপারে। পুরুষ পাবে দুজন নারীর সমান। –সূরা নিসা : ১১

শুধু যে নামকাওয়ান্তে অধিকার দিয়ে রেখেছে তা নয়। হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত ক্ষমতাও দান করেছে। সে তার সম্পদে কেনা-বেচা করতে পারে। দান-সদকা করতে পারে। এতে তার ইচ্ছাই চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবে। সুতরাং স্বত্ব ও মালিকানায় ইসলামে সে স্বয়ংসম্পন্ন। সে চাইলে শরীআতনির্দেশিত পন্থায় নিজ সম্পদে যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩. বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান

নারীও পুরুষের মতো মুমিন, বিশ্বাসী, সৎ জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রাখে। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারও সাথে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে এমন অধিকার কারও নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ٱلْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صَمْتُها

অর্থ : নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধবাই অধিক হকদার। এ ব্যাপারে অভিভাবকের কোনো কর্তৃত্ব নেই। কুমারীকে জিঞ্জেস করে নিতে হবে। তার নীরবতা সম্মতি নির্দেশ করবে।

১. সহীহ মুসলিম।

ফিরে এসো নীড়ে

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَى تُسْتَأْذَنَ وَلَا النَّيِّبُ حَتَى تُسْتَأْمَرَ، فَقِيْلَ لَه : إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْى فَقَال : إِذْنُهَا صَمْتُها.

অর্থ: কুমারীকে বিবাহ দিতে হলে তার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। আর বিধবাকে বিবাহ দিতে হলে তার নির্দেশপ্রাপ্ত হতে হবে। বলা হলো, কুমারী তো লজ্জা করবে। তিনি বললেন, তার নীরবতা তার সম্মতি নির্দেশ করবে।

একবার হ্যরত খানসা রাযিআল্লাহ্ আনহা এলেন রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে। মিনতি করলেন, তিনি একজন অকুমারী নারী; তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছেন। ঘটনাটি যাচাই করে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহটি ভেঙে দিলেন।

8. শিক্ষা অর্জনের অধিকার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র ছিল মসজিদ। কিন্তু এখন পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। যাই হোক, জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّكُ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَه وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَها فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَها وأَدَّبَمَا فأَحْسَنَ تَأْدِيْبَها ... فَلَهُ أَجْرَان

অর্থ : যদি কারও কোনো কন্যাশিশু থাকে, আর সে তার জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করে, (নামে নয়, বরং) উত্তমভাবে; এবং শিষ্টাচার

১. সহীহ বুখারী।

২. সহীহ বুখারী।

শিক্ষা দেয়, (নামে নয়, বরং) উত্তমভাবে, তার জন্য থাকবে দ্বিগুণ প্রাপ্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী সাহাবীদের জন্যও একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করেছিলেন তাদের হিতোপদেশ ও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ শিক্ষা দান করার জন্য।

৫. স্বামী থেকে বিচ্ছেদ-গ্রহণের অধিকার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু **আনহু থেকে বর্ণি**ত আছে, তিনি বলেন,

جَاءَت امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالتْ : يا رسول الله مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِيِّ أَخَافُ الْكُفْرَ. فقال رسول الله فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَه ؟ فقالت : نَعَم. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَه وأمَرَه فَفَارَقَها.

অর্থ: সাবিত ইবনে কায়েস রাযিআল্লাহু আনহুর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, সাবিতের ধর্ম-কর্ম ও স্বভাব-চরিত্রে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমার নিজের ব্যাপারে কুফরির আশঙ্কা হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তার বাগানটা ফেরত দেবে? সাহাবিয়া বললেন, হাঁ, দেব। এরপর তিনি বাগানটি সাবিত রাযিআল্লাহু আনহুকে দিয়ে দিলেন। আর সাবিত রাযিআল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শে বিচ্ছেদ গ্রহণ করলেন।

নারী পুরুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট

উপর্যুক্ত অধিকারগুলো ছাড়াও ইসলাম নিশ্চিত করেছে যে, নারী-পুরুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট; একে অপরের পরিপূরক এবং সমকক্ষ; পারস্পরিক

১. সহীহ বুখারী।

২. সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীড়ে

সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, সহযোগিতার; আধিপত্যের নয়, কর্তব্যের ও অভিভাবকত্বের; মানে পরিমাণে, ধরনে-ধারণে ভিন্নতা থাকলেও মূল্যায়নে সমান। এজন্যই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

لَّاتَّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْدًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاّعُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

অর্থ : হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি অভিন্ন সন্তা থেকে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সেই সন্তা থেকে তার জুড়ি। আর সেই আদি জুড়ি থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক নর ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে—যার নাম ব্যবহার করে তোমরা (নারী-পুরুষ) একে অপরের কাছে অধিকার দাবি কর। আর তোমরা সম্মান করো সেই গৃর্ভকে (মায়ের জাতিকে)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক। –সুরা নিসা: ০১

এভাবে নর ও নারীকে মহান আল্লাহ একটি অভিন্ন সত্তা থেকে সৃষ্টি করার পর শরন্ধ বিধি-নিষেধ আরোপেও উভয়ের মধ্যে সমতা-বিধান করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْفَى وَ هُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَلُوةً كَلِيَبَةً 'وَ لَنَجْزِيَنَّهُمُ آجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: ঈমান এনে যে ভালো কাজ করবে, নর হোক নারী হোক, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব। আমি তাদের দান করব বিনিময়। তাদের কৃতকর্মের চাইতে সুন্দরতর বিনিময়। –সূরা নাহল: ৯৭

ইহুদিদের আরোপিত অভিশাপ থেকে মুক্তি

সেই সাথে ইহুদিদের আরোপিত অভিশাপ থেকেও নারীকে মুক্তি দিয়েছে ইসলাম। কেননা, মহান আল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালামের জান্নাত থেকে বহিদ্ধৃত হওয়ার দায় নারীর ওপর চাপাননি। বরং বলেছেন,

فَوَسُوَسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَاؤُدِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا آنُ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخُلِدِيْنَ

অর্থ : তখন শয়তান আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিল তাদের কাছে তাদের গোপনাঙ্গকে প্রকাশ করে দেওয়ার দুরভিসন্ধি নিয়ে। সে বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর এই বৃক্ষের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন শুধু এজন্য যে, তোমরা না ফেরেশতা হয়ে যাও; কিংবা না হয়ে পড় চিরঞ্জীব। –সুরা আ'রাফ: ২০

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সম্মান

আল্লাহ তাআলা নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। মা হিসেবে এক ধরনের মর্যাদা। মেয়ে হিসেবে এক ধরনের মর্যাদা। বোন হিসেবে এক ধরনের মর্যাদা। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে এক ধরনের মর্যাদা। এভাবে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে নারীকে সম্মান ও মর্যাদায় আসীন করেছেন।

মহান আল্লাহ মা হিসেবে একজন নারীর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এভাবে.

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتُهُ كُرْهًا أَو حَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا حُتَّى إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ ارْبَعِيْنَ سَنَةً ثَالَ رَبِ اَوْزِغَنِيَ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيِّ اَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرُضْهُ وَ اَصْلِحْ بِيْ فِي ذُرِيَّتِيْ رُبِّنَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : আর আমি মানুষকে আদেশ দিয়েছি পিতামাতার প্রতি সদাচারের। কেননা, তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন কষ্ট সহ্য করে, তাকে প্রসব করেছেন কষ্ট সহ্য করে; তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানো অবধি সময়কাল ত্রিশটি মাস। একসময় সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে। সে বলে, আয় রব, আমাকে তওফিক দান করুন, আমি যেন আমাকে এবং আমার মা বাবাকে আপনি যে নেয়ামত দান করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারি; আমি যেন আপনার পছন্দসই আমলে সালেহ করতে পারি। আয় রব, আপনি আমার বংশধরদের মাঝে সংশোধন দান করুন। আমি তো আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। নিশ্চয়ই আমি আত্যসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। –সূরা আহকাফ: ১৫

একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وخَيْرُ مَتَاعِها المُرْأَةُ الصَّالِحَةُ

অর্থ : দুনিয়া সামান্য উপকরণ। কিন্তু এ সামান্য উপকরণের শ্রেষ্ঠ বস্তুটি হলো সতী নারী।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

إسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

অর্থ : তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণের উপদেশ গ্রহণ করো। এভাবে একটি মেয়ে হিসেবেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এভাবে একটি মেয়ে হিসেবেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

مَنْ يَلِيْ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْعًا فأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَه سِتْرًا مِنَ النَارِ

অর্থ : যদি কেউ এই মেয়েদের কোনো কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করে, সাথে সাথে তাদের প্রতি সদাচার করে, তা হলে এই মেয়েরা তার পক্ষে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে।

১. সহীহ মুসলিম।

২. সহী বুখারী ও মুসলিম।

৩. সহীহ বৃখারী ও মুসলিম।

৬. রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীকে জনপ্রতিনিধি ও সরকার-নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ لَوْمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ الثُّمَّ قَلْبُهُ

অর্থ : তোমরা সাক্ষ্য গোপন কেরো না; যে সাক্ষ্য গোপন করে, সে তো পাপিষ্ঠহ্বদয়। –সূরা বাকারা : ২৮৩।

শায়খ মাজিদ আবু হুযায়ের লিখেছেন,

وَالشَّهَادَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الرَّحِلِ وَالمرأةِ، والانْتِخَابُ هو شَهَادَةُ حَقِّ فِيْها إِحْبَارٌ عَمَّنْ يَصْلُحُ لِقِيَادَةِ الأُمَّةِ. والانتخابُ الجَنِهادُ لَا تَمْنُعُ مِنْه الأَنُوْنَةُ لِأَنَّ الْفُتْيَا تَصِحُ مِنَ المرأةِ، كَمَا أَنَّ عَمَلِيَّةَ الانتخابِ فِي عَصْرِنا الحاضِرِ مُنَظَّمَةٌ وَبَحْرِي نَصِحُ مِنَ المرأةِ، كَمَا أَنَّ عَمَلِيَّةَ الانتخابِ فِي عَصْرِنا الحاضِرِ مُنَظَّمَةٌ وَبَحْرِي فِي فَتْرَةٍ قَصِيْرةٍ لاَنُعَطِّلُ المرأة عَن وَظَائِفِها الأصْلِيَّةِ كرَوْجةٍ وأَمْ مُرَبِّيَةٍ. وهذَا بِعَكْسِ مَا إِذَا أَرَادَت المرأةُ أَنْ تُرَشِّحَ نَفْسَها نَائِيَةً فِي الْبَرْلَمَانِ فإن الإسلامَ يَقِفُ مِنْ ذلِكَ مَوْقِفَ النَّفُورِ لَا لِعَدَم أَهْلِيَّةِ الْمَرْأةِ لِذلِكَ بَل لِلأَصْرَارِ الإحْرَامِ الإسلامَ الأَحْتِمَاعِيَّةِ التِي تَنْشَأَ عَنْ ذلكَ والْمُخالَفةِ لأَحْكَامِ الشَرِيْعَة وآدابِ الإسلامُ وأَخْلاقِه، ولِلْجِنَايَةِ البَالِغَةِ على سَلَامَة الأَسْرَةِ وَكَامُ الشَرِيْعَة وآدابِ الإسلامُ عن مُعَاجَنَةِ شُؤُونِهَا بِكُلِّ هُدُوءٍ وطَمَأْنِيْنَةٍ

অর্থ : সাক্ষ্যপ্রদান নারী এবং পুরুষ উভয়ের ওপরই ওয়াজিব। নির্বাচনও একটি সাক্ষ্য। তাতে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে, জাতির নেতৃত্ব দানে কে যোগ্য। তা ছাড়া, নির্বাচন ইজতিহাদের মতোই। নারীত্ব এক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। কেননা, নারী ফতোয়া প্রদান করতে পারেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভোটপ্রদান সেরকমই কিছু। এর জন্য খুব বেশি সময়ও ব্যয় হয় না, যে, নারীর মূল কর্তব্যে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে। তবে যদি নারী নিজে জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংসদ-সদস্য হতে চায়, সেটা

গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা স্বীকৃত নয়। নারীর যোগ্যতা নেই বিষয়টি এমন নয়। আসলে এতে সমাজ-জীবনে অনেক বিপত্তি ঘটে ও ক্ষতি সাধিত হয়। ইসলামের অসংখ্য বিধানের, সৌজন্য-নীতির, রুচিপ্রকৃতির বিরোধিতা ও লঙ্খন হয়। ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তিপ্রস্তর—ইসলামী পরিবারের মৌলিকত্ব ও সংহতি বিনষ্ট হয়। নারী তার প্রকৃত গুরুদায়িত্বটি নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে পালন করতে পারে না।

শায়খ আবু হ্যায়ের যথার্থই বলেছেন। কেননা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শাখা-প্রশাখা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিত্যনতুন মোড় নেয়। এতে জড়াতে গেলে নারীকে দীর্ঘক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। দেশে বিদেশে একের পর এক সফর করতে হবে। সবই নারীপ্রকৃতির সাথে অসামঞ্জস্য। বিপরীতে তার যে গুরুদায়িত্বটি ছিল একজন বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনী হিসেবে, একজন দায়িত্বশীল মা হিসেবে, ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের রত্মগর্ভা হিসেবে, সেটাও বিঘ্রিত হবে।

নারী যত বড় রাজনৈতিক পদভারই ঘাড়ে নিক এবং সেটায় যত যোগ্য বলেই বিবেচিত হোক, আল্লাহপ্রদন্ত স্বভাবপ্রকৃতি কিছুতেই বদলাবে না। নারীসুলভ কোমলতা, মায়া-মমতা কখনোই তার পিছু ছাড়বে না। এরকম উদাহরণ একটি-দুইটি নয়, অসংখ্য। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেই দেখুন, বিমান-দুর্ঘটনায় পুত্রের মৃত্যুশোকে কী কান্নাই না কাঁদলেন। সারা পৃথিবীর সকল মায়ের মনে যে দহন-যন্ত্রণা হয় তা কি তিনি এড়াতে পেরেছেন? ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থেচার আফ্রিকার মরুভূমিতে পুত্রকে হারিয়ে কেমন ভেঙে পড়েছিলেন। টেলিভিশনে সারা পৃথিবীর সামনে কেঁদে কেঁদে বললেন, যদি তারা ছেলের সন্ধান দিতে না পারেন তা হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। ভেবে দেখুন, তিনি লৌহমানবী নামে পরিচিত।

১. আল মারআহ ওয়াল হুকুকুস সিয়াসিয়্যাহ ফিল ইসলাম : ৪৫৫-৪৫৯।

২, রিসালাতুন ইলা হাওয়া : ২/৩০।

প্রিয় বোন,

ভূলে যাবেন না, আপনি খানসা-আসমার উত্তরসূরি। আপনার পরম্পরা অনেক উন্নত। আপনার অনেক সাহসী হওয়া উচিত। শরীআতের সীমারেখা জ্ঞাত হওয়া উচিত। যে কোনো বিষয়ে অত্যন্ত চৌকশ ও সচেতন হওয়া উচিত। আল্লাহ আপনাকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তার মূল্যায়ন করা উচিত। ভূলেও পশ্চিমা নারীদের অনুসরণ করবেন না। ঈমান ও ইসলামের স্বাভাবিক ও চারিত্রিক সীমারেখা অতিক্রম করবেন না। দীন ও শরীআতের বিধি-নিষেধ লগুন করবেন না। মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَالْمُؤُمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ 'يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ' أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ 'إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ: মুমিন নর ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। অচিরেই আল্লাহ তাদের করুণা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। –সুরা তাওবা: ৭১

এই আয়াতটি স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, সমাজ ও রাজনীতিতে পুরুষের সাথে নারীরও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইরশাদ করেছেন,

الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاوْهُمْ، ويَسْعى بِذِمَّتِهِم أَدْنَاهُم، ويُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

অর্থ : মুসলমানরা পরস্পর সমান। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে নগণ্য, সেও তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে সচেষ্ট হবে। যে সবচেয়ে দূরবর্তী, সেও আশ্রয় প্রদান করতে পারবে। অন্যদের বিপক্ষে তারা ঐক্যবদ্ধ।

১. আবু দাউদ ও বাইহাকী।

ফিরে এসো নীড়ে

তৃতীয় অধ্যায় ইতিহাসে মুসলিম নারীর অনন্য দৃষ্টান্ত

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরই এই সুমহান শাশ্বত ধর্মের কল্যাণে মুসলিম নারীশাশ অসংখ্য উত্তম গুণাবলিতে বিশিষ্ট হয়েছিলেন। সমাজ-জীবনে যথার্থ ভূমিকা ও যথাযথ অবদান রাখতে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রত্যেক নারীরই ছিল স্বয়ংসম্পন্ন শক্তিশালী সন্তা। তাদের বিচক্ষণতা, বিশুদ্ধভাষিতা, গভীর জীবনবোধ ও অনুপম বাকশৈলী ছিল ঈর্ষণীয়। ধৈর্য ও অবিচলতা ছিল পর্বতপ্রমাণ।

স্বয়ং রাসূল সাক্লাক্লান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লামই নারীদের সম্মান করতেন এবং তাদের সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সাহাবা কেরামকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন। এরই কল্যাণে ইসলামী সমাজে নারী জাতি লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। অধিষ্ঠিত হয় অকৃত্রিম সম্মানের আসনে।

এ অধ্যায়ে আমরা ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম নারীর দু-একটি অনন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরার প্রয়াস পাব। আশা করি, এগুলো আমাদের প্রেরণা যোগাবে—কিছুটা অনুসরণের জন্য, কিছুটা শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

মানবতার প্রথম শিক্ষক মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণের শিক্ষাদীক্ষা ও আমল আখলাকের বিষয়েও মনোযোগী হয়েছিলেন। দেখুন না, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুওয়াইরিয়া রাযিআল্লাহু আনহার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগোজার এবং শোকরগোজার একজন নারী। পবিত্র জীবনসঙ্গিনীর মহিমান্বিত তাজ মন্তকে ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন উন্মূল মুমিনীনের ভূমিকায়। ইবাদতরতা অবস্থায় দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,

'আমি তোমাকে কয়েকটি কালিমা শিখিয়ে দিই, এগুলো জপে জপে তুমি তোমার প্রভূকে স্মরণ করো:

سُبْحَانَ اللهِ وَيَحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِه، وَرِضَا نَفْسِه، وَزِنه عَرْشِه، وَمِدَادَ كَلِمَاتِه

অর্থ : পবিত্রতা গাহি আল্লাহর, গাহি বন্দনা—তাঁর সৃষ্টিসম, তুষ্টিসম; আরশসম, করুণাসম।

এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নারী সাহাবীরই
শিক্ষাদীক্ষা এবং পামল আখলাকের ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন।
গুরুত্বারোপ করেছিলেন তাদের ঐহিক ও পারত্রিক সফলতা ও
সৌভাগ্যের বিষয়েও। এমন অসংখ্য উদাহরণ শোভা পাচ্ছে সীরাত
হাদীস ও ইতিহাসগ্রন্থের পাতায় পাতায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যশোভায় যেসব মহীয়সী জ্ঞান ও প্রতিভার দ্যোতি ছড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আয়েশা^২ রাযিআল্লাহ্ আনহা। তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞান ও বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারিণী। একাধারে একজন বিজ্ঞ ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির। ধর্মীয় তাৎপর্যজ্ঞান তো ছিলই। বংশবিদ্যা, কাব্যজ্ঞানেও ছিলেন অতুলনীয়া। সাহিত্য ও ইতিহাসেও ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। চিকিৎসায়ও ছিল ভালো হাত-যশ। ইমাম শাবী রাহ, বলেন,

১. সহীহ মুসলিম।

হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে জানতে সীরাতে আয়েশা রাযি.. সাইয়্যেদ সুলাইয়ান
নদভী রাহ.. রাহন্মা প্রকাশনী বইটি পড়া যেতে পারে।

مِيلَ لِعائِشةَ رضي الله عنها يا أمَّ الْمُؤمِنِيْنَ هذَا القرآنُ تَلَقَيْنِه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلكِ الحلالُ والحرامُ. وهذا الشِعُرُ والنَسَبُ والأخْبَارُ سَمِعْتِها عن أبِيْكِ وغَيْرِه فَمَا بَالُ الطِّبِّ ؟ قالت : كانتِ الوُفُودُ تَأْيِي رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يَزَالُ يَشْكُوْ عِلَّتَه فَيَسْأَلُ عَنْ دَوَائِها فَيُحْبِرُه بِذَلِكَ فَحَفِظْتُ ما كانَ يَصِفُه وفَهِمْتُه

অর্থ : হ্যরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে উম্মূল মুমিনীন, আপনি কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে; হারাম-হালালের জ্ঞানও। কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ও বংশবিদ্যা অর্জন করেছেন হ্যরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহুর কাছ থেকে। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করলেন কার কাছ থেকে? তিনি বললেন, দিগ্বিদিক থেকে আরবের বহু প্রতিনিধিদল আসত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি বিভিন্ন রাগের কথা বলতেন, প্রতিষেধক চাইতেন। আমি বিজ্ঞ হেকিম ও কিৎসকদের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে গুনতাম, বুঝতাম ও আত্মস্থ দ্রতাম।

হ্যরত আবু মূসা আশআরী রাযি. বলেন,

مَاأَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عنه عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا

অর্থ : আমাদের কাছে কখনো কোনো হাদীস অস্পষ্ট লাগলে যখনই হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করতাম, তাঁর কাছে অবশ্যই কোনো না কোনো জ্ঞান লাভ করতাম।^২

ভেবে দেখুন, হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসসংখ্যা দুই হাজারেরও বেশি। ইমাম যুহরী রাহ্বলেন

১. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/১৯৭।

২ তির্বমিয়ী।

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ الناسِ كُلِّهِمْ وَأُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِيْنَ لَكَانَتْ عَائِشَةُ أَوْسَعَهُمْ عِلْمًا (رواه الحاكم)

অর্থ: যদি সকল সাহাবীর জ্ঞান, উম্মাহাতুল মুমিনীনের জ্ঞান একত্রিত করা হয়, তা হলে দেখা যাবে, হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার জ্ঞান সবার জ্ঞানকে ধারণ করে আছে।

বালাযুরী বিখ্যাত ফুতুহুল বুলদান গ্রন্থে লিখেছেন, উম্মূল মুমিনীন হযরত হাফসা বিনতে উমর ইবনুল খাতাব রাযিআল্লাহু আনহুমা জাহেলি যুগে শিফা আদাবিয়া নাম্মী জনৈকা নারীর কাছে আরবী লিপিশাস্ত্র আয়ত্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করার পর শিফা আদাবিয়াকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তিনি যেন হাফসাকে সুন্দর হস্তলিপিতেও পারদর্শী করে তোলেন।

শুধু পবিত্র স্ত্রীগণ বা নারী সাহাবীই নন, সাধারণ নারীদের মাঝেও আছে অনন্য উদাহরণ। উন্মে দারদা সুগরাকেই দেখুন, (মূল নাম : হুজাইনা বিনতে ইয়াহইয়া আসাবিয়া) তিনি উন্মতের জন্য কত জ্ঞানই না সংরক্ষণ করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবনসঙ্গী আবু দারদা রাযি. সহ হন্ধরত সালমান ফারসী রাযি., হ্যরত আয়েশা রাযি., হ্যরত আবু হরায়রা রাযি. প্রমুখ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সম্মানিত জীবনসঙ্গীর সামনে নিজের কুরআন উপস্থাপন করতেন। মহীয়সী এই তাবেন্ট নারী ইলমে, আমলে শহরত হাসিল করেছিলেন। তাঁর তাকওয়া-পরহেজগারি ছিল ঈর্ষণীয়। দুনিয়ার প্রতি মায়ামোহ কিছুই ছিল না তাঁর। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছিলেন। খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামালেও তিনি জীবিত ছিলেন। খলীফা আবদুল মালিক একবার বাইতুল মাকদিসে একটি পাথরের ওপর বসা ছিলেন। উন্মে দারদাও বসা ছিলেন। মাগরিবের আজান হলো। তিনি খলীফা আবদুল মালিকের কাঁধে ভর দিয়ে নামাযগাহে প্রবেশ করলেন। তিনি অনেক বড় আলেমা ও ফকীহা ছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে এসে দীনি ইলম হাসিল

১. হাকেম।

ফিরে এসো নীডে

করত। তিনি দরস করাতেন। খলীফা আবদুল মালিকও তাঁর দরসে বসতেন।

ফাতিমা বিনতে আলাউদ্দীন সমরকন্দী রাহ.। হানাফী ইতিহাসে উজ্জ্বল নাম। পিতার লেখা 'তুহফাতুল ফুকাহা' বাল্যকালেই আত্মস্থ করেছিলেন। আল্লাহ এই বিদুষী কন্যাকেও পিতার মতো ফিকহে অগাধ পাণ্ডিত্ব দান করেছিলেন। কত বড় বড় ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কাউকেই পিতা তাঁর যোগ্য মনে করেননি। অবশেষে যখন আবু বকর আল কাসানী রাহ. 'তুহফাতুল ফুকাহা'র বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাদাইয়ুস সানায়ে' রচনা করলেন এবং শ্রদ্ধেয় উস্তায সমরকন্দী রাহ.-কে দেখালেন তখন স্লেহধন্য শিষ্যের পাণ্ডিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি যোগ্য পাত্র পেয়ে গেলেন। প্রসন্ন হয়ে বিদুষী কন্যাকে বিবাহ দিলেন তার কাছে। মোহর কীছিল? জামাইয়ের স্বরচিত গ্রন্থ 'বাদাইয়ুস সানায়ে'। তাই উলামায়ে কেরাম বলতেন,

شَرَحَ تُحْفَتَه فَزَوَّجَهُ ابْنَتَه

অর্থ : কাসানী সমরকন্দীর তুহফার শরাহ লিখলেন, তাই সমরকন্দী কাসানীকে মেয়ে বিবাহ দিলেন।

সারা দেশ থেকে অগণিত ফতোয়া চাওয়া হতো। এতদিন ফাতিমা সমরকন্দীর এসব ফতোয়ায় থাকত ফকীহ পিতার দস্তখত। যখন বাদাইয়ুস সানায়ে-র লেখক তাঁকে বিবাহ করলেন তখন থেকে তাঁর ফতোয়ায় থাকত ফকীহ পিতা ও ফকীহ স্বামী দুজনেরই দস্তখত। ব্ সুবহানাল্লাহ!

খাওলা বিনতে সা'লাবা রাযি.। মহান আল্লাহ তাঁর প্রসঙ্গে কুরআন নাজিল করেছিলেন যখন তিনি জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাশে। তিনি বললেন,

১ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৯/৪৭।

২, আওদাতুল হিজাব : ২/৫৮৮।

يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكُلَ شَبَابِيْ, وَنَقَرْتُ لَه مَا فِي بَطْنِي, حتّى إِذَا كَبُرَتْ سِنِّيْ وانْقَطَعَ وُلْدِيْ, ظَاهَرَ مِنّيْ. اللّهُمَّ إِنِّيْ أَشْكُوْ إِلَيْكَ.

অর্থ: হে আল্লাহর রাসূল, আমার জীবনসঙ্গী আমার জীবন-যৌবন সব শেষ করেছেন, আমার উদরে যত সন্তানসন্তাবনা ছিল সবই তাকে উজাড় করে দিয়েছি; অথচ আজ তিনি আমার সাথে যিহার করলেন। আয় আল্লাহ, তোমার কাছেই আমার অভিযোগ, অনুযোগ!

হ্যরত খাওলা রাযি. যিহারের ব্যাপারে বিধান জানতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

حَرُمْتِ عَلَيْهِ

অর্থ : তুমি তার ওপর হারাম হয়ে গেছ।

কিন্তু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে যিহারের বিধানসংবলিত সূরা মুজাদালাহর কয়েকটি আয়াত নাজিল করলেন,

قَلْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِنَى إِلَى اللَّهِ * "وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ ওই নারীর কথা শুনেছেন, যিনি তার জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছেন এবং আল্লাহর কাছে তার কষ্টের অনুযোগ করছেন। আল্লাহ আপনাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।... –সূরা মুজাদালাহ : ০১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের বাইয়াত করাচ্ছিলেন। তিনি বললেন,

'আপনারা শপথ করুন যে, কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেন না।'

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বাইয়াতের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।
তিনি পর্দার আড়ালে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ফিরে এসো নীড়ে

তখনো তার উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেননি। রাস্লের কথা ভনে হিন্দ বললেন,

'আপনি তো আমাদের থেকে এমন প্রতিশ্রুতি নিচ্ছেন যা পুরুষদের থেকেও নেন না; ঠিক আছে, শপথ করছি। ...'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কখনো কিছুতেই চুরি করবেন না।'

হিন্দ বললেন,

'আল্লাহর কসম, আমি শুধু আবু সুফিয়ানের মাল থেকে একটু আধটু জিনিস সরাতে চাইতাম।'

আবু সুফিয়ানও মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা আগে যা হয়েছে, হয়েছে। ওগুলো মাফ করে দিলাম।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আপনি কি হিন্দ বলছেন?'

হিন্দ বললেন,

'হাঁ, আমি হিন্দ। অতীতে যা হয়েছে, সব ভুলের জন্য মার্জনা চাচ্ছি। আল্লাহও মার্জনা করুন।...'

এই হিন্দই উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হামজাহ'র শাহাদাতের পর তাঁর কলজে চিবিয়েছিলেন। যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত করানো চালিয়ে গেলেন, বললেন,

'কখনো ব্যাভিচার করবেন না।'

হিন্দ বললেন,

'মুহাম্মাদ, কী বলেন! কোনো স্বাধীনা নারীও ব্যাভিচার করতে পারেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াতের পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করে বললেন.

'কখনো সন্তানদের হত্যা করবেন না।'

ফিরে এসো নীড়ে

হিন্দ বললেন,

'আমরা আমাদের সন্তানদের ছোটবেলায় আদর-যতন ও লালন-পালন করে বড় করেছি। আর বড়বেলায় বদরের যুদ্ধে আপনি ও আপনার অনুসারীরা তাদের হত্যা করে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আপনি এবং আমাদের সন্তানরাই আমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন।'

হ্যরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু হেসে ফেললেন, এমন কি হেসে ওয়ে পড়ার উপক্রম হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াতের পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করলেন, বললেন,

'সামনে পেছনে কখনো কারো নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবেন না।'

এবার হিন্দ বললেন,

'অপবাদ আরোপ করা তো খুবই খারাপ; কিন্তু মুখ ফসকে দু-একটা কথা তো বের হতেই পারে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'কখনো কোনো সৎ কাজে আমার অবাধ্য হবেন না।'

হিন্দ বললেন,

'আরে, আপনার অবাধ্যই যদি হব, তো আপনার মজলিসে বসলাম কেন?'

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত উমর রাযিআল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আপনি নারীদের বাইয়াত করান এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ইস্তিগফার করুন।'

দেখুন, ইসলামের প্রথম সেনাপতি, মানবতার প্রথম শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। হযরত হিনদ রাযি.-এর কথাগুলোতে কোনো বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না, ধমকও দিলেন না।

১. আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ : ৪/২০৫।

এই ঘটনায় আর যা-ই প্রকাশ পাক, এটা তো অবশ্যই প্রকাশ পাচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর মতামতকে কতটা সম্মান দেখাতেন। কথা বলা বা সমালোচনা করার অধিকার নারীকে কতখানি দিতেন।

সীরাতগ্রন্থগুলো মুসলিম নারীর বাগ্মিতায়ও ভরপুর। বর্ণিত আছে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বিবাহ-শাদিতে মেয়েদের মোহরের বিষয়ে মুসলমানদের বাড়াবাড়ি দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাই মসজিদের মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও ছানার পর বললেন,

لَا أَعْرِفُ مَنْ زَادَ فِي الصَّدَاقِ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ فَقَدْ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصْحَابُه الصداقُ فِيمَا بَيْنَهُم أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُوْنَ دَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْد اللهِ أَوْ مَكْرَمَةً لَمَا سَبَقْتُمُوْهُمْ إلَيْهَا

অর্থ : আমি জানি না, কে মোহরের পরিমাণ চারশো দিরহামেরও বেশি করে দিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা কেরামের মোহর চারশো দিরহাম বা এর কাছাকাছি অথবা সামান্য কমবেশি হতো। যদি মোহরের পরিমাণ বেশি করা আল্লাহর কাছে অধিক তাকওয়া ও মর্যাদার বিষয় হতো, তা হলে তোমরা তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারতে না।

এ কথা বলে হ্যরত উমর রাযি. মিম্বর থেকে নেমে এলেন। অচিরেই জনৈকা কুরাইশিয়া নারী হ্যরত উমর রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলেন,

হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কি চারশো দিরহামের বেশি মোহর ধার্য করতে অনুৎসাহিত করেছেন?

তিনি বললেন, হাঁ।

ওই নারী বললেন, আপনি কুরআনের আয়াত শোনেননি?

তিনি বললেন, কোন আয়াতের কথা বলছেন?

তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ إِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْحٍ مَّكَانَ زَوْحٍ 'وَاتَيْتُمْ اِحْلَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا التَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَا وَاثْمًا مُبِينًا

অর্থ: আর যদি তোমরা একজন স্ত্রীকে বাদ দিয়ে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেল, আর সেই স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ সোনাদানা মোহর হিসেবে দিয়ে থাক, তা হলে তা থেকে কিছুই ফেরত নিয়ো না। তোমরা কি মিখ্যার আশ্রয় নিয়ে সুস্পষ্ট পাপাচার করে তা ফেরত নিতে চাও? –সুরা নিসা: ২০

হ্যরত উমর (রাযি.) বললেন,

'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, সব মানুষই দেখি উমরের চেয়ে ভালো বোঝে।'

এরপরই তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি করলেন,

أَصَابَتِ امْرَأَةٌ وَ أَخْطَأُ عُمَرُ

অর্থ : একজন নারী ঠিক বুঝেছেন; কিন্তু উমর ভুল বুঝেছেন।

চিন্তা করুন, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাযিআল্লাহু আনহু কত উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। মুসলিমসমাজে তাঁর কেমন সমীহ ছিল। অথচ তিনিই নির্দ্বিধায় একজন নারীর কথা শুনতে কুষ্ঠাবোধ করলেন না। অবলীলায় নিজের ভুল স্বীকার করে নিলেন এবং সেই নারীর মতকেই সঠিক বলে স্বীকৃতি দিলেন। এই ঘটনায় স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে কতটা সম্মান দান করেছে; ইসলামে নারীর মর্যাদা কতখানি।

সীরাত ও তারীখের গ্রন্থগুলোতে মুসলিম নারীর বুদ্ধিমন্তা ও বিচক্ষণতারও অনেক ঘটনা এসেছে। হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায়

১. হায়াতুস সাহাবা : ৩/২৭৫।

হিজরত করলেন তখন যৎসামান্য সম্পদ ছিল সবই সাথে নিয়ে চলে গেলেন। পরিবারের জন্য কিছুই রেখে গেলেন না। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহা বলেন,

فَأَتَانِيْ جَدِّيْ أَبُوْ فُحَافَةً وَقَدْ عَمِيَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا فَجَعَكُمْ بِمَالِه وَنَفْسِه. فَقُلْتُ : كَلَّا قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيْرًا فَعَمِدْتُ إِلَى أَحْجَارٍ فَجَعَلْتُهَا فِيْ كُوَّةِ النَّيْتِ وَغَطَّيْتُ عَلَيْهَا بِثَوْبٍ ثُمَّ أَحَذْتُ بِيَدِه ووضَعْتُهَا عَلَى النَّوْبِ فقلتُ : هذَا مَا تَرَكَه لَنا فقال : أَمَّا إِذَا تَرَكَ لَكُمْ هذَا فَنَعَمْ

অর্থ : তখন আমার দাদা আবু কুহাফা এলেন। তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি বললেন, আবু বকর নিজের ব্যাপারে তো তোমাদের বিপদে ফেলেছেই, অর্থসম্পদেও তোমাদের সর্বস্বান্ত করে রেখে গেছে, তাই না? তখন আমি বললাম, না না, তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছেন। তারপর আমি ঘরের কোণে কিছু পাথর জড়ো করে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলাম। দাদার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বললাম, এই যে দেখুন, আপনার ছেলে আমাদের জন্য কত কিছু রেখে গেছেন। তিনি বললেন, হুম... যদি এত কিছু রেখে গিয়ে থাকে তা হলে তো ঠিকই আছে।

ইসলামের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দেখি জিহাদের ময়দানেও নারীরা পুরুষের সাথে থেকেছেন। উদ্মে আম্মারা মাযিনিয়া রাযিআল্লাহ্ আনহা বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَقَدِ انْكَشَفَ الناسُ عَن رسولِ اللهِ وَمَا بَقِيَ إِلَّا نَفَرٌ يَتِمُّوْن عَشَرَةً وأنا وابْنَايَ و زَوْجِي بَيْنَ يَدَيْهِ نَذُبُّ عَنه و الناسُ يَرُّوْن بِه مُنْهَزِمِين و رَآنِيْ لَا تُرْسَ مَعِيْ فَرآى رجُلًا مُوْلَيًا مَعَهُ تُرْسٌ . فَقال لِصَاحِبِ التُرْسِ : أَلْقِ تُرْسَكَ لِمَن يقَاتِلُ ، فألْقى تُرْسَه فَأَخَذْتُه فَجَعَلْتُ أَتَتَرَّسُ به عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلى فَرَسٍ فَضَرَبَنِيْ فَتَتَرَّسْتُ لَه فَلَمْ يَصْنَعْ

সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ২/২৯০।

سَيْفُه شَيْنًا فَوَلَى فَأَضْرِبُ عُرْقُوْبَ فَرَسِه فَوَقَعَ على ظَهْرِه فَجَعَلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم يَصِيْحُ: يَا أُمَّ عَمَّارَةً أَمَامَكِ قَالَتْ: فَعَاوَنَنِيْ عَلَيْهِ حتى أُورَدْتُه شُعُوْبَ الْمَنِيَّةِ

অর্থ : আমি দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা মরক্ষিত অবস্থায় আছেন। তাঁর আশেপাশে সর্বসাকুল্যে দশজনের মতো হবেন। আমি, আমার দুই ছেলে এবং আমার জীবনসঙ্গী সামনে থেকে তাঁকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করছিলাম। অনেকেই পরাস্ত হয়ে ফিরে যাছিল। তিনি দেখলেন, আমার সাথে কোনো ঢাল নেই। একজন আহত সৈনিকের সাথে ঢাল দেখে তিনি বললেন, যুদ্ধরত কারো হাতে তোমার ঢাল ছুঁড়ে দাও। লোকটি তার ঢাল ছুঁড়ে দিলে আমি তা তুলে নিলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষার চেষ্টা করে যাছিলাম। এক অশ্বারোহী আমাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল এবং তরবারি দ্বারা আঘাত করতে লাগল। আমি ঢাল দ্বারা তার আঘাতকে প্রতিহত করতে থাকলাম। লোকটি না পেরে পলায়নপর হলে আমি তার ঘোড়ার পেছনের পা-জোড়ায় আঘাত করলাম। আরোহীসহ ঘোড়াটি পড়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে বলে উঠলেন, উন্মে আম্মারা, সামনে দ্যাখো। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সহায়তা করলেন। লোকটিকে আমি মৃত্যুপুরে নামিয়ে দিলাম।

সাফিয়া বিনতে আবদুল মুণ্ডালিব রাযিআল্লাহু আনহা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা ফুফু। তিনি পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন,

أَنَا أُوَّلُ امْرَأَةٍ قَتَلَتُ رَجُلًا ، فَقَدْ كَانَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ مَعَنَا فَمَرَّ بِنَا يَهُوْدِيُّ يَطُوْفُ بِالْحِصْنِ فَقُلْتُ لِجَسَّانٍ : مِثْلُ هذَا لَا آمَنُه عَلَى أَنْ يَّدُلَّ عَلَى عَوْرَاتِنَا

১. আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা : ৮/১৯৮।

فَقُمْ فَاقْتُلْهُ قَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بِصَاحِبِ هَذَا . فَاحْتَجَزْتُ - شَدَّتْ وَسُطَهَا - وَأَخَذَتُ عَمُودًا وَنَزَلَتُ فَضَرَبَتُه حَتِّى قَتَلْتُه

অর্থ : পরিখার যুদ্ধে আমিই প্রথম নারী, যে কোনো কাফেরের জীবনলীলা সাঙ্গ করেছিল। হাস্সান ইবনে সাবিত রাযিআল্লাহু আনহু আমাদের সাথে ছিলেন। আমাদের পাশ দিয়ে এক ইহুদি অতিক্রম করল। লোকটি দুর্গের পাশে ঘুরঘুর করছিল। আমি হাস্সানকে বললাম, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে আমাদের গোপন আস্তানার সন্ধান দিয়ে দেবে। যান, ওকে হত্যা করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন, আপনি তো জানেন যে, আমি এর যোগ্য নই। তখন আমি শক্ত করে কোমর বাঁধলাম এবং একটি কাষ্ঠফলক নিয়ে নিচে নেমে এলাম। তারপর লোকটিকে আঘাত করে মেরে ফেললাম।

হ্যরত উম্মে আতিয়া রাযিআল্লাহু আনহা বলেন,

غَرَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِيْ رِحَالِمِهُ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ رواه مسلم.

অর্থ : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাতটি গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি কাফেলার পেছনে থাকতাম এবং যোদ্ধাদের জন্য খাবার তৈরি করতাম।^২

রাফীদা আনসারিয়া রাযিআল্লাহু আনহা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তিনিও যুদ্ধাভিযানে বের হতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল আহত সৈনিকদের সেবাশুশ্রুষা ও চিকিৎসা করা। তাঁর জন্য একটি আলাদা তাঁবু ছিল। সেখানে আহত সৈনিকদের পৌছে দেওয়া হতো। রাফীদা আনসারিয়া রাযিআল্লাহু আনহা আপন প্রতিপালকের কাছে এ জন্য বিনিময়ের প্রত্যাশা করতেন। পরিখার যুদ্ধে যখন সাদ ইবনে মুআয

সীরাতে ইবনে হিশাম : ৩/২২৮।

२. সহীহ মুসলিম।

ফিরে এসো নীডে

রাযিআল্লাহু আনহু আহত হলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِجْعَلُوْهُ فِيْ خِيْمَةِ رَفِيْدَةً حَتَّى أَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ

অর্থ : সাদকে রাফিদার তাঁবুতে নিয়ে যাও। আমি শীঘ্রই তাকে দেখতে আসব।

ইসলামের শুরুর সোনালি যুগে রাজনৈতিক বিষয়াদিতেও মুসলিম নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহা তাঁর স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধর্মের বৈপরিত্ব গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।

বদরের যুদ্ধে তাঁর স্বামী আবুল আস ইবনে রবি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। হযরত যায়নাব রাযি. জানতে পেরে আবুল আসের মুক্তিপণস্বরূপ নিজের গলার হার পাঠিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারটি চিনতে পারেন। মক্কায় অবরুদ্ধ মেয়ের গলার হার দেখে স্লেহশীল পিতার হৃদয়ে দহন-যন্ত্রণা শুরু হয়। সাহাবা কেরামকে বলেন, তোমরা যদি যায়নাবের মুক্তিপণ নিয়ে আবুল আসকে ছেড়ে দিতে চাও, দিতে পারো। সাহাবা কেরাম আবুল আসকে ছেড়ে দিলেন।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হ্যরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহাকে মক্কা থেকে মদীনায় আনার জন্য লোক পাঠান। আবুল আসের পরিবার তাঁকে আটকানোর নানা ষড়যন্ত্র করলেও শেষমেশ তিনি যায়েদ ইবনে হারেসা রাযিআল্লাহু আনহুর সাথে পিতার কাছে চলে আসতে সক্ষম হন। আবুল আস মক্কায় থেকে যান।

একবার আবুল আস বণিকদলের সাথে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মুসলিম-বাহিনীর সাথে তাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। তিনি বাণিজ্যবহর

১. আল ইসাবাহ : ৮/৮২।

রেখে পালিয়ে যান। আবুল আস রাতের অন্ধকারে হযরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহার কাছে আসেন এবং নিরাপত্তার আশ্রয় ভিক্ষা করেন। হযরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহা তাকে নিরাপত্তার আশ্রয় দান করেন। আবুল আস মূলত অর্থসম্পদ ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা করছিলেন।

যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য বের হলেন। তিনি তাকবীরধ্বনি দিলে মুসলমানগণও তাকবীরধ্বনি দিলেন। তখন হযরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহা মেয়েদের কাতার থেকে উচ্চস্বরে বললেন.

হে লোকসকল, আমি আবুল আস ইবনে রবিকে নিরাপত্তার আশ্রয় প্রদান করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরিয়ে সাহাবা কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন,

আমি যা গুনতে পেলাম তোমরাও কি তা গুনতে পেয়েছ?

সাহাবা কেরাম আর্য করলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তিনি বললেন, কসম ওই সন্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি এ বিষয়ে কিচ্ছু জানতাম না। এইমাত্র তোমরা যা শুনেছ, আমিও তা-ই শুনেছি। তবে মুসলমানদের মধ্যে যে সবচে নগণ্য, সেও মুসলিম-সমাজে কাউকে নিরাপত্তার আশ্রয় প্রদান করতে পারে।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহার কাছে গেলেন এবং বললেন, মা, তুমি যাকে আশ্রয় প্রদান করেছ, তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করো। তবে সে যেন তোমার কাছে আসতে না পারে। তুমি তার জন্য বৈধ নও।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামের কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমরা চাইলে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে পারো, চাইলে নিয়েও নিতে পারো। এটা আল্লাহর গনিমত। এর হকদার তোমরাই। সাহাবা কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তা ফিরিয়ে দেব।

আবুল আস সম্পদ ফেরত পেয়ে মক্কায় চলে এলেন। তিনি যত পাওনাদার ছিল সকলের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। তারপর কুরাইশ লোকদের একত্রিত করে বললেন,

হে কুরাইশ, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি এখনো আছে, আমার কাছে যার পাওনা আছে?

সকলে বললেন, না। তোমাকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত ও সম্মানীরূপেই পেয়েছি।

আবুল আস বললেন, তা হলে শোনো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর কসম, তারা যখন আমাকে সসম্মানে ছেড়ে দিল, তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করব। কিন্তু তখন ইসলাম গ্রহণ করিনি। কেননা, তোমরা বলতে, তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্যই এমনটা করেছি। আমার আল্লাহ যেহেতু তোমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন, আর আমিও দায়ভার থেকে মুক্তি লাভ করেছি, সেহেতু আমার ইসলাম গ্রহণ করতে আর কোনো বাধা নেই।

এরপর আবুল আস রাযিআল্লাহু আনহু মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে এলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আপন স্ত্রীকে ফিরে পেতে চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব রাযিআল্লাহু আনহাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

মক্কা বিজয়ের বছর হযরত উদ্মে হানী বিনতে আবি তালিব রাযিআল্লাহু আনহা একজন কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন। কিন্তু তার দ্রাতা আলী ইবনে আবি তালিব রাযিআল্লাহু আনহু লোকটিকে হত্যা করতে চাইলেন। তখন উদ্মে হানী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার আপন ভাই এমন একজন লোককে হত্যা করতে উদ্যত, যাকে স্বয়ং আমি আশ্রয় প্রদান করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

১. সীরাতে ইবনে হিশাম : ১/৬৫৭-৬৫৮।

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيُ

অর্থ : হে উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় প্রদান করেছ, আমরাও তাকে আশ্রয় প্রদান করলাম।

ইসলামের ইতিহাসের মুসলিম নারীগণ অত্যাচারী শাসক-প্রশাসকের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সৎসাহস দেখাতে পিছপা হননি। অকুষ্ঠিত চিত্তে সত্য বলা থেকেও বিরত থাকেননি।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি.-কেই দেখুন। তাঁর কলিজার টুকরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-কে হত্যা করার পর কুখ্যাত জালেম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর ঘরে গেলেন এবং বললেন,

إِنَّ وَلَدَكِ أَخْدَ فِيْ هَذَا الْبَيْتِ وَإِنَّ اللهَ أَذَاقَه مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ وَفَعَلَ بِه مَا فَعَلَ

অর্থ : আপনার সন্তান স্বেচ্ছাচারিতা করেছে, তাই আল্লাহ তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছেন এবং তার সাথে যে আচরণ করার করেছেন।

হ্যরত আসমা রাযিআল্লাহু আনহা বললেন,

كَذَبْتَ واللهِ لَقَدْ كَانَ بارًا بِوَالدَيْهِ صَوَّامًا قَوَّامًا فَلَقَدْ أَخْبَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه سَيَخُرُجُ مِنْ ثَقِيْفٍ كَذَّابَانِ ,الآخِرُ منْهُمْ شَرِّ مِنَ الْأُوَّلِ وَهُوَ مُبِيْرٌ . أمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأْينَاهُ وأما الْمُبِيْرُ فَلَا أَخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ ، فَلَقَدْ أَفْسَدْتَ عَلَيْهُ دُنْيَاهُ وأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ

অর্থ: তুই মিথ্যা বলেছিস। আল্লাহর কসম, সে তার পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল। সদাসর্বদা সিয়াম-কিয়ামে রত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছিলেন, অচিরেই সাকিফে একজন মহা মিথ্যাবাদী ও একজন ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসুর আগমন হবে। শেষজন

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ফিরে এসো নীডে

প্রথমজন অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হবে। আমরা সেই মিখ্যাবাদীকে দেখেছি। আর রক্তপিপাসু, আমার তো মনে হচ্ছে তুই-ই সেই রক্তপিপাসু। আরে, তুই তো তার দুনিয়া খেলি; কিন্তু সে তো তোর আখেরাত খেল।

প্রিয় বোন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মানবতাবাদী নবুওয়াতি সাধনার মাধ্যমে এমন একটি সমাজ গঠন করে গেছেন যা সত্তিকার অর্থেই নারীবান্ধব। যা সবকিছুর সাথে সাথে নারীর যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করে। তিনি সর্ব উপায়ে নারীর সম্মান বৃদ্ধি করে গেছেন। শুধু আপন স্ত্রী-কন্যাই নয়, সকল মুসলিম নারীই তাঁর দেওয়া সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে স্নেহশীল পিতা, সার্থক জীবনসঙ্গী, বিজ্ঞ-বিনয়ী পথপ্রদর্শক। তাঁর অনুসারীরাও তাঁর দেখানো পথে চলেছেন এবং চলছেন আজীবন।

চতুর্থ অধ্যায় নর ও নারী: একে অপরের পরিপূরক

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

يَّأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاّعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ الِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

অর্থ: হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি অভিন্ন সন্তা হতে। তিনি সেই সন্তা থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন তার জুড়ি। আর সেই আদি জুড়ি থেকেই ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত নর ও নারী। তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, যার নামে তোমরা (নর ও নারী) একে অপরের কাছে অধিকার দাবি কর। এবং সম্মান করো গর্ভকে (মা জাতিকে।) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক। –সুরা নিসা: ০১

আলোচ্য আয়াতে মানুষের সৃষ্টিরহস্যের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক কিছু দিক উঠে এসেছে। এগুলো সঠিকভাবে চিন্তা করলে আমাদের জীবনদর্শনে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিশাল জগতের প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন। সাথে সাথে তার স্বরূপ ও প্রকৃতির সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনবিধানও অবতীর্ণ করেছেন। এই জীবনবিধান মুসলিম-সমাজের জন্য খুবই স্পষ্ট ও যৌক্তিক রূপরেখা এঁকে দিয়েছে; দাঁড় করিয়েছে শরীআতনির্ধারিত কিছু মূলকথা, মূলনীতি ও বিধিনিষেধ—যা ব্যক্তি ও সমাজকে পরিচালিত করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের দিকে।

কিন্তু তা সত্নেও মানবপ্রবৃত্তি অজ্ঞতা ও অন্যায়ের অন্ধকারে পা বাড়িয়েছে, তাই পথ হারিয়েছে। এর কুপ্রভাব সমাজের সর্বত্র পড়লেও পুরুষের তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী। নারীর মৌলিক ও মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো যেন একটু একটু করে ছিলে ফেলা হয়েছে, খুলে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু এভাবে কত দিন চলে। সময় ও সমাজ যে কথা বলে।
মানবতাবোধ ও মনুষ্যত্ব আবারও জাগ্রত হলো। নারীর ওপর থেকে
অত্যাচার দূর করার সদিচ্ছাও জন্ম নিল। নানা নীতিকথার রব উঠল।
শোরগোল শুরু হলো। কখনো এখান থেকে। কখনো ওখান থেকে।
সবাই চায় নারীকে তার পূর্ণ অধিকারটুকু দেওয়া হোক। কোনো ঘাটতি
না থাকুক। সে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু পাক।

সদিচ্ছার অভাব নেই। অভাব শুধু একটি জায়গায়। নারীর সাথে যে ন্যায়টুকু করতে চাওয়া হয়েছে তা মানবমস্তিক্ধ-নিঃসৃত ও মানবপ্রবৃত্তি-নির্ভর। নারীর স্রষ্টাপ্রদন্ত মূলনীতি থেকে দূরে, তাই নারীর প্রকৃতি ও স্বরূপ থেকেও দূরে। এভাবে নারীকে এমন কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে যেগুলো আসলে তার অধিকার নয়। আবার তার থেকে এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে যেগুলো মিশে আছে তার প্রকৃতিতে, প্রবৃত্তিতে; রগরেশায়, রক্তবিন্দুর কণায় কণায়।

ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। সেই সত্যিকারের জীবনদর্শনটি আর নেই যা নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের সঠিক দিশাটি দিতে পারত। অথচ পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٓ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَالَى

অর্থ : তিনি বললেন, আমাদের প্রতিপালক তো তিনি, যিনি সবকিছুকে দিয়েছেন তার যথার্থ সৃষ্টিরূপ। অতঃপর তাকে দান করেছেন সঠিক দিশা। –সূরা তৃহা : ৫০

আল্লামা কুরতুবী রাহ. আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

هذه الآيةُ تُبَيِّنُ أَنَّ اللهَ تعالى خَلَقَ العالمَ وأعْطى كلَّ شهيءٍ صُوْرَتَه وشَكْلَه الذي يُطَابِقُ الْمَنْفَعَة الْمَنُوطَة بِه، وأعْطى كلَّ شهيءٍ خَلْقَه مِن جِنسِه، ثُمَّ الذي يُطَابِقُ الْمَنْفَعَة الْمَنُوطَة بِه، وأعْطى كلَّ شهيءٍ خَلْقَه مِن جِنسِه، ثُمَّ

هَدَاهُ إلى مَنْكَحِه ومَطْعَمِه ومَشْرَبِه ومَسْكَنِه

অর্থ: এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ বিশ্বজগত সৃষ্টি করে সবকিছুকে উপকারী, উপযোগী আকার ও আকৃতি এবং গঠন ও প্রকৃতি দান করেছেন, শ্রেণিভেদও রক্ষা করেছেন; অতঃপর দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, প্রত্যেকের মিলনক্ষেত্র কী হবে, আহার্য কী হবে, আবাস কী হবে।

অর্থাৎ প্রতিটি জীব এই বিশাল অস্তিত্বে ক্রিয়াশীল এককভাবেও,
ামষ্টিকভাবেও। কিন্তু সেটা তার প্রকৃতি ও গঠনে প্রদন্ত প্রক্রিয়ার অধীন।
সুতরাং নর ও নারী একটি যুগল। তারা একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু
তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা। কেননা, মহান আল্লাহ আপন উদ্দেশ্য অনুযায়ী
তাদের মাঝে ভিন্নতা রেখেছেন এবং তাদের প্রত্যেকের ওপর আলাদা
আলাদা দায় ও দায়িত্ব আরোপ করেছেন। যেগুলো তাদের স্বভাব ও
প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শান্তিতে নোবেলবিজয়ী আমেরিকান গবেষক অ্যালাক্সিস কারলাইল তার বিখ্যাত আল ইনসানু যালিকাল মাজহূল গ্রন্থে লিখেছেন,

إِنَّ الاخْتلافاتِ الْمَوْجُودة بَيْن الرَّحلِ والْمَرْأَةِ لا تَأْيِنْ مِنَ الشَّكْلِ لِكُلُّ مِنْ الشَّكْلِ لِكُلُّ مِنْ اللَّمِيْمَ كُلِّه بِمَوَادُّ مِنْ مَنْ اللَّمِيْمَ كُلِّه بِمَوَادُ مِنْ مَنْ اللَّمْ اللَّمِيْمَ عُلِّه بِمَوَادُ كَالْمَ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

كِيْمَاوِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ يُفَرِّزُهَا المَبِيْضُ، وَلَقَدْ أَدَّى الجَهْلُ كِمَدِهِ الْحَقَائِقِ الجَوْهُرِيَّةِ بِالْمُدَافِعِيْنَ عَنِ الْأَنُوْنَةِ إِلَى الْاعْتقادِ بِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَلَقَّى الجِنْسَانِ تعليمًا واحدًا، وأن يَمْنَحَا سَلْطَاتٍ واحدةً، ومَسْؤُولِيَّاتٍ مُتَشَائِمَةً. والحقيقةُ أنَّ المرأةَ تَختلفُ اختلافًا كبيرًا عن الرَّجلِ فَكُلُ خَلِيَّةٍ من خَلَايَا جِسمِهَا تَحْمِلُ طَابِعَ جِنْسِهَا، وفَوقَ كُلِّ شهيءٍ بالنسبةِ لِجِهَازِها العَصَبِيِّ فالقوانينُ الفِسيُولُوجِيَّةُ غير قابلةٍ لِلِيْنِ شَأْئِها شأنَ قوانينِ العلم الكَوْكِيِيِّ فليس بالإمكانِ إحلالُ الرغباتِ الإنسانيةِ تَحَلَّها. فَعَلَى النِساءِ أن يُنَمِّينَ أهلِينَهُنَّ تَبْعًا لِطَينَعتِهِنَّ الرغباتِ الإنسانيةِ تَحَلَّها. فَعَلَى النِساءِ أن يُنمِّينَ أهلِينَهُنَّ تَبْعًا لِطَينِعتِهِنَّ دُون أن يُحَاوِلْنَ تَقْلِيدُ الذُّكُولِ فَإنَّ دَورَهُن أسْمَى مِن دَوْرِ الرحلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ اللَّه عَن وَظَائِفِهِنَّ الْمُحَدَّدَةِ

অর্থ: নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতাগুলো তাদের বাহ্যিক আকার থেকে নয়; বরং জীবদেহের কোষের সংস্থান ও গঠন থেকে এবং ডিম্বাশয় থেকে নির্গত নির্দিষ্ট জৈবিক পদার্থোৎপাদন থেকে সৃষ্ট হয়। পদার্থের এই মূল তত্ত্বটি বিস্মৃত হওয়ার ফলেই অনেকের মনে এমন ভুল ধারণা জন্ম নেয় যে, নারী-পুরুষ উভয়কে একই বিদ্যা রপ্ত করতে হবে, একই ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে হবে, একই কর্তব্য পালন করতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে, নর আর নারী সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণি। নারীদেহের প্রতিটি কোষই শ্রেণিগতভাবে তার অনুবর্তী। সর্বোপরি, স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ায় শারীরবৃত্তের সূত্রাবলি আর জ্যোতির্বিদ্যার সূত্রাবলি এক নয়। একটিতে মানবিক ঝোঁক ও প্রবণতা প্রযোজ্য হলেও অন্যটিতে প্রযোজ্য নয়। সুতরাং পুরুষের অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াস না করে নারীর উচিত নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্যতা বাড়ানো। তাদের মনে রাখা উচিত, তাদের ভূমিকা পুরুষের ভূমিকার চেয়ে মহৎ। তাই নিজের কর্তব্য বাদ দিয়ে অন্যের কর্তব্য নিয়ে টানাটানি করা খুব একটা সুমতি নয়।

মহান আল্লাহ নর-নারী প্রত্যেকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দান করেছেন। তাই তারা প্রতিনিয়ত একে অপরের সাথে মিলিত হতে সচেষ্ট হয়। এজন্য ইসলামী আইনে কিছু মৌলিক নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। যদি নর-নারী মিলিত হতে আগ্রহী হয়, তা হলে উভয়কেই একটি সঙ্গত পন্থা অনুসরণ করতে হবে। যার কল্যাণে একটি পরিবারের ভিত্তি, প্রকারান্তরে একটি সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয় পবিত্রতার ওপর, আভিজাত্যের ওপর এবং সংযমের ওপর। সেই অনুসরণীয় মূলনীতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বিবাহব্যবস্থা।

বিবাহব্যবস্থা

নর-নারী প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, যদি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর সামর্থ থাকে তা হলে বিবাহের উদ্যোগ নেওয়া। যাতে অবৈধ সম্পর্কে পতিত হতে না হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَرَوَّجُواْ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ يومَ القيامةِ ,ولَا تكونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النصارى.

অর্থ : তোমরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ো। কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের দিয়ে উন্মতের সংখ্যাধিক্যের গর্ব করব। তোমরা খ্রিস্টানদের বৈরাগ্যবাদে লিপ্ত হয়ো না।

কাজ্ঞ্চিত কল্যাণ

ইসলামে বিবাহের বিধান দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু কল্যাণকে সামনে রেখে। যেমন:

ক. মানবজাতির সংরক্ষণ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبْتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ

অর্থ: আল্লাহ তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জুড়ি। আর তোমাদের জুড়ি থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পুত্র ও পৌত্রাদি। আর তিনি তোমাদের দান করেছেন উত্তম রিজিক। তো তারা কি মিখ্যাকে বিশ্বাস করে আর আল্লাহর নেয়ামতকে করে অস্বীকার? –সূরা নাহল: ৭২

১. বাইহাকী, সুনানে কুবরা : ৭/৭৮।

তিনি আরও বলেছেন,

وَلَقَنْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً أُومَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّا فِيَ بِأَيْةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ اَجَلِ كِتَابٌ

অর্থ: আমি আপনার পূর্বে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছি। আমি তাদের দান করেছি স্ত্রী-সন্তান। কোনো রাসূলেরই এই অধিকার নেই যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন পেশ করবেন। মূলত প্রতিটি সময়েই ছিল নির্দিষ্ট কিতাব। –সুরা রা'দ: ৩৮

খ. চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা

বিবাহব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং খামখেয়ালি রোধ করা এবং মানুষের পদশ্বলনের অভিপ্রায়ে ওঁৎ পেতে থাকা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبِدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِيْنِه، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النصفِ البَاقِي

অর্থ: যখন আল্লাহর বান্দা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তার অর্ধেক ধার্মিকতা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখন তার কর্তব্য হলো, বাকি অর্ধেকটার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

يا مَعشَرَ الشبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ,وأَحْصَنُ للفَرْجِ , فَمَنْ لَمَّ يَسْتَطِعْ مِنْكُم الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بالصَّوْمِ . فإنَّ الصوْمَ لَهُ وِجَاءٌ) رواه البخاري.

অর্থ : হে যুবসমাজ, তোমাদের উচিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।
দৃষ্টি-রক্ষায় এবং লজ্জাস্থানের সুরক্ষায় এটা অধিক কার্যকর। তবে কারো
বিবাহের সামর্থ না থাকলে সে যেন রোযা রাখে। রোযা তার জন্য
প্রতিরোধক হবে।

১. হাকেম, সহীহুল ইসনাদ।

২. সহীহ বুখারী।

গ্, মনের স্থিরতা ও প্রশান্তি

বিবাহব্যবস্থার একটি কাজ্ঞ্চিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই যে, এতে মানবমনে স্থিরতা ও প্রশান্তি স্থাপিত হয়। এর কল্যাণেই মানুষ বিশ্বস্ত ও সৎ জীবনসঙ্গিনীর ছায়া লাভ করে। প্রত্যাশিত সন্তানের মায়া লাভ করে। রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلدُنْياَ كُلُّهَا مَتَاعٌ وخَيْرُ مَتَاعِ الدُنيَا الزَوْجَةُ

অর্থ : পুরো পৃথিবীই ভোগের সামগ্রী। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তুটি হলো সং জীবনসঙ্গিনী।

ঘ. জৈবিক চাহিদা পূরণের সঙ্গত পন্থা

বিবাহব্যবস্থা হলো মানব-মানবীর জৈবিক চাহিদা পূরণের সবচেয়ে সঙ্গত, সফল ও সুন্দর পস্থা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ : (হে পুরুষগণ,) স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য পোশাকতুল্য; তোমরা স্ত্রীগণের জন্য পোশাকতুল্য। –সূরা বাকারা : ১৮৭

বিবাহের বিধান

যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে পছন্দ করে এবং তাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার যৌক্তিকতা খুঁজে পায় তখন শরীআতনির্দেশিত পন্থায় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তাকে যে বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে পালন করতে হবে সেগুলো এই:

ক, প্রাথমিক প্রস্তাব

প্রথম পদক্ষেপ হলো, বিবাহের বিষয়ে কথা বলা। এক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী পুরুষের জন্য অভিভাবকদের উপস্থিতিতে নারীর মুখমণ্ডল ও করতলদ্বয়ে

১. সহীহ মুসলিম।

ফিরে এসো নীড়ে

ৃষ্টিপাত করা বৈধ। হযরত মুগীরা ইবনে ও'বাহ রাযি. যখন জনৈকা নারীকে বিবাহ করতে চাইলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤدَمَ بَيْنَكُمَا- رواه الترمذي

অর্থ : তুমি তাকে দেখে নেবে। সম্পর্কের স্থায়িত্বের জন্য এটাই ফলপ্রস।

বিবাহের কথাবার্তা যেহেতু নিছক একটা প্রতিশ্রুতিমাত্র, সেহেতু নির্জনে নারীর সাথে দেখা করা বৈধ হবে না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ فإنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ رواه أحمد

অর্থ : বৈধ নয় এমন নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ যেন নির্জনে সাক্ষাৎ না করে; কেননা, তাদের তৃতীয়জন হবে শয়তান।

খ. বিবাহচুক্তি

উভয় পক্ষ থেকে ইজাব ও কবুল পেতে হবে। এগুলো বিবাহচুক্তির মূল রুকন বা ভিত্তি। নারীর ইচ্ছা ও সম্মতি অনিবার্য। সুতরাং অভিভাবক নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার অপছন্দের কারও সাথে তাকে বিবাহে বাধ্য করতে পারবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُنْكَحُ الْبِكُوْ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا النَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

অর্থ : কুমারী মেয়ের বিবাহের জন্য তার অনুমতি নিতে হবে। আর অকুমারী নারীর বিবাহের জন্য তার নির্দেশ পেতে হবে।

১. তিরমিযী।

২. মুসনাদে আহমাদ।

৩. সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীড়ে

গ. বিবাহচুক্তির সাক্ষী

বিবাহচুক্তি-সম্পাদনে শরীআতনির্ধারিত শর্ত ও সংখ্যা অনুসারে নিষ্ঠাবান সাক্ষী আবশ্যক। এতে এই পবিত্র বন্ধনটি সুসংহত হবে। নারীর অধিকারের সংরক্ষণ হবে।

ঘ. অভিভাবকের উপস্থিতি ও একাত্মতা

বিবাহে অভিভাবকের উপস্থিতি ও সম্মতি বা একাত্মতাও ধর্তব্য। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أيًّا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِللٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِللٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِللٌ فَنِكَاحُهَا

بَاطِللٌ...

অর্থ : অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যে নারী বিবাহ বসে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।

তিনি আরও বলেছেন,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

অর্থ : অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হতে পারে না।

বিবাহচুক্তিতে অভিভাবকের শর্ত আরোপ করার কল্যাণটি বলাই বাহুল্য। এতে মেয়ের অবস্থানগত বিচার-বিবেচনা ও সার্বিক কল্যাণের দিকটি রক্ষিত হয়। তার সম্মান ও সম্রুমের অধিক নিশ্চয়তা-বিধান হয়। যে কেউ তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে যে প্রতারণা করবে সেই আশঙ্কা কম থাকে। দাম্পত্যজীবনে সংহতিও বিবেচনা পায়। কেননা, পুরুষরাই পুরুষদের হালচাল ভালো বোঝেন। পক্ষান্তরে মেয়ে অনেক সময়ই আবেগে তাড়িত হয়। প্রস্তাবকারী পুরুষের অনুভূতি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার সক্ষমতা তার খুব কম থাকে। বাহ্যিক বেশভূষা ও মিষ্টি কথাবার্তায় প্রতারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। একজন বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ, স্নেহশীল

১. আবু দাউদ।

২. আবু দাউদ

অভিভাবক বুঝতে পারেন, তার মেয়ের জন্য লোকটি ভালো হবে কি না।
তবে অভিভাবকের শর্ত আরোপ করার অর্থ এই নয় যে,
শরীআতনির্দেশিত কোনো কল্যাণ-অকল্যাণের বিবেচনা ছাড়া ওপু ওপু
মেয়ের বিবাহে বাধা সৃষ্টি করবেন। যদি যোগ্য পাত্র পাওয়া যায় এবং
তিনি ধার্মিক, চরিত্রবান হন তা হলে ওপু ওপু অভিভাবকের বাধা হওয়া

৬. মোহর পরিশোধ করা

উচিত নয়। এতে তিনি গোনাহগার হবেন।

বিবাহে মোহর নারীর শরীয়তনির্ধারিত অধিকার। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُّوهُ هَنِيْكًا يَ بِي

অর্থ: নারীদেরকে তাদের মোহর ভালোভাবে দিয়ে দাও। এরপর তারা যদি খুশিমনে তোমাদের কিছু দেয় তা হলে তা আরাম আয়েশে ভোগ করো। –সূরা নিসা: ০৪

মোহর নারীর একান্ত অধিকার। সে বৈধ পথে ইচ্ছেমতো খরচ করতে পারে। তার সম্মতি ছাড়া অভিভাবক সেখান এক চুল পরিমাণও নিতে পারবে না।

দয়া করে এমন ভুল বুঝবেন না যে, মোহর নারীর মূল্য; বরং এটা তাকে সম্মানপ্রদর্শনের একটা সাধারণ প্রতীকমাত্র। ইসলাম মোহরের জন্য কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং মেয়ের সম্মানে মোহর নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছে অভিভাবককে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَ إِنْ اَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ 'وَّاتَيْتُمْ اِحْدُهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَّاخَذُنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

অর্থ: আর তোমরা যদি এক স্ত্রীকে বাদ দিয়ে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও, আর সেই স্ত্রীকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে থাক, তা হলে তা থেকে কিছুই ফেরত নিয়ো না। তোমরা তা ফিরিয়ে নেবে কি মিখ্যাকে আশ্রয় করে, সুস্পষ্ট পাপাচার করে? কীভাবেই বা ফেরত নেবে, অথচ তোমরা একে অপরের কাছে গিয়েছিলে, আর তারা তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিল কঠিন প্রতিশ্রুতি? –সরা নিসা: ২০-২১

শরীআত যেহেতু কোনো সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি, সেহেতু কম হোক, বেশি হোক সেটা যুগ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী হবে, জীবনপ্রবাহের ধারা অনুযায়ী হবে। এটা প্রমাণ করে যে, ইসলামী বিধান যে কোনো সময় ও সমাজের জন্য প্রযোজ্য। নর-নারীর সম্মতিতে যে মোহর ধার্য হবে, কম হোক বেশি হোক, সমস্যা নেই। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হ্যরত আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন মোহর ধার্য করতেনং তিনি বললেন

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثُنَيَّ عَشْرَةً أَوْقِيَةً وَنَشًّا قالتْ : أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ ؟ قلتُ : لَا قالتْ : نِصْفُ أَوْقِيَةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ

অর্থ : তাঁর স্ত্রীদের মোহর হতো বারো উকিয়া এক নশ। নশ কী জানো? আমি বললাম, জি না। তিনি বললেন, এক উকিয়ার অর্ধেক। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের মোহর ছিল পাঁচশো দিরহাম।

সুতরাং কেউই মোহরের সর্বোচ্চ সীমানা নির্ধারণ করে দিতে পারেন না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এর বৈধতা দান করেছেন। তবে আমরা বলতে পারি যে, বিবাহের বিষয়টি সহজ করা উচিত। মধ্যমতাই এক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হতে পারে। কেননা, সর্ব বিষয়ে

১. সহীহ মুসলিম।

মধ্যমতাই শ্রেয়। তা ছাড়া, বিবাহ বিষয়টিকে সহজভাবে নেওয়াই সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

অর্থ : শ্রেষ্ঠ মোহর হলো যা সবচে সহজ হয়।

চ. প্রকাশ্যে বিবাহের ঘোষণা

প্রকাশ্যে বিবাহের ঘোষণা দেওয়াই কাম্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَعْلِنُوا هِذَا النِكَاحَ, واجْعَلُوهُ فِي الْمَساجِدِ, واضْرِبُوا عليهِ بِالدُفُوفِ

অর্থ : তোমরা প্রকাশ্যে বিবাহ সম্পন্ন করো। মসজিদে বিবাহ সম্পন্ন করো। (প্রয়োজনে) ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দাও।

ছ. বিবাহ অনুষ্ঠান বা ওলিমা

বিবাহ অনুষ্ঠানে অপচয় করা মাকরহ। পুরুষকে এত বেশি খরচ করতে বাধ্য করা যাবে না যে, পরবর্তীতে তার দাস্পত্যজীবনই ব্যাহত হয়। সর্ব বিষয়ে মধ্যমতা কাম্য। এখানেও মাঝামাঝি থাকা চাই। খরচপাতিতে একদম বাড়াবাড়ি করা, অথবা একেবারে কিছুই না করা—কোনোটাই ভালো নয়।

বিবাহপূর্ব প্রেম: একটি ভুল পথ

বর্তমানে অনেক ছেলেমেয়ে বলতে চায়, বিবাহের পূর্বে একে অপরকে জানার প্রয়োজন আছে, যাতে উভয়ের মধ্যে বনিবনা ভালো হয়, এজন্য পরিবারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অথবা পরিবারের অনুমতিতেই তারা একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, ঘোরাঘুরি করে, গল্পগুজব করে। তারা এগুলোকে বলে, পূর্বপরিচয় বা বিবাহপূর্ব প্রেম।

১ হাকেম।

২. আহমাদ, তিরমিযী।

ইসলামী শরীআতে এর কোনো ভিত্তি নেই। এটা অবলা নারীর আবেগ অনুভূতির সাথে শুধুই প্রতারণা। তার সম্মান সম্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এ ধরনের বিবাহ ও বিরহকে কখনোই ধর্মীয় ভিত্তি দান করা যাবে না। এটা শুধুই প্রবৃত্তির প্ররোচনা, হঠকারিতা। প্রায়ই এর পরিণতি হয় ব্যর্থতা। কেননা, এমন সম্পর্কে সত্যিকারের শক্তিটুকু থাকে না যে, হুদয়ের গভীরে স্থিতি লাভ করবে।

মানুষের আবেগ, অনুভৃতি, ভালোলাগা, ভালোবাসা ইত্যাদি অপার্থিব বিষয়গুলো মূলত যথাস্থানে যথাসময়ের জন্য সঞ্চিত থাকে। কিন্তু এ ধরনের অপ্রত্যাশিত মিলন ও সাক্ষাৎ এগুলোকে গলা টিপে হত্যা করে। এভাবে চলতে থাকলে যুবকরা অবৈধভাবে তাদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পেয়ে যায়। সুতরাং তাদের কাছে এমন বিবাহের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, যা তাদেরকে স্ত্রীর ভরণপোষণে বাধ্য করে, দাম্পত্যজীবনের হাজারও অনিবার্যতা তুলে ধরে। অবশেষে বৈধ পত্থায় বিবাহের দাবি তাদের কাছে হয়ে পড়ে অর্থহীন।

হে মেয়ে,

সুতরাং সতর্ক হও। আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে ছুটে যা পাবে, তা শুধুই প্রতারণা। একটি পূত-পবিত্র, নির্দোষ-নিদ্ধলঙ্ক জীবনের সম্ভাবনাকে গলা টিপে হত্যা কোরো না। কবি যাদের প্রতি করুণা করে বলেছেন তুমি তাদের মতো হয়ো না:

خَدَعُوْهَا بِقَوْلِهِمْ حَسْنَاءَ والْغَوَانِي يُغْرِهِنَّ الْنَنَاءُ

বাঁদরেরা ধোঁকা দিল সুন্দরী বলে। অবলারা ধোঁকা খেল প্রশংসা-ছলে।

মা আমার,

খামখেয়ালিতে গা ভাসিয়ো না। নিজের মর্যাদা ও আভিজাত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে কী পাবে? জেনে শুনে একটি পাতানো ফাঁদে পা দেবে? এতটুকু আত্মসম্মানবোধ তোমার নেই? এই যে অনৈসলামিক বিবাহগুলো, এর পরিণতি কী তুমি জানো? মনে রাখবে, যাদের সুরে সুর মিলিয়ে গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাবে, তারা তোমার সাথে থাকবে না। এসবের মন্দ পরিণতি একা নারীকেই পোহাতে হয়—শুধু একা পোহাতে হয়।

অত্যাচারিতা নারী অধিকার চায়, স্ত্রীত্বের সম্মান চায়, সন্তানের স্বীকৃতি চায়; অনু চায়, বস্ত্র চায়, আবাস চায়; কিন্তু লাভ হয় না। এ ধরনের বিবাহগুলো কোনো ধর্মীয় রেজিস্ট্রারে সংরক্ষিত থাকে না। সত্যিকারের মানুষ যারা, তাদের কাছে যাওয়ারও সুযোগ থাকে না। যাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকে, তারা মানুষই না। তারা পণ্ড, বরং পশুর চেয়েও খারাপ।

বাধ্য হয়ে নারী লাঞ্ছনাকর জীবন বেছে নেয়। হয়তো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহ করে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে—বিড়ালের রাগ গিয়ে পড়ে শুটকির ওপর।

এই অনিষ্ট রোধে

এই অনিষ্ট রোধ করা প্রয়োজন। নারীর সম্রম রক্ষা করতে হবে।
শরীআতের দিক-নির্দেশাগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। ইসলামী
সমাজকে সর্বপ্রকার খামখেয়ালি ও প্রবৃত্তির অনুগামিতা থেকে পবিত্র
রাখতে হবে। তাই মহান আল্লাহ ইসলামী বিধানে নারী-পুরুষ উভয়কে
বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দান করেছেন। মুসলিম নর-নারী
উভয়ই তা রক্ষা করে চলবে। সেগুলো এই:

ক. তাকওয়া ও খোদাভীতি

সদাসর্বদা নেক আমলের সাথে জুড়ে থেকে অন্তরকে আল্লাহমুখী রাখা, আল্লাহর রহমতের আশা ও গজবের ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা। তাকওয়া ও খোদাভীতির গুণে গুণান্বিত হওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.

قَلْبٌ شَاكِرٌ ، ولِسَانٌ ذَاكرٌ ، وزَوجةٌ صَالحةٌ تُعِيْنُكَ عَلَى أَمْرِ دِنْيَاكَ وَدِيْنِكَ وَمُوهِ مَا الْحُوْرَةِ الذَاهِ

خَيْرُ مَا اكْتَنَزَ النَاسُ

অর্থ: মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো শোকরগুজার দিল, জিকিরতাজা জবান এবং সতী বিবি, যে তোমাকে তোমার দীন এবং দুনিয়ার ব্যাপারে সহায়তা করবে।

খ. ঘরে প্রবেশে অনুমতি-প্রার্থনা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন.

لَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَ اَهْلِهَا لْذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ : হে ওই সব লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা অন্য কারো ঘরে অনুমতি গ্রহণ ও সালাম প্রদান করা ছাড়া প্রবেশ কেরো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। –সূরা নূর: ২৭

গ. একান্ত সাক্ষাৎ পরিহার করা

সতর্কতা-অবলম্বনে ইসলাম ধর্মে গায়রে মাহরাম নারী পুরুষের একান্ত সাক্ষাতও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, এতে প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার ও মনে কুমন্ত্রণার উদয় ঘটার আশঙ্কা থেকে যায়। পরিণতিতে আল্লাহর সাথে নাফরমানির ক্ষেত্র তৈরি হয়। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمِ

অর্থ : কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্ত সাক্ষাৎ না করে। অবশ্যই নারীর সাথে কোনো মাহরাম থাকতে হবে। ২

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

إِيَّاكُمْ والدُّحُوْلَ علَى النِسَاءِ . فقالَ رَجُلٌ يَا رسولَ الله أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قالَ الْحُمْوُ الْمَوْتُ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

১. বাইহাকী ফী ভআবিল ঈমান।

২. সহীহ বুখারী।

অর্থ: তোমরা কখনোই পরনারীর ঘরে যাবে না। জনৈক লোক জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, দেবর-ভাসুরের ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, দেবর-ভাসুর তো মৃত্যুসম।

ঘ. দৃষ্টির হেফাজত আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ 'لْزِلکَ اَزْکُی لَهُمْ 'اِنَّ اللهَ خَبِیْزُ بِمَا یَصْنَعُوٰنَ

অর্থ: আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত। একইভাবে মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন সৌন্দর্য প্রকাশ করে না বেড়ায়। তবে যা প্রকাশ পাওয়ারই, তার কথা আলাদা। তারা যেন বক্ষদেশে মাথার কাপড় নামিয়ে দেয়। তারা যেন স্বামী, পিতা, শ্বন্থর, সন্তান, স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) সন্তান, ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে, সচরাচর মেলামেশা হয় এমন নারী,

১. সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীডে

অধিকারভুক্ত দাসী, ইন্দ্রিয়বিকল অনুবর্তী পুরুষ, নারীভেদ বোঝে না এমন শিশু ছাড়া কাউকে সৌন্দর্য না দেখায়। কিংবা গোপনকৃত সৌন্দর্যের জানান দেওয়ার জন্য চলার সময় যেন পা দিয়ে আওয়াজ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। তবেই সফলকাম হবে। –সূরা নূর: ৩০-৩১

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা লজ্জাস্থানের হেফাজতের পূর্বে দৃষ্টির হেফাজতের কথা বলেছেন। কারণ, দৃষ্টি মনের অগ্রদৃত। সম্বোধন করা হয়েছে নারী-পুরুষ উভয়কে। সুতরাং প্রত্যেকের উচিত শয়তানের পাতানো ফাঁদে আটকা পড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা যা ফেতনায় ফেলতে পারে। হ্যরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্লিত, তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ ؟ فَقَالَ لِيْ : إَصْرِفْ بَصَرَكَ

অর্থ : আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঠাৎ ঘটে যাওয়া দৃষ্টিপাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।

এভাবে আবু সাঈদ খুদরী রাথি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কিছু নারী সামনে পড়লে তিনি বললেন,

يا مَعْشَرَ النِسَاء مَا رَأَيْتُ مِن ناقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَانِمِ مِنْ إَحْدَاكُنَّ، قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شهادةِ الرَّجُلِ . قُلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَان عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حاضَتْ لَمُ تُصلً وَلَمُ نَصُمْ ؟ قُلنَ : بَلَى. قالَ : فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَان دِيْنِهَا

অর্থ: হে নারীসকল, বিবেকবৃদ্ধি ও ধর্ম-কর্মে যাদের ঘাটতি আছে, তাদের মধ্য থেকে বিচক্ষণ পুরুষেরও মাথায় তালগোল পাকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অবিক পারঙ্গম আর কাউকে দেখিনি। তারা বললেন, আমাদের বৃদ্ধির ঘাটতি, ধর্মের ঘাটতি কী? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, সেটাই বৃদ্ধির ঘাটতি। আবার মাসিকের সময় কি নামায ও রোযার ঘাটতি থাকে না? তারা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, সেটাই ধর্মের ঘাটতি।

কবি বলেন,

كُلُّ الحُوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَظَرِ وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ فِيْ أَعْيُنِ الْعَيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْحَطرِ

যত বিপদের সূচনা—দেখা থেকেই হয়।
চোখ আছে যখন—তো না তাকালেই নয়।
অগ্নিকাণ্ড যেমন ঘটে আণ্ডনের ফুলকিতে
বিপদের ভয় তেমন, দু চোখের চাহনিতে।

৪. হিজাব ও পর্দা

সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তাআলা নারীর মাঝে এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা পুরুষকে এবং পুরুষের দৃষ্টিকে তার প্রতি আকৃষ্ট ও আকর্ষণ করে। তাই দৃষ্টি অবনত রাখার পাশাপাশি নারীকে হিজাব অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوَاجِكَ وَ بَنْتِكَ وَ نِسَاّءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَ 'لْلِكَ اَدْنَى اَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ 'وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

অর্থ : হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলে দিন তারা যেন শরীরে জিলবাব ব্যবহার করে। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, চির দয়ালু। −সূরা আহ্যাব : ৫৯

হিজাব শরীআহ-সম্মত হতে হলে

পর্দার জন্য ব্যবহৃত পোশাকের ব্যাপারে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সেগুলো খেয়াল রাখা নারীর অবশ্য কর্তব্য। যেমন:

প্রথম শর্ত

আপাদমন্তক ঢাকতে পারে এমন হতে হবে। অনেকে মনে করেন, মুখমগুল ও করতলদ্বয় আবৃত রাখা ওয়াজিব পর্যায়ের নয়; বরং মুস্তাহাব পর্যায়ের।

দ্বিতীয় শর্ত

ঢিলেঢালা ও প্রশস্ত হওয়া, যাতে শরীরের কোনো অংশের গঠনগত দিক স্পষ্ট না হয়।

তৃতীয় শৰ্ত

ঘন মোটা কাপড়ের হওয়া, যাতে কাপড়ের নিচ থেকে শরীরের কোনো অংশ দেখা না যায়। সহীহ মুসলিমে এসেছে,

صِنْفَانِ مِنْ أَهلِ النَّارِ لِمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِمَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسْنِمَةِ الْبُخْتِ النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسْنِمَةِ الْبُخْتِ اللَّالِكَةِ لَا يَدْخُلَنَ الْجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا اللَّائِلَةِ لَا يَدْخُلَنَ الْجُنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

অর্থ: দুই শ্রেণির জাহান্নামি আছে যাদের আমি দেখিনি। এমন কিছু মানুষ যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। এরা এই চাবুক দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে। এবং এমন কিছু নারী, যাদের গায়ে কাপড় থাকবে; কিন্তু তবু মনে হবে কাপড় নেই। এরা নিজেরাও পাপে লিপ্ত হবে। অন্যদেরও পাপে লিপ্ত করবে। এদের মাথা দেখে মনে হবে, বুখত

উটের কুঁজ, যেন দুলছে। এরা জান্নাতে তো যাবেই না; জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে অনেক অনেক দূর থেকে।

চতুৰ্থ শৰ্ড

শ্বরং পর্দার পোশাকটাই সৌন্দর্য ও চাকচিক্যভরা না হওয়া। যেমন, বিভিন্ন ডিজাইনের ফুল তোলা, নকশা করা, চকমকে বোতাম লাগানো ইত্যাদি। কেননা, পর্দার পোশাকের উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রতি পুরুষের শ্বভাবজাত আকর্ষণ যেন বাধাপ্রাপ্ত হয়়। অথচ এইসব পোশাকে আকর্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা; আকর্ষণ আরও বাড়ে। তা ছাড়া, কুরআনে আল্লাহ তাআলা মূল সৌন্দর্যপ্রদর্শনই নিষেধ করেছেন। তাই তো তিনি বলেছেন.

وَلا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

অর্থ : তারা যেন তাদের স্বামী ছাড়া কাউকে সৌন্দর্যপ্রদর্শন না করে।
−সূরা নূর : ৩১

পঞ্চম শর্ত

পোশাক ও গায়ে সুগন্ধি ব্যবহার না করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّنَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

অর্থ : যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে পরপুরুষের মধ্যে বের হলো সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য, সে ব্যাভিচারিণী বলে গণ্য হবে।

ষষ্ঠ শৰ্ত

পর্দার পোশাক পুরুষের পোশাকের মতো না হওয়া। কেননা, সবিকছুর মতো পোশাকের ক্ষেত্রেও আপন শ্রেণিস্বকীয়তা বজায় রাখা নারীর কর্তব্য। কেননা, যে নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে বা যে পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিশাপ করেছেন। ই

১. নাসাঈ, আবু দাউদ, তিরমিযী।

২. আবু দাউদ, হাকেম।

সপ্তম শর্ত

অমুসলিম নারীদের অনুসরণে পোশাক না বানানো। কেননা, এটা ইসলামী সংস্কৃতির পরাজয় স্বীকারের নামান্তর। নিজের সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া জাতীয় চেতনার পরিপন্থী। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বিষয়কে খুবই অপছন্দ করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন.

مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ : যে বিজাতীয় বেশ ধারণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

অষ্টম শর্ত

লোক দেখানোর মানসিকতা না থাকা। লোক দেখানোর জন্য আড়ম্বরতার আতিশয্য যেমন অপছন্দনীয়, তেমনই অনাড়ম্বরতাও অপছন্দনীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القيامَةِ ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا

অর্থ : যে দুনিয়ায় লোক দেখানো বেশভূষা ধারণ করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত করবেন। অতঃপর তাকে আগুনে ঝলসাবেন। ২

একটি আক্ষেপ, একটি আকৃতি

আজ অনেক মুসলিম নারীর পোশাক দেখে হতভম্ব হতে হয়। আত্মর্যাদাহীনতা আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে? শাড়ি, শর্ট কামিজ, জিন্স প্যান্ট, চোস প্যান্ট, ঘাগরা, লেহেঙ্গা যত সব বিজাতীয় বেপর্দা পোশাকে বাইরে বের হচ্ছে। অনেকের পাশ্চাত্যপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, মনে হয় মুসলিম হওয়াকে সে নিজের জন্য আপদ মনে করছে। কারণ, এটা এখন উল্টো স্রোত।

১. আবু দাউদ।

২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

অনেকে তো ধর্মীয় পোশাকের প্রতি বিদ্বেষ-বিষোদারে উঠে পড়ে লেগেছেন। কীসের মোহ তাদের এত উৎসাহ যোগাচ্ছে জানি না; কিন্তু তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছেন, অন্যেরও ক্ষতি করছেন; নিজেরাও ধোঁকা খাচ্ছেন, অন্যকেও ধোঁকা খাওয়াচ্ছেন।

অনেকের পক্ষে সরল মনে ইসলামনির্দেশিত পথকে আঁকড়ে থাকতে দিধার সৃষ্টি হচ্ছে। আধুনিক অনেক মডেল আকৃষ্ট করছে; আবার ইসলামী পোশাক বলেও ভ্রম হচ্ছে। কিন্তু মন দিয়ে বুঝে নিন, উপর্যুক্ত শর্তাবলির বাইরে যত জাত-পাতের পোশাক আমদানি হচ্ছে, কোনোটাই ইসলামী পোশাক নয়। এগুলোর সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।

আর কৃত্রিম সজ্জা—মেকআপ, দ্রুপ্রাক, নখ লাগানো, চুল লাগানো, উদ্ধি দেওয়া—এগুলো নাকি গো অফ দ্য ডে! মুসলিম নারী যেন ভুলে যাচ্ছে, সে মুসলিম। তার জীবন অনেক অর্থবহ। তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মহং। সে মহান স্রষ্টার পথনির্দেশে পরিচালিত। তার আছে উন্নত জীবনবিধান, আছে উন্নত জীবনদর্শন।

প্রিয় বোন,

তুমি ভূলে যেয়ো না তুমি মুসলিম, তুমি মুমিন। তুমি আল্লাহয় বিশ্বাসী, রাসূলে বিশ্বাসী। যারা লক্ষ্যহীন জীবনযাপন করে, ভোগ বিলাস আর আরাম আয়েশই যাদের চরম ও পরম পাওয়া, তুমি তাদের মধ্যে যেয়ো না। যারা মনে করে, সবকিছুই এমনি এমনি, তুমি তাদের হয়ো না। যারা বিপথে চলে গেছে, যারা আল্লাহর ক্রোধানলে পড়ে গেছে, তুমি তাদের পথে চোলো না। মনে রেখো, তোমার আল্লাহ তোমাকে বলেছেন,

وَقَرُنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ اَقِمْنَ الصَّلُوةَ وَ الِّيْنَ الزَّكُوةَ وَ اَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

অর্থ: আর তোমরা ঘরেই অবস্থান করো। প্রাচীন বর্বর যুগের মতো সৌন্দর্যপ্রদর্শনে বের হয়ো না। সালাত কায়েম করো। যাকাত আদায় করো। আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে আহলে বাইত, আল্লাহ তোমাদের থেকে অনিষ্ট রোধ করতে চান এবং চান তোমাদের পবিত্র রাখতে। −সূরা আহ্যাব : ৩৩

প্রিয় বোন,

ভালো করে মনে রেখো, দুনিয়ার নায়িকা-গায়িকার অনুকরণ তোমার জন্য নয়। তোমার মতো কেউ কৃত্রিম সাজ গ্রহণ করবে, কৃত্রিম বেশ ধারণ করবে, কৃত্রিম নখ লাগাবে, কৃত্রিম চুল লাগাবে, ভ্রুপ্রাক করবে, উলকি দেবে—এটা হতে পারে না।

তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এগুলো যারা করবে, তাদের অভিশাপ করে গেছেন। দ্যাখো, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্যাখো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রায়ি. বলেছেন,

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ والْمُتَنَمِّصَاتِ والْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ اللهُ اللهُ عليه وسلم الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ عليه وسلم

অর্থ: যে নারী উলকি দাগ লাগিয়ে নেয় আর যে দাগ লাগিয়ে দেয়, যে নারী দ্রকুন্তল উপড়িয়ে নেয় আর যে উপড়িয়ে দেয়, যে নারী কৃত্রিম সৌন্দর্য গ্রহণ করে, যে নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করে, আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করুন।

(ইবনে মাসউদ রাযি. বলছেন,) স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে অভিশাপ করেছেন, আমার কী হলো যে, আমি তাকে অভিশাপ করব না?

প্রিয় বোন,

সুতরাং নিজের সৌন্দর্যকে রক্ষা করো, গোপন করো। একটি সমাজকে নষ্ট করার কাজে ব্যবহৃত হয়ো না। নয়তো, যত পুরুষের দৃষ্টি তোমার ওপর পড়বে, সকলের পাপের ভাগী তুমি হবে। একটু ভেবে দ্যাখো, ঈমানের একটি সাধারণ শাখা হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ভেবে দ্যাখো, পথে ঘাটে পড়ে থাকা কষ্টদায়ক বম্ভতে কী এমন ক্ষতি হয়? কিন্তু তুমি যদি বেপর্দা চল, তাতে একজন মুসলিমের কত বড় সর্বনাশ হতে পারে? ভেবে দ্যাখো, একজন বেপর্দা নারীর কারণে একটি সমাজ নষ্ট হয়, একটি জাতি ধ্বংস হয়।

তাই এসো, কবি আয়শা তাইমুরিয়ার সুরে সুর মিলিয়ে বলি,

بِيَدِ الْعَفَافِ أَصُوْنُ عزَّ حِحَابِيْ مَا ضَرَّيْ أَدَبِيْ وَحُسْنَ تَعَلَّمِيْ مَا عَاقَيْ أَدَبِيْ عَنِ الْعُلْيَاءِ وبِعِصْمَتِيْ أَسْنُوْ عَلَى أَترَابِيْ وبِعِصْمَتِيْ أَسْنُوْ عَلَى أَترَابِيْ إلَّا بِكُونِي زَهْرَةَ الْأَلْبَابِ ولَا سَذْلَ الخِمَارِ بِلِمَّتِيْ وَنِقَابِيْ

পর্দা আমার গর্ব, সতীত্ব অহংকার;
করে না তা খর্ব—সুশিক্ষা, শিষ্টাচার।
আমার এ মতি, করে না ক্ষতি প্রগতির;
পবিত্রতার জ্যোতি, ছাড়িয়ে যায় গতি—প্রতীচীর।
আমি নই ক্ষণিকের ফুল, খেলার পুতুল;
আমি তো সমাজের মূল, জাতির মুকুল।
আমি সবাইকে যাই ছাড়িয়ে—পর্দা করেও;
আমি সবাইকে যাই পেরিয়ে ওড়না নেকাব পরেও।

পর্দানশীনরা পিছিয়ে থাকে না

আদি ইসলামের পর্দানশীনরা পিছিয়ে থাকেনি। ইসলাম কখনোই তাদের বন্দিদশায় ফেলে রাখেনি। সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করে, ইসলামী বিধান মেনে, শরঈ পর্দার পাবন্দি করে, নারী কর্মমুখর জীবনে অবতীর্ণ হতে পারে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সবকিছুতেই সতর্কতার প্রয়োজন। যেন তার কারণে সমাজে ফেতনা না

ফিরে এসো নীড়ে

হয়। শরীআতের বিধান লঙ্খিত না হয়। এই বিধিনিষেধ তার নিজের কল্যাণেও। সমাজের কল্যাণেও।

নামাযগাহে, ঈদগাহে মুসলিম নারীগণ বের হতে পারতেন। কেননা, তারা এসব শর্তের পূর্ণ পাবন্দি করতেন। শিক্ষার জন্য, শিষ্টাচারের জন্য, নিজ নিজ প্রয়োজনে বের হতেন। কখনোই ইসলামী বিধান, শরঙ্গ পর্দা লব্দ্যন করতেন না। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

لَا تَمْنُعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ

অর্থ : তোমরা আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর ঘরে আসা থেকে বাধা প্রদান কোরো না।

কারণ আল্লাহর ঘর প্রথমত আল্লাহর ইবাদতখানা। দ্বিতীয়ত দ্বীনি ইলম হাসিলের মারকায। আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমাবেশেরও কেন্দ্রবিন্দু। নববী যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমানভাবে ছিলেন আল্লাহর ঘরমুখী, মসজিদমুখী।

মুসলিম নারী নববী যুগে জিহাদে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পবিত্র স্ত্রীগণও বিভিন্ন বিজয়াভিযানে বের হয়েছেন। ইতিহাসগ্রন্থগুলো জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে মুসলিম নারীদের অবদানের সাক্ষী হয়ে আছে। উদ্দে আন্দারা মাযিনিয়া রাযি., উদ্দে সুলাইম রাযি., সাফিয়া বিনতে আবদুল মুন্তালিব রাযি. প্রমুখের মতো নাম না জানা অসংখ্য নারী আছেন যারা জিহাদে যার যার সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করেছেন। আয়েশা রাযি.-এর মতো আরও অনেক মহীয়সী আছেন যারা যুদ্ধের দাবানলেও নিজ নিজ দায়িতৃপালনে পিছপা হননি। রাফীদা রাযি.-এর মতো অনেক সাহাবিয়া আছেন যারা আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রম্বা ও চিকিৎসায় নিয়োজিত থেকেছেন দিনের পর দিন।

ইসলাম নারীকে অনুমতি দিয়েছে, সে শিক্ষা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বের হতে পারে। তবে ইসলামী হিজাব ও ইসলামী

১, সহীহ বুখারী।

শ্বভাবকে বুকে লালন করে। যদি মুসলিম নারী-ডাজার না থাকে, তা হলে পুরুষ-ডাজারেরও শরণাপন্ন হতে পারে। বেচাকেনা করতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সাক্ষী হয়ে আদালতে যেতে পারে। প্রয়োজনীয় কাজ করার কেউ না থাকলে কর্মক্ষেত্রেও নামতে পারে। হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় আমরা কী শিক্ষা পাই? মহান আল্লাহ বলছেন,

وَلَمَّا وَرَدَ مَا ءَ مَدُينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ * وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْمَرَ الْتَاسِ يَسْقُونَ * وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ الْمَرَ الْتَيْنِ تَذُودُنِ * قَالَ مَا خَطْبُكُمَا * قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ. وَ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا ٱنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

فَجَآءَتُهُ إِحْلُىهُمَا تَمُشِى عَلَى اسْتِحْيَآءٍ "قَالَتْ إِنَّ آنِ يَدُعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ آجُرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا "فَلَمَّا جَآءَةُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ "قَالَ لَا تَخَفْ هُ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ: মূসা মাদয়ানের জলাশয়ে পৌছে কিছু লোককে দেখলেন গবাদি পশুকে পানি পান করাতে। সবার পেছনে দেখলেন দুজন নারী। তারা তাদের পশুকে আটকানোর চেষ্টা করছিল। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, কী বিষয় আপনাদের? তারা বলল, রাখালরা না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পান করাতে পারব না। আমাদের আব্বা বয়োবৃদ্ধ। তখন মূসা তাদের পশুকে পান করালেন। তারপর একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে বললেন, আল্লাহ, তোমার করুলার আমার এখন বড় প্রয়োজন। তখন সেই দুজনার একজন এল লজ্জাবিজড়িত চরণে। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন আপনি যে আমাদের পশুকে পান করিয়েছেন তার প্রতিদান দেওয়ার জন্য। মূসা শুআইবের কাছে গেলেন এবং তাকে নিজের বৃত্তান্ত জানালেন। শুআইব বললেন, ভয় পেয়ো না, তুমি জালেম কওম থেকে নাজাত পেয়েছ। –সুরা কাসাস: ২৩-২৫

সুতরাং যদি জনজীবনে নারীকে আসতে হয় এবং সেজন্য তাকে ঘর থেকে বের হতে হয়, তা হলে তার করণীয় হলো শরীআতের যাবতীয় শিষ্টাচারকে আঁকড়ে ধরা; পোশাকপরিচ্ছদে, দৃষ্টির হেফাজতে, কথাবার্তায় শরীআতনির্দেশিত দিক-নির্দেশনাগুলো সামনে রাখা। কথায় নমনীয়তা পরিহার করা, কণ্ঠে কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করা, পথ চলতে গিয়ে এমন ভঙ্গিমা বর্জন করা যা পুরুষের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। তাকে মনে রাখতে হবে, তার আল্লাহ তাকে কী বলেছেন.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান করো। প্রাচীন বর্বর যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শনে বের হয়ো না। –সূরা আহ্যাব : ৩৩

সর্বোপরি, যত দূর সম্ভব, পরপুরুষ থেকে দূরে থাকা। অপ্রয়োজনে তাদের সাথে কথা বলা, তাদের সাথে কাজ করা থেকে বেঁচে থাকা।

দাম্পত্যজীবন

নর-নারীর মিলনের পথে যখন শরীআতের যাবতীয় বিধান অনুসৃত হবে, তখন নিঃসন্দেহে একটি পৃত-পবিত্র, অনিন্দ্যসুন্দর, আদর্শ পরিবার গঠন সম্ভব হবে। ইসলামের শীতল ছায়ায় গড়ে ওঠা এরকম একটি পরিবারে প্রয়োজন হবে একটি সর্বতোসুন্দর, আনন্দমুখর, মধুর দাম্পত্যজীবন। এজন্য ইসলামের বিধান নর-নারী উভয়কে কিছু দিক-নির্দেশনা দেয়। তারা উভয়ই এখন একে অপরের তরে। উভয়ই সর্বস্ব উজাড় করে দেবে উভয়কে সুখী করার জন্য। উভয়ের মনপ্রাণ আনন্দে ভরিয়ে দেবার জন্য। উভয়ের জীবনের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দেবার জন্য।

পুরুষ হবে নারীর দুর্ভেদ্য দুর্লজ্ঞ দুর্গের মতো। জীবন ও জগতের কোনো আঁচ তার গায়ে লাগতে দেবে না। নারী পাবে একটি বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী জীবনসঙ্গী। নারীকে সে গ্রহণ করবে একটি প্রস্কুটিত লাল টুকটুকে বা ধবধবে সাদা গোলাবের মতো ভালোবেসে। যার সুবাসে তার জীবন হতে পারে সুবাসিত। ভাগ্যাকাশে উদিত চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অসীম বিশ্ময়ে যার আলোয় তার জীবন হতে পারে আলোকিত। প্রেমের

উদ্যানে ফুলবতী-ফলবতী বৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতাভরে যার ফুলে-ফলে তার জীবন হতে পারে সুশোভিত।

এভাবে নারী হবে পুরুষের জীবনে গানে গানে মুখরিত সবুজ শ্যামল উদ্যান। যেখানে সে ছায়া পাবে, মায়া পাবে, শান্তি পাবে, প্রশান্তি পাবে। রোগনিরাময়কারী বনলতার মতো হৃদয়ের ক্ষতকে নিরাময় করবে। সান্তুনার শীতল প্রলেপ বুলিয়ে অশান্তির আগুন নির্বাপিত করবে। স্বচ্ছ, সুপেয় নির্বরের মতো প্রাণের তৃষ্ণা মেটাবে। স্পষ্ট, উজ্জ্বল আলোর মতো জীবনের ঝঞুাটে পথ দেখাবে। সে উপলব্ধি করবে এক স্বর্গায় সুখ। কেননা, সে পেয়েছে এক প্রেমময়ী জীবনসঙ্গিনী। সুখে দুখে পাশে থাকার মতো, আশায় হতাশায় প্রেরণা যোগাবার মতো একজন অন্তরঙ্গ জীবনসঙ্গিনী।

পঞ্চম অধ্যায়

দাম্পত্যজীবন: নারীর কর্তব্য

নিঃসন্দেহে ইসলামী আইন নর ও নারীর জন্য খুবই যৌক্তিক, সঙ্গত, সর্বতোসুন্দর দাম্পত্যজীবনের নিশ্চয়তাবিধান করে। তাই ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য যেমন কিছু অধিকার সাব্যস্ত করেছে, তেমনই কিছু কর্তব্য ও করণীয় আরোপ করেছে। নবীজীবনে আমরা এই অধিকার ও কর্তব্যের সুবিশদ বিবরণ পাই। স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করবেন, স্ত্রী তার স্বামীর জন্য কী কী গুণে গুণান্বিত হবেন, সবই আছে হাদীসে নববীতে, সুন্নাহর আলোক-আভায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন নারী শ্রেষ্ঠং তিনি বললেন,

الَّتِيْ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وتُطِيْعُهُ إِذا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ

অর্থ : এমন নারী—স্বামী যখন তার দিকে তাকায় তখন তাকে আনন্দিত করে। যখন কোনো কিছু আদেশ করে, হাসিমুখে পালন করে। আপন সন্তায় বা স্বামীর সম্পদে স্বামীর অপছন্দনীয় কিছু করে না।

১. আবু দাউদ, নাসাঈ।

ভালো স্ত্রীর গুণাবলি

১. উত্তম আনুগত্য

ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য একজন আদর্শ মুসলিম নারীর অপরিহার্য গুণ। তবে অবশ্যই তা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত ভক্তি ও ভালোবাসার তাগিদে হতে হবে। সাথে সাথে সেই আনুগত্যের মানদণ্ড হবে আল্লাহর রেজামন্দি। আল্লাহর নাফরমানিতে স্বামীর আনুগত্য কখনোই কাম্য নয়। সে জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.

لَا طَاعَةً فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

অর্থ : আল্লাহর নাফরমানিতে কোনো আনুগত্য হতে পারে না। আনুগত্য শুধুই ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে।

দাস্পত্যজীবনের সাথে সংশ্রিষ্ট বিশেষ বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর অপরিহার্য কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে শিথিলতা দৃষণীয়। রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزوجِهَا والذِيْ نَفْسُ محمدٍ بِيَدِه لا تُؤدِّيْ الْمَرَأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلِمًا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمُّ تَمْنُعْهُ

অর্থ: যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার অনুমতি দিতাম, তা হলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সেজদা করতে। ওই সন্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, নারী তার রবের হক পুরোপুরি আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ না তার স্বামীর হক পুরোপুরি আদায় করে। এমনকি, সে হাওদায় থাকা অবস্থায়ও যদি স্বামী তাকে চায় তা হলেও তার বাধা না দেওয়া উচিত।

১. সহীহ মুসলিম।

২. আহমাদ।

ফিরে এসো নীডে

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, স্বামীর আনুগত্য করা নারীর ওপর ওয়াজিব। সুতরাং সে স্বামীর আনুগত্য করে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে। কেননা, স্বামীর আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করা, সম্পদের দেখাশোনা করা—এগুলোও স্বামীর আনুগত্যেরই মধ্যে পড়ে। তার সম্পদের অপচয়-অপব্যয় না করাও এর শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الصّٰلِحْتُ قُنِتْتُ خفِظتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

অর্থ : সতীসাধ্বী নারীগণ অনুগতা, আল্লাহ যা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন অসাক্ষাতেও তার রক্ষাকারিণী... −সূরা নিসা : ৩৪

সুতরাং মুসলিম নারী স্বামীর অনুগতা হবে। এতে সে সওয়াবও পাবে, সোহাগও পাবে। কেননা, আনুগত্য ভালোবাসার সৃষ্টি করে। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে মজবুত করে। পক্ষান্তরে অন্যায় অবাধ্যতা আল্লাহর কাছে তো অপরাধী করেই, স্বামীর মনেও অপছন্দের সৃষ্টি করে। রাগ, অভিরোষ, বিবাদ, অভিযোগ ইত্যাদির জন্ম দেয়। দাম্পত্যজীবনের সুখ বিনষ্ট হয়। অনেক সময় পরিণতি হয় বিচ্ছেদ।

২. পারিপাট্য ও সৌন্দর্য

সৌন্দর্যপ্রীতি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। সৌন্দর্য অবলম্বনের প্রথম ক্ষেত্রই বলা যায় নর ও নারী। উপস্থিতি, আত্মপ্রকাশ, জীবনের শৈলী ছন্দ সবকিছুতেই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, লোকে চায় তার পোশাকটা সুন্দর হোক, পাদুকাটা সুন্দর হোক। তার মন্তব্য গুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

অর্থ : তা-ই তো, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

১ সহীহ মুসলিম।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন, তিনি বলেছেন,

خَيْرُالنسَاءِ مَنْ تَسُرُكَ إِذَا أَبْصَرُتَ ...

অর্থ : উত্তম স্ত্রী সে, যার প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত করলে তোমার ভালো লাগে...

সৌন্দর্য বলতে কিন্তু রূপ-লাবণ্যের কথা বলা হচ্ছে না। এগুলো বংশগত ব্যাপার। চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য নারীর মুখ্য বিষয় নয়। যেমনটা আজকালকার মেয়েদের মাথায় চুকতে শুরু করেছে। নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে তার ধর্মে, কর্মে; আচারে, ব্যবহারে; স্বভাবে, চরিত্রে এবং পরিপাট্যে। সুতরাং সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্র কিন্তু আমরা যেমনটা ভাবি তারচেয়ে ব্যাপক। বুদ্ধিমতী মেয়ে স্বামীর চিন্তজয়ে অনেক কিছু করতে পারে।

তাই বলে এমনটা ভাবারও দরকার নেই যে, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে পুরুষকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। যদি ধর্ম ও চরিত্রের সৌন্দর্যের সাথে চেহারার সৌন্দর্যও পাওয়া যায় তা হলে ক্ষতি কী? রাস্ল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلَحَسَبِهَا ولِحَمَالِهَا ولدِيْنِها فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرْبَتْ يَدَاكَ.

অর্থ: নারীকে বিবাহ করা হয় সাধারণত চারটি বিষয় দেখে: অর্থ দেখে, বংশ দেখে, সৌন্দর্য দেখে, ধার্মিকতা দেখে। তুমি কিন্তু ধার্মিক মেয়ে বেছে নাও। বুঝলে, হে!

৩. স্বামীর ভালোবাসা অর্জন

স্বামীর ভালোবাসা একটি বড় গুণ। এজন্য একজন বুদ্ধিমতী নারী অনেক কিছু করতে পারেন। ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, মন যুগিয়ে চলা, আনন্দ

১, তাবরানী।

২. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

দেওয়া, মিট্টি করে কথা বলা, সান্তুনা দেওয়া ইত্যাদি। স্বামী যখন ঘরে আসেন, তখন তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, সম্ভাষণমূলক সুন্দরতম বাক্য উচ্চারণ করা, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার প্রশংসা করা, তার ভালোলাগামন্দলাগা ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখা—এগুলোও স্বামীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ। স্বামীর ভালোবাসা অর্জনে এগুলো খুবই কাজে আসে। বরং স্বামীর ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করাটাই তাকে ভালোবাসার বড় প্রকাশ। স্বামী যদি খুব ছোট্ট কিছুও উপহার দেন, তাতেও অনেক আনন্দ প্রকাশ করা, কৃতজ্ঞতা জানানো স্বামীকে খুবই মুগ্ধ করে। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যায়। স্বামীর ভালোবাসা অর্জনে নারীর পরিচ্ছন্নতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহপ্রদন্ত ফিতরাতেরও লক্ষ্য রাখা উচিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াাসাল্লাম বলেছেন,

مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَة، و تَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ، و نَتْفُ الآبَاطِ و قَصُّ الشَّارِبِ

অর্থ : তলপেটের লোম চাঁছা, নখ কাটা, বগলের লোম তোলা, গোফ ছাঁটা ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত।

স্বামী যদি রাগ করেন, তা হলে স্ত্রীর কর্তব্য তার রাগ ভাঙানো। এভাবেও স্বামীর ভালোবাসা অর্জন করা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهلِ الْجَنَّةِ؟ الوَدُوْدُ ، الوَلُوْدُ، العَوُوْدُ، الَّتِيْ إِذَا طُلِمَتْ قَالَتْ هَذِهِ يَدِيْ فِيْ يَدِكَ لَا أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى

অর্থ : আমি কি তোমাদের জানাতি স্ত্রীদের কথা বলব? প্রেমময়ী, সন্তানপ্রসবা; যদি তার প্রতি রাগ করা হয় এবং তার দোষ নাও থাকে, তবু বলে, এই আপনার হাতে হাত রেখে বলছি, আপনার রাগ না ভাঙলে একটি দানাও মুখে দেব না।

১. সহীহ বুখারী।

২. দারাকুতনী।

আসলে আমরা যতভাবেই স্বামীর ভালোবাসা অর্জনের পথ ও পন্থা ব্যাখ্যা করি না কেন, একজন মা হিসেবে উমামা বিনতে হারেস যেভাবে বুঝিয়েছেন, সেভাবে বোঝানো সম্ভব হবে না। তিনি তার মেয়েকে বাসর রাতে স্বামীর কাছে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়েছিলেন,

أَيْ بُنَيَّةِ: إنكِ فارقتِ الجُوَّ الذِيْ مِنْهُ خرجتِ، وخلفتِ العشَّ الذي فيهِ درجتِ، إلَى وكرٍ لم تعرفيهِ، وقرينٍ لم تألفيهِ فأصبحَ بملكهِ عليكِ رقيبًا ومليكًا، فكوينْ لَهُ أمَةً يَكُنْ لكِ عبدًا وشريكًا.

يا بنية : احملي عني عشر حصالٍ تكن لكِ ذحرًا وذكرًا : الصحبّة بالقناعة والمعاشرة بحسنِ الطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفيه، فلا تقع عينه منك إلا أطيب ريح، والكُحُلُ أحسن الحسنِ، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقتِ طعامِه، والهدُوء عند منامِه، فإن حرّارة الجوع مُلهِبة، وتنغيص النوم مُبغضة، والاحتفاظ ببينيه ومالِه، والإرعاء على نفسه وحشمِه، فإن الاحتفاظ بالمالِ حسنُ التقدير والإرعاء على نفسه وحشمِه، فإن الاحتفاظ بالمالِ حسنُ التقدير والإرعاء على العيالِ والحشم حصنُ التدبير، ولا تُفشِي له سرًّا ولا تعصي له أمرًا فانك إن أفشيتِ سرَّه لم تأمني غدره، وان عصيتِ أمرَه أوغرْتِ صدره واعلمي أنكِ لن تصلي إلى ما تُحبِّينَ حتى تُؤثِرِي رضاه على رضاكِ وهواه على مقاكِ...

অর্থ: আমার ময়না, এই উদার আকাশ, এই উনুক্ত বাতাস, এই অনুকূল পরিবেশ আজ তোমার অতীত হতে চলেছে। এগুলোকে পেছনে ফেলে তুমি আজ এক অজানা জায়গায় যাচছ। এক অচেনা মানুষের কাছে যাচছ। আজ সে-ই তোমার সব। তুমি তার দাসী হয়ে থাকবে। দেখবে, তাকে জয় করে ফেলেছ। দেখবে, সে তোমার একটা অংশ হয়ে গেছে।

আমার মেয়ে, এই নতুন জীবনের পথে তোমাকে কিছু পাথেয় দিচ্ছি। এগুলো যত্ন করে রেখো:

সাথে থেকো, পাশে থেকো; খুশি থেকো, অনুগত থেকো। চোখের নড়াচড়া, নাকের নিঃশ্বাস আমলে নেবে; চোখ যেন সুন্দর কিছু দেখে, নাক যেন সুন্দর কিছু শোঁকে; সুরমা সবচেয়ে সুন্দর, জল সবচেয়ে সুগন্ধ। খাবার সময়ের খেয়াল রাখবে, ঘুমের ঘর শান্ত রাখবে; ক্ষুধার উত্তাপ আগুন ধরায়, ঘুমের ব্যাঘাত রাগ ধরায়। ঘর দেখাশোনা করবে, সম্পদ রক্ষা করবে। তাকেও খাওয়াবে, পরিজনকেও খাওয়াবে। সম্পদ রক্ষা করলে মান বাড়বে, পরিবার-পরিজনকে খাওয়ালে দাম বাড়বে। ঘরের কথা পরের কাছে কবে না, কোনো কথার অবাধ্য হবে না; ঘরের কথা পরের কাছে বললে রেহাই পাবে না। অবাধ্য হলে সুখ পাবে না। মনে রেখো, তুমি যা চাও তা কখনোই পাবে না যদি তার চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য না দাও।

বোন আমার,

তোমার দাস্পত্যজীবন হোক সুখে ঘেরা, সোহাগে ভরা। সারাজীবন স্বামীসংসার করে চুল পাকানো দাদিমার উপদেশগুলো হোক তোমার পাথেয়। তুমি পাও একটি শান্তি-সুখের নীড়।

৪. অঙ্গ্লেতৃষ্টি

মুসলিম নারী জানে, রিজিক আল্লাহর দান। আর দাম্পত্যজীবন একটি শেয়ার। এই শেয়ারের মূলধন কিন্তু পার্থিব ধন নয়, এই শেয়ারের মূলধন হলো আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসা। স্বামী যখন আল্লাহর ওয়াস্তে গ্রীকে ভালোবাসবে, তখন তার সবকিছুই হবে স্ত্রীর জন্য। তার সকল শ্রম সাধনা স্ত্রীর জন্য, পরিবারের জন্য। তার সকল অর্জন-উপার্জন স্ত্রীর জন্য, পরিবারের জন্য। আনুরূপ স্ত্রীও যখন আল্লাহর ওয়াস্তে স্বামীকে ভালোবাসবে, তখন সেই ভালোবাসা তাকেও স্বামীর প্রতি আন্তরিক হতে উৎসাহ যোগাবে। স্বামীর যা আছে, তা নিয়েই খুশি থাকতে উদ্বন্ধ করবে।

১. আহকামুন নিসা লিবনিল জাওয়ী : ৩১৫-৩১৬।

নিজের সখ আ্রাদের বশবর্তী হয়ে কখনোই স্বামীর কাছে বড় বড় আবদার ও বেশি বেশি আবদার করবে না। বলবে না যে, আমার এটা লাগবে, ওটা লাগবে; ঘরে এই নেই, সেই নেই ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِرْضِ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكِ تَكُنْ أَسْعَدَ الناسِ

অর্থ: আল্লাহর তোমার কপালে যা রেখেছেন, তাতে সম্ভষ্ট থেকো। দেখবে, সবচে সুখী মানুষ তুমি।

একজন যোগ্য, আদর্শ স্ত্রী যেমন রবের প্রতি কৃতজ্ঞ, তেমনই বরের প্রতিও কৃতজ্ঞ। অভিযোগ নেই, আপত্তি নেই। আক্ষেপ নেই, অতৃপ্তি নেই। যদি কখনো কোনো কারণে একটু মনোমালিন্য হয়ও, তা হলে চুপ থাকে; তর্ক করে না, কথা ধরে না। ফলে সহজেই সবকিছু মিটে যায়।

কবি বলেন,

خذِي العفو مني تستتريمي مودَّتي ولا تَنفُريني مودَّتي نقرَكِ الدُّن مَرَّهُ ولا تُنفُريني الشكوى الشكوى الشكوى المنفوى الي رأيت الحبَّ في القلبِ والأذى ولا تنطِقي في صورَتي ولا تنطِقي في صورَتي وين أغضب وإنك لا تدرين كيف المغيْث

১. তিবমিয়ী।

والقلؤب تَقلُبُ إذا اجتمعا لم يلبثِ الحبُ يذهبُ

আমার প্রিয়তমা. আজ নয় প্রেমালাপ, नग्न ইनिएम विनिएम वनाः যদি চাও ভালোবাসা শোনো, আমার ভালো ভাষা-ধৈর্য ধরো, সহনশীল হও তোমার আমার পথ চলা রবে চিরদিন, রবে অমলিন: ঢোলের মতো বাজিয়ো না আমায়. কোরো না বেশি অভিযোগ: প্রেমের শক্তি মিশে যাবে হাওয়ায়. বেড়ে যাবে অভিমান, অভিরোষ। ভালোবাসা হৃদয়ে, দহনে। যদি রাগ করি, তর্ক কোরো না; নিন্দা কোরো না গোপনে। এ কত কঠিন তুমি জানো না— মন থেকে মুছে যাবে নিমিষেই; মন যে এমনই-রং বদলায় পলকেই। ভালোবাসা তলিয়ে যায় অভিমানের অতলে।

পার্থিব বিলাসিতার প্রতি মুসলিম নারী কখনোই ঝুঁকে যেতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রীগণ যখন ভরণপোষণে প্রবৃদ্ধির আবেদন করেছিলেন, তখন পবিত্র কুরআনে নাজিল হয়েছিল, يَآيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَهِيْلًا

وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ: হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন এবং দুনিয়ার ভোগবিলাস কামনা কর, তা হলে চল তোমাদেরকে তোমাদের সামানপাতি দিয়ে সৌজন্যসহকারে মুক্ত করে দিই; আর যদি তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও আঝেরাত চাও তা হলে তো তোমাদের মতো সদাচারী নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন বিরাট প্রতিদান।
–সুরা আহ্যাব: ২৮-২৯

এভাবে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণকে তাঁকে অথবা পার্থিব সুখকে বেছে নেওয়ার ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলেন তখন উম্মাহাতুল মুমিনীন অকুণ্ঠচিত্তে তাঁকেই বেছে নিয়েছিলেন। পার্থিব জীবনের বিলাসিতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। নবীপরিবারের অভাব-অনটন, টানা-হেঁচড়া, টানাপোড়েনকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। ভাবুন তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত আনন্দিত হয়েছিলেন! তাঁর কত গর্ব হয়েছিল। আমাদের প্রকৃত আদর্শ এই মহীয়সী নারীগণই। তাঁদেরই অনুসারী আমরা। যে মহাসৌভাগ্য তাঁদের পদচুম্বন করেছে, তা আমাদেরও প্রাপ্য। আমরা কেন অন্যদের কথা তনব। কেন আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে ছুটব।

৫. হতাশ না হওয়া

প্রিয় বোন,

দাম্পত্যজীবনের মনোমালিন্যকে কখনোই বড় করে দেখো না। কখনোই হতাশ হয়ো না। এটা খুবই স্বাভাবিক। খুবই সাময়িক। যদি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা সম্ভব হতো, তা হলে নবীপরিবার অবশ্যই মুক্ত থাকত। কখনো যদি কোনো বিষয়ে মনোমালিন্য হয় তা হলে তোমার প্রথম করণীয় হলো—মনোমালিন্যের মূল জায়গাটি খুঁজে বের করা এবং সঙ্গত উপায়ে তা দূর করার চেষ্টা করা।

মনে রাখবে, পূর্বে ঘটে যাওয়া ঝামেলাকে, পূর্বে মিটে যাওয়া বিষয়বস্তুকে কখনো নতুন করে তুলবে না, নতুন করে জাগাবে না। যেটা খাপবদ্ধ করেছ, খাপবদ্ধই থাকুক। যা মনের কবরে পুঁতে ফেলেছ, তা পোঁতাই থাকুক। তা না হলে, একটির ওপর আরেকটি সমস্যা, তার ওপর আরেক সমস্যা—এভাবে জমতে জমতে সমস্যার পাহাড় জমে যাবে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। সবসময়ই সমঝোতার মানসিকতা রাখবে। সমাধানের পথ খুঁজবে। হঠকারিতা করবে না। জেদ ধরে থাকবে না। মনোমালিন্যের আলোচনায় খুব চিন্তাভাবনা করবে। শান্ত থাকবে। যেন একটি সুন্দর সমাধান আসে। যা তোমাকে সুখী করে। তোমার প্রিয় মানুষটিকে সুখী করে। তর্ধু নিজের কথা ভাববে না। এটা স্বার্থপরতা। মনে রাখবে, মুমিন নারী স্বার্থপর হয় না। একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা, একে অপরের জন্য কল্যাণকামিতাই যেন হয় আলোচনার মূল ভিত্তি।

প্রিয় বোন,

মনে রাখবে, এ তোমার সম্পদ। নিজের সম্পদে ক্ষতিসাধন করতে কেউ বা কিছু তোমাকে প্ররোচিত করবে—এমন যেন না হয়। সংযম রেখো। তোমার আল্লাহর দেওয়া বোধ ও বিবেককে, বিবেচনাশক্তির পাথেয়কে কাজে লাগাও। একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা, একে অপরের ভালো করার, ভালোবাসার কথা কখনো মন থেকে মুছে ফেলো না। মনে রেখো, মুমিন নারী অকৃতজ্ঞ হয় না।

নর-নারী উভয়ের কর্তব্য হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনোমালিন্যের অবসান করা। দুজনের মাঝে সমঝোতা আনা। বিলম্ব করলে শয়তান পথ পেয়ে যায়। একটি শান্তি-সুখের নীড় ভেঙে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। শয়তানকে সফল হতে দেবে না। সে আমাদের দুশমন। সে সদলবলে লেগে আছে তোমাকে বিপথে নেওয়ার জন্য। বিপদে ফেলার জন্য। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। প্রিয় বোন,

জেনে রেখো, দাস্পত্যজীবন মানিয়ে নিতে একটু সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। দুজন দুজনাকে বুঝে উঠতে একটু সময় লাগতে পারে। ধৈর্য ধরো। ধীরতা-স্থিরতা অর্জন করো। ত্বরাপ্রবণতা বর্জন করো। দাস্পত্যের তরীটা জীবনসমুদ্রে শাস্ত ও স্থিরভাবে চলুক। একটু পরেই পেয়ে যাবে তীর। চির সফল, চির সুন্দর, চির সুখের নীড়।

৬. সবর ও তাওয়াকুল

আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধারণ করা এবং সুখে দুখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করা মুসলিম নারীর বড় গুণ। স্বামী যদি অভাবী হয় তা হলে সে ধৈর্যধারণ করবে। তার ধৈর্যের বদৌলতে আল্লাহ একসময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবেন। সে জানে, আল্লাহ কখনোই তার মুমিন বান্দাদের ধ্বংস করেন না। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এগুলো সাময়িক। সম্পদ সকালে আসে, সন্ধ্যায় যায়। এটা একটা পরীক্ষা। ধৈর্যের পরীক্ষা। সে আল্লাহর ওপর কতটা ভরসা করতে পারে তার পরীক্ষা। সুতরাং মুসলিম নারী সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আনন্দে, আগ্রহে। সে উত্তম ফল পাবে। উত্তম পুরস্কার পাবে। সে হতাশ হবে না। সে জানে, তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنكَمْ تَوَكَّلُوْنَ على اللهِ حقَّ توكِّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يرزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وتَرُوْحُ بِطَانًا

অর্থ: তোমরা যদি আল্লাহর ওপর সত্যিকারের ভরসা করতে পার, তা হলে তিনি তোমাদের রিজিক দান করবেন যেভাবে একটা পাখিকে রিজিক দান করেন। পাখি খালি পেটে সকালে বের হয়। ভরা পেটে সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে।

ইমাম বুখারী রাহ.ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি একই অর্থ ধারণ করে। যাতে

১. জামে সগীর।

ফিরে এসো নীড়ে

পাই, হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে ফিলিন্তিন থেকে মক্কায় আসেন। মক্কা তখন ধুধু মরুভূমি। গাছপালা নেই। লতাপাতা নেই। জনমানবশূন্য। শুধু লু-হাওয়া, তপ্ত বালু, প্রখর রোদ। পানি নেই। প্রাণী নেই। এমন এক প্রতিকূল পরিবেশে তিনি স্ত্রীসন্তানকে রেখে গেলেন। তাদের সাথে ছিল সামান্য খেজুর ও পানি। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন ফিরে যেতে চাইলেন, তখন হাজেরা আলাইহাস সালাম শুধু জানতে চাইলেন, আল্লাইহাস সালাম বললেন পরম প্রত্যয়ে, তা হলে তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না। হাজেরা আলাইহাস সালাম আপন প্রতিপালকের ওপর কতটা ভরসা রেখেছিলেন! কতটা কঠিন পরীক্ষা তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন অপরিসীম বিশ্বাসে! ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে ফিরে এলেন। বাইতুল মাকদিসে দু হাত তুলে দুআ করলেন.

رَبَّنَا َ إِنِّى آسُكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِى بِوَادٍ غَيْدِ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ 'رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ افْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِئَ الْيُهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرُتِ لِيُعِمْ وَارُزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرُتِ لَيُعَمِّمُ يَشْكُرُونَ لَكَمَّدُ مَنَ الثَّمَرُتِ لَعَلَمُهُمْ يَشْكُرُونَ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, তোমার পবিত্র গৃহের কাছে একটি নিঃক্ষেত উপত্যকায় আমি আমার বংশধরকে রেখে গেলাম; হে আমার প্রতিপালক, এ আশায় যে, তারা সালাত কায়েম করবে। সূতরাং তুমি তাদের প্রতি মানুষের হৃদয়কে ঝুঁকিয়ে দাও। তাদেরকে দান করো ফলফলাদি থেকে। তারা যেন কৃতজ্ঞ হয়। –সূরা ইবরাহীম: ৩৭

হাজেরা আ. আপন সন্তানকে নিয়ে একাকী নির্জন মরুভূমিতে থেকে গেলেন। অচিরেই পানি ফুরিয়ে গেল। পানির খোঁজে ছুটলেন এদিক থেকে ওদিকে। ওদিক থেকে এদিকে। সাফা থেকে মারওয়ায়। মারওয়া থেকে সাফায়। অবশেষে আল্লাহ সাহায়্য করলেন। পাখির আকৃতিতে ফেরেশতা পাঠালেন। পাখি ডানা দিয়ে মাটি খুঁড়ল। আল্লাহর হুকুমে পানি বের হলো। হাজেরা অঞ্জলি ভরে ভরে শিশু ইসমাঈলকে পান করালেন।...

হাজেরা আ.-এর সবর ও তাওয়াকুলের প্রতি সম্মানার্থে মহান আল্লাহ জমজম কৃপ উৎসারিত করলেন। হারাম শরীফের অতি নিকটে এই কৃপ এখনো আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পানীয় হয়ে। শেফা হয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁর স্মরণে আল্লাহ হজের গুরুত্বপূর্ণ আমল হিসেবে নির্ধারণ করে দিলেন সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার বিধান।

প্রিয় বোন,

মনে রেখো, তুমি হাজেরার উত্তরসূরী। ত্যাগ ও বিসর্জনের, ধৈর্য ও তাওয়াক্লুলের অনুপম আদর্শে ভরা তোমার ইতিহাস। তা হলে তুমি কেন এই মহৎ গুলে গুণান্বিত হবে না। হাজেরার সম্মান কি তুমি পেতে পার না? ধৈর্য ও তাওয়াক্লুল তোমাকে শুধু সুখীই করবে না; মহৎও করবে। কিন্তু এই বিশ্বাসও রেখো যে, তুমি পার হয়ে যাবে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে। অত্যন্ত সম্মানের সাথে। তোমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا `

وَّ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَمْ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ اِنَّ اللَّهَ بَالِخُ اَمْرِهٖ ۚ فَتَنْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا

অর্থ: আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য বের করে দেবেন সমাধানের পথ। তিনি তাকে এমনভাবে রিজিক দান করবেন যে, সে ভাবতেও পারবে না। যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ নিজের কাজ পূর্ণ করেই নেন। নিশ্চয় তিনি নির্ধারণ করেছেন সবকিছুর একটি নির্দিষ্ট সীমা। –সূরা তালাক: ২-৩

৭. সুখে দুখে পাশে থাকে

মুসলিম নারী সুখে দুখে, হাসি কান্নায়, বিপদে আপদে, সচ্ছলতায় অসচ্ছলতায় সর্বাবস্থায় জীবনসঙ্গীর পাশে থাকে, সাথে থাকে। তাকে সাহস যোগায়। প্রেরণা যোগায়। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রাযি.

হযরত খাদিজা রায়ি, সম্পর্কে জানতে ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী অন্দিত, রাহনুমা প্রকাশনী হতে
প্রকাশিত গল্পে আঁকা মহীয়সী খাদিজা রায়ি, বইটি পড়া য়েতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা কে না জানে? যখন রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহিপ্রাপ্ত হয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরলেন, তখন হযরত খাদিজা রাযি. কত আবেগপূর্ণ ভাষায় রাসূলের হৃদয়ে সান্ত্বনার শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিলেন,

كَلَّا واللهِ مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أبدا إنك لتَصِلُ الرحِمَ، وتحمِل الكَلَّ، وتكسِبُ المعْدُوْمَ وتَقْرِي الضيفَ وتُعِيْنُ على نَوَائِبِ الحَقِّ

অর্থ : কখনোই নয়। কিছুতেই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করতে পারেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। অথর্বের ভরণপোষণ করেন। নিঃম্বের নিঃস্বতা দূর করেন। অতিথিকে সম্মান করেন। দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়ান।

এভাবে একের পর এক সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করে করে নিজের সহায় সম্পদ সবকিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে হযরত খাদিজা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহায়তা করেছেন। সুখে দুখে তাঁর সাথে থেকেছেন। বিপদে আপদে পাশে থেকেছেন। হতাশা দূর করেছেন। হ্বদয়ে সাহস যুগিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই প্রতিকূলতার মুখেও দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন এরকম একজন বিশ্বস্ত, ত্যাগী জীবনসঙ্গিনীর কল্যাণেই। মুসলিম নারীর আদর্শ তো ইনি। ইনিই তো প্রেরণা, সুখে দুখে পাশে থাকার। যুগে যুগে একসাথে পথ চলার।

মুসলিম নারী তার পুরুষের জীবনে এমন একজন সঙ্গিনী হয়ে আবির্ভূত হবে যে, তাকে পেয়ে সে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাবে। জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সার্থকতা পাবে। একটি উদ্দেশ্যে সফল হবে। তো আরেকটি উদ্দেশ্যে ধাবিত হবে। এভাবে অর্জন আর প্রাপ্তিতে ভরে উঠবে জীবন। জীবন হবে অর্থবহ সার্থক।

১. সহীহ বুখারী।

মুসলিম-ইতিহাসে এমন নারী একটি দুটি নয়, অসংখ্য। যাদের ছোঁয়ায় জীবনের দুর্গম পথ হয়েছে সুগম। কণ্টকাকীর্ণ পথ মনে হয়েছে কুসুমান্তীর্ণ। জাতি পেয়েছে সত্যিকারের মানব মানবী। সফল মানব মানবী। যারা উন্নতির উচ্চ শিখরে। উচ্চে, অতি উচ্চে। যাদের চলা লেগে জীবন হয়েছে গতিশীল। পৃথিবী পেয়েছে মহামানব। তাই তো বলা হয়,

وَرَاءَ كُلِّ رَجُلٍ عظيمٍ امْرَأَةٌ

অর্থ : প্রত্যেক মহামানবের পেছনে আছেন কোনো না কোনো নারী।
শায়খ মুস্তফা সাদিক রাফিঈ বড় সত্য কথা বলেছেন,

إِنَّ المرأة العظيمة هِيَ المرأةُ التي تَسْتَطيْعُ أَن بَحْعَلَ مِنَ الرحلِ شَخْصِيَّةً أَعْظَمَ منْهَا

অর্থ : সত্যিকারের মহামানবী তিনি, যিনি একজন পুরুষের মধ্য থেকে তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বটি আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

৮. কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা

একজন কৃতজ্ঞ, বিশ্বস্ত নারী প্রতিটি মুসলিম পুরুষের লালিত স্বপ্ন। কোনো মুসলিম পুরুষ কখনোই চান না যে, তিনি চোখ খুলে দেখবেন তার স্ত্রী অন্য কারও বুকে। প্রতিটি মুসলিম পুরুষই কামনা করেন, সুখে দুখে সদাসর্বদা তার জীবনসঙ্গিনী আমৃত্যু তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকুক। খেয়ে থাকুক, না খেয়ে থাকুক; তারই থাকুক। তার যা আছে, তা নিয়েই গর্বকরুক। তার যা নেই, তাতে ধৈর্য ধরুক। এমনকি, সে কামনা করে, তার মৃত্যুর পরও তার স্ত্রী তার দাম্পত্যজীবনের স্মৃতিকে বুকে লালন করুক কৃতজ্ঞতার সাথে, কৃতার্থতার সাথে।

এক্ষেত্রে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাযি.-এর জীবনসঙ্গিনী নায়েলা। শক্ররা যখন হযরত উসমান রাযি.-কে হত্যা করার জন্য হামলা চালাল তখন এই নায়েলা নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জীবনসঙ্গীকে বাঁচাতে ছুটে গেলেন। স্বামীর ওপর আঘাতকে প্রতিহত করতে হাত দিয়েই চেপে ধরলেন তরবারি। কেটে পড়ে গেল হাতের আঙুলগুলো।

শহীদ জীবনসঙ্গীর মরদেহ নিয়ে শোকে কাঠ হয়ে রইলেন তিনি। গভীর রজনী। দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো দাফনকার্য।

প্রিয়তম জীবনসঙ্গীর স্মৃতিকে ধারণ করে থেকে গেলেন নায়েলা। কত নামী দামী লোক বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল। মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানও প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি যাকে পাঠিয়েছিলেন, নায়েলা তাকে বললেন.

'কীসে মুআবিয়াকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেছে?'

লোকটি বললেন, 'আপনার যা সবচেয়ে আকর্ষণীয় তা।'

নায়েলার সৌন্দর্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল তাঁর সামনের পাটির দাঁতগুলো। তিনি সাথে সাথে ভেতরে গেলেন এবং সজোরে আঘাত করে করে দাঁতগুলো উপড়ে ফেললেন। এরপর লোকটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন

'যাও, আমি উসমানের স্ত্রী; আর যেন কেউ আমার প্রতি আগ্রহবোধ না করে।'^১

১. আল আ'লাম রিযযারাকলি : ৭/৩৪৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

দাম্পত্যজীবন: নারীর অধিকার

অনেক নারীরই জিজ্ঞাসা, নারীকে এত দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়, এতসব গুণে গুণান্বিত হতে হয়—আনুগত্য থেকে গুরু করে, ধৈর্য, ত্যাগ, নমনীয়তা, সদাচার, ঘর দেখাশোনা, সন্তান লালন-পালন সবই করতে হয়; কিন্তু এত কিছু করে নারী কী পায়? নারীর অধিকার বলে কিছু আছে কি? পুরুষের জন্য যখন নারী এত কিছু করবে, এতভাবে করবে, তখন নারীর জন্য পুরুষের কি কিছইু করার নেই?…

বিশেষত বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর দায় অনেক বেশি। স্ত্রী হিসেবে এক দায়। মা হিসেবে আরেক দায়। মেয়ে হিসেবে অন্য দায়। শুধু কি তা-ই, নারীকে এখন উপার্জনও করতে হয়। ঘরের কাজ, পরের কাজ দুটোই করতে হয়। এত কিছু সত্ত্বেও যেন পুরুষই সব। পরিবারের মূল চাবি পুরুষের হাতে। সে-ই গৃহকর্তা। সে-ই মান্য। সে-ই গণ্য। সে তার সব অধিকার অক্ষরে অক্ষরে আদায় করে নেয়। একটু ঘাটতি সহ্য করে না। তার এক কথা একশো কথার সমান।...

কিন্তু নারী যখন কিছু চায়, নারী যখন সন্তানকে একটু কোলে নিতে বলে বা সন্তানের কান্না থামাতে বলে, তখন সে এত রেগে যায় কেন? সে কেন বলে, এটা আমার কাজ নয়?... নারী মা। নারী স্ত্রী। নারী মেয়ে। তাই তাকে ঘরের কাজ, পরের কাজ সবই করতে হবে। কিন্তু পুরুষ স্বামী। পুরুষ বাবা। পুরুষ ছেলে। তাই তাকে ঘরের কাজ করাটা মানায় না। স্ত্রীকে একটু সহযোগিতা করা, তার কাজটা একটু হালকা করার চেষ্টা করা, কিছুই তাকে শোভা পায় না। বিষয়টা কি এমনই?...

সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে জীবনের চাহিদা, জীবনের দায় অনেক বেশি। কিন্তু উপার্জন সীমিত। প্রায়ই এমন হয় যে, শুধু স্বামীর উপার্জনে সংসার চলে না। পরিবারের সব দায় মিটে না। পরিবারের সকল সদস্যের মৌলিক প্রয়োজনগুলো—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন পূরণ করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া প্রত্যেকেরই একটু স্বাদ-আহ্লাদ বলে কিছু থাকে। তাই বাধ্য হয়ে নারীকেও কাজ করতে হয়। কিন্তু এত কিছুর পর, পুরুষের স্বামিত্ববোধ প্রভুত্ববোধ পর্যন্ত গড়ায়। জীবনটা যেন একটু সহজ হয়, নারী যেন একটু শান্তি পায় পুরুষ যেন তা চায়ই না।...

কোনো সন্দেহ নেই, নারীর সাথে এমন আচরণ করা অন্যায়। ইসলামী শরীআত এমন নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম যে পথ ও পস্থা বাতলে দিয়েছে, ইসলামী জীবনদর্শন যে কর্মবন্টন-নীতি নির্ধারণ করেছে, তাতে এসব স্বেচ্ছাচারিতার কোনো অবকাশ নেই। এমন আধিপত্যকামী, আগ্রাসী মানসিকতার ইসলামে কোনো জায়গা নেই। তবে বলতেই হবে, আজকের নর-নারী যে জটিলতার মুখে পড়েছে, তা ইসলামের সরল পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণেই।

ইসলাম দাম্পত্যজীবনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নির্ধারণ করেছে; যাতে পরিবার-ব্যবস্থা সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি—ইসলামী পরিবার—যেন সুসংহত ও মজবুত হয়। ইসলামী জীবনদর্শনের এই মূলনীতিগুলোর আলোকে স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে সেগুলো আলোচনা করার প্রয়াস পাব:

১. ভরণপোষণ

ইসলামী জীবনদর্শন স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর আরোপ করেছে। ভরণপোষণ বা খোরপোশ স্ত্রীর মৌলিক অধিকার। পানাহার, পোশাকপরিচ্ছদ ও বাসস্থান এর অধীন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

اَلرِّ جَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمُوَالِهِمُ * فَالصَّلِحْتُ قُنِتْتُ خَفِظتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظ اللهُ * وَالْتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ * فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا * إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

অর্থ: পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। কেননা, আল্লাহ তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তা ছাড়া তারাই পয়সাকড়ি খরচ করে। সুতরাং সতীসাধ্বী নারী অনুগত থাকবে; আল্লাহ যা রক্ষা করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, অসাক্ষাতেও তা রক্ষা করে চলবে। আর তোমরা যাদের ব্যাপারে দুর্ব্যবহারের ভয় করবে, তাদেরকে উপদেশ দেবে; কাজ না হলে বিছানা পৃথক করে দেবে, তাতেও কাজ না হলে চূড়ান্ত পর্যায়ে মৃদু প্রহার করবে। যদি তারা অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে অনর্থক অজুহাত খুঁজবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুউচ্চ, সুমহান। –সুরা নিসা: ৩৪

সুতরাং পুরুষের ওপর নারীর তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এজন্যই বিবাহে পুরুষকেই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তাব পাঠাতে হবে। মোহর আদায় করতে হবে। ভরণপোষণ করতে হবে। এটা নারীর প্রতি পুরুষের কর্তব্য এবং পুরুষের ওপর নারীর অধিকার।

অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান বনাম স্বত্ব-স্বামিত্ব-প্রভৃত্ব

মনে রাখতে হবে, পুরুষকে 'অভিভাবকত্ব' দেওয়া হয়েছে। 'সত্ব-স্বামিত্ব-প্রভূত্ব' দেওয়া হয়নি। সুতরাং নারীকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। আবার ইসলামবিদ্বেষী তথাকথিত নারীবাদীরা যে প্রোপাগাভা চালায় তাও সত্য নয়। ইসলামী আইন একে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেননা, ইসলামী জীবনদর্শনে আমরা যা পাই, তাতে দাম্পত্যজীবনে নারী-পুরুষ একে অপরের শরীক। আর এই শরীকানার ভিত্তি পারিবারিক বিষয়ে পারস্পরিক মতৈক্যের ওপর, সমঝোতার ওপর। ২. আলাদা ও আরামদায়ক বাসস্থান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُهِ كُمْ وَلا تُضَاّرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

অর্থ: তোমরা সামর্থ অনুযায়ী নিজেরা যেমন ঘরে থাক, তেমন ঘরে তাদেরও থাকার ব্যবস্থা করো। তাদের ওপর সংকট সৃষ্টি করার জন্য তাদের কষ্ট দিয়ো না। –সূরা তুলাক: ০৬

একটি আলাদা ও আরামদায়ক বাসস্থান নারীর জীবনকে সুখকর করে। অনেক সময়, স্বামীর অন্য পরিবার-পরিজনের সাথে থাকতে যদি বনিবনা না হয়, জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তা হলে একটি আলাদা বাসস্থান নারীর জন্য আবশ্যক। সাথে সাথে সেখানে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও থাকতে হবে। যেন তার জীবন ধারণ কষ্টকর ও সংকীর্ণ হয়ে না ওঠে।

হ্যরত মুআবিয়া ইবনে হায়দা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের ওপর আমাদের স্ত্রীদের অধিকার কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِنْ طَعِمْتَ, وتَكْسُوهَا إذا اكتسَيْتَ, ولَا تَقْبَحَ الوَجْهَ, ولا تَضْرِبَ

অর্থ : সামর্থ অনুযায়ী খাওয়ানো, পরানো; গালিগালাজ না করা, মারধর না করা।

এরপর আর একটি বর্ণনায় আছে.

ولا تُهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

অর্থ : তাকে ঘরে রাখা।...

১, আবু দাউদ।

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা

দেখুন, মানবতার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে কত সুন্দর আচরণ করতেন। তিনি তাঁর অনুসারী সকল পুরুষের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন, কীভাবে স্ত্রীর সাথে আচরণ করতে হয়। হযরত আয়েশা রাযি.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের প্রতি কেমন ছিলেন? উত্তর দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি বললেন.

كَانَ يَكُوْنُ فِي مِهْنَةِ أهلِهِ فإذَا حَضَرَتِ الصلاةُ خَرَجَ إلى الصلاةِ

অর্থ : তিনি পরিবারের কাজকর্মও করতেন। যখন নামাযের সময় হতো, তখন নামাযে বের হতেন।

সে-ই সর্বোত্তম যে পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُ كُمْ لِأَهْلِهِ وَ أَنَا خَيْرَكُمْ لِأَهْلِي

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম। আমি আমার স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম।

স্ত্রীকে সহযোগিতা করলে পুরুষের অসম্মান হয় না

সুতরাং ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করায় পুরুষের সম্মান একটুও কমে না। পৃথিবীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মহৎ ও শ্রেষ্ঠ মানুষ দ্বিতীয়টি নেই। তিনিই যখন ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে পেরেছেন, তখন তাতে অসম্মান বোধ করা কোনো সম্মানী পুরুষের পক্ষেই উচিত নয়।

১. সহীহ বুখারী।

২. তির্মিযী।

ফিরে এসো নীডে

তা ছাড়া সন্তান লালনপালনে অংশগ্রহণ করা পুরুষের ওপর ওয়াজিব। তিনি যদি সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল হন তবেই তো প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পাবেন। বিশেষত আল্লাহ যেখানে নারীকে বাইরের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছেন সেখানে (যেমনটি বর্তমানে ঘটছে) বাইরের দায়-দায়িত্বও নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া; সেই সাথে ঘরের দায়দায়িত্বও একা নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া—একে অন্যায় ছাড়া আর কী বলা যায়? কোনো বিবেকবান পুরুষকেই এটা বলে কয়ে বোঝানোর প্রয়োজন আছে, বোধ করি না।

ভাবা উচিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম স্ত্রীকে বাইরের দায়দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছেন। তারপরও ঘরের কাজে সহযোগিতা করেছেন।

নারীর দেবারও আছে, নেবারও আছে

একের পর এক বোঝা স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া, সেই সাথে কোনো ক্রিটি পেলে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা—খুবই অমানবিক, অশোভন, অমার্জনীয়। প্রতিটি পুরুষের মাথায় রাখা চাই, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أُوَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ : আর নারীদের যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি আছে অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর নারীদের ওপর পুরুষদের আছে এ স্টি বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। –সূরা বাকারা : ২২৮

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, পুরুষের প্রতি নারীর যেমন অনেক কর্তব্য আছে, তেমনই তার অনেক অধিকারও আছে। নারীকে যেমন স্বামীর আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, তেমনই স্বামীকে তার সাথে সদাচারেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য, এ ব্যাপারে মুসলিম পুরুষগণ দায়িতৃশীলতার পরি দলে আজকের ইসলামবিদ্বেধীরা মুসলিম বোনদের ফাঁসাতে এতটা সফলতা পেত না।

নারীর ওপর পুরুষের একটি বিশেষ মর্যাদা

আলোচ্য আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'আর নারীদের ওপর পুরুষদের আছে একটি বিশেষ মর্যাদা'—এর ব্যাখায় অনেক মুফাসসির বলেছেন, সেই মর্যাদা হলো জিহাদ ও মিরাসের মর্যাদা। অনেকে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন আনুগত্য বলে।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর ব্যাখ্যাটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম তাবারী রাহ.। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَحةٌ تَعْنِيْ صَفْحَ الرَجُلِ عَنْ بعضِ الواحبِ الذي لَهُ علَى الزوجةِ وإغضَاؤُهُ عنه فأنا مَا أُحِبُّ أَن ٱسْتَنْظِفَ - آخذ - جَمِيْعَ حقِّي مَا المُوجةِ وإغضَاؤُهُ عنه فأنا مَا أُحِبُّ أَن ٱسْتَنْظِفَ - آخذ - جَمِيْعَ حقِّي

অর্থ : 'আর নারীদের ওপর পুরুষদের আছে একটি বিশেষ মর্যাদা'—
এই কথাটির অর্থ এই যে, নারীর ওপর পুরুষের যত অধিকার আছে, তার
সবটাই পুরুষ গুনে গুনে আদায় করবে না। বরং অনেক বিষয়েই ছাড়
দেবে। যেমন আমিই, আমার স্ত্রীর কাছ থেকে সকল অধিকার গুনে গুনে
আদায় করাটা পছন্দ করি না।

পক্ষান্তরে কওমাহ বা অভিভাবকত্বের বিষয়টি পুরুষের হাতেই। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই।

দোষগুণ মিলেই নারী

যাই হোক, যদি কখনো পুরুষ তার স্ত্রীর মাঝে কোনো দোষ-ক্রটি দেখতে পান, তা হলে তার মোটেই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে, এই নারী দাম্পত্যজীবনের যোগ্য নয়। কেননা, দোষগুণ মিলেই নারী। পুরুষের ক্ষেত্রেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলার প্রাজ্ঞ নীতিই এই যে, তিনি মানুষের হাতে পূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতার গুণ রাখেননি। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন.

لَا يَفْرُكُ - لا يبغض - مُؤْمِنٌ مؤمنةً إن كُرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ

অর্থ: মুমিন নারীর প্রতি মুমিন পুরুষের বিদ্বেষী হয়ে ওঠা উচিত নয়। তার কোনো একটা বিষয় খারাপ লাগবে; আবার অন্য একটি বিষয় ভালো লাগবে—সেটাই স্বাভাবিক।

কবি বড় সুন্দর বলেছেন,

مَنْ ذَا الذِي مَا سَاء قَطُّ وَمَنْ لهُ الحُسْنَى فَقَطْ

কে আছে এমন যে দোষ করেনি কভু? কে আছে এমন যার গুণই আছে শুধু?

ন্যায় ও উভম ব্যবহার
 মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيُهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ : তোমরা তাদের সাথে ন্যায় ও উত্তমভাবে জীবনযাপন ও বসবাস করো। যদি তাদেরকে তোমাদের অপছন্দ হয়, তা হলে হতে পারে তোমরা কিছু অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে রেখেছেন প্রভূত কল্যাণ। –সুরা নিসা : ১৯

ন্যায়সঙ্গত আচরণ দাম্পত্যজীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। বলা যায়, পরিবার জীবনের অপরিহার্য উপাদান এটি। একটি সুখী পরিবারের বৈশিষ্ট্য হলো, একে অপরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা, সদাচার। এখানে বিরাজ করে সুস্থ সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর কথোপকখন, মায়া, মমতা। এখানে ঝগড়া-বিবাদ নেই, গালিগালাজ নেই।

১. মুসলিম, আহমাদ।

গালিগালাজ, মারধর পরিহার করুন

প্রকৃত প্রস্তাবে, কোনো পুরুষেরই এই অধিকার নেই যে, তিনি তার ব্রীকে গালিগালাজ করবেন, ব্রীর সাথে কঠোর আচরণ করবেন। ব্রীর যদি কোনো দোষ থাকে, তাই তার সংশোধনের প্রয়োজন হয়, তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত কথায় কাজ হবে, উপদেশ উপকার দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রীর গায়ে হাত তোলা কোনোভাবেই বৈধ নয়।

যদি কখনো স্ত্রীর পক্ষ থেকে সীমালজ্ঞন হয়, উপদেশ, অভিমান কোনো কাজে না আসে, সেজন্য গায়ে হাত তোলা ছাড়া কোনো উপায় না থাকে, তা হলে সেই প্রহারটা কোন পর্যায়ের হবে তার সুস্পষ্ট ও দ্বার্থহীন দিক-নির্দেশনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গেছেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম আরাফার দিবসে নারীদের বিষয়ে বলতে গিয়ে বললেন,

... فَاتَّقُوا الله في النساءِ فإنَّكُم أَخَذْتُمُوْهُنَّ بأَمَانِ الله ، واسْتَحْلَلْتُم فُرُوجَهُن بكَلِمة الله ، والنَّه عليهن أن لَا يُوطِقْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ ، فإنْ فَعَلْنَ ذَرِلْكَ فاضْرِبُو هُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّح

অর্থ : তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ—আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তার অধীনে; এমনকি তাদের নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ—আল্লাহর নাম ব্যবহার করে। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের বিছানায় অন্য কাউকে জায়গা দেবে না, যা তোমরা অপছন্দ কর। তারা যদি কখনো এমন কিছু করে, তা হলে তাদের প্রহার করবে, তবে তা যেন বেধড়ক পিটুনি না হয়।

এক্ষেত্রে উন্মূল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর হাদীসটিও মাথায় রাখা চাই, তিনি বলেছেন,

১. সহীহ মুসলিম।

مَا ضربَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ شيئا قَطُّ بِيَدِهِ ولا امْرَأَةً وَلَا خادِمًا إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سبيلِ اللهِ ومَا نِيْلَ منهُ شيْءٌ قطُّ فَيَنْتَقِمُ من صاحبِهِ إلا أَنْ يَّنْتَهِكَ شيءٌ مِنْ محارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানে ছাড়া কখনো কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে—চাই সে স্ত্রী হোক বা সেবক হোক, নিজ হাতে আঘাত করেননি। কখনো এমন হয়নি যে, তাঁর সাথে কোনো অন্যায় করা হয়েছে, আর তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। তবে আল্লাহর সম্মানে আঘাত এলে তিনি ছাড দেননি।

ইমাম শাবী রহ. এক প্রতিবেশীকে স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করতে দেখলেন। তখন আক্ষেপ করে বললেন্

> رأيتُ رِجَالًا يضْرِبُون نِسَائهُم أأضْرِبُها مِن غيرِ ذنبٍ أتت بِه فرَيْنَب شَمْسٌ والنساء كوَاكِبُ فشُلَّتْ يَمِيْنِي يومَ تُضْرَب زينبُ فمَا العدْلُ مِني ضربُ مَن ليس يُذْنِب إذا طَلَعَت لم يَبْدُ منهن كَؤْكَب

কিছু লোক দেখি স্ত্রীকে মারধর করে।
কেউ স্ত্রীকে আঘাত করতে পারে?
আমার যায়নাব তো আকাশের চাঁদ, নারী তো নক্ষত্র।
যায়নাবকে যদি কখনো আঘাত করি,
তবে আমার হাত যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়।
যার জ্যোতিতে চাঁদের আলো স্লান হয়ে আসে,
তাকে কি আঘাত করা যায়?

১. সহীহ মসলিম।

ফিরে এসো নীডে

উত্তম ব্যবহারের দাবি .. ক. হাসিখুশি থাকা

ন্যায়সঙ্গত আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো, স্ত্রীর সাথে হাসি খুশি থাকা, আনন্দ প্রকাশ করা ইত্যাদি। আপনি মুখ গোমড়া করে থাকবেন, আর বলবেন, আমি তো আমার দায়িত্ব পালন করছিই—তা হবে না। কেননা, এতে স্ত্রীকে কট্ট দেওয়া হয়। তাকে কট্ট দেওয়া ভালো ব্যবহার নয়। হাসিখুশি থাকাও ভালো ব্যবহারের মধ্যে পড়ে।

খ. ভালোভাবে কথা বলা

একটু ভাবুন তো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

... والْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ....

অৰ্থ : উত্তম কথা বলা সদকা।

ভাবুন তো, উত্তম কথা বলার এই সদকার হকদার সবচেয়ে কে বেশি? আর কেউ কি থাকতে পারে, যিনি আপনার স্ত্রীর চাইতেও উত্তম কথার বেশি হকদার? একটু নরম সুরে, একটু কোমল ভাষায় স্ত্রীর সাথে কথা বলা স্ত্রীকে স্বস্তি দেয়, শান্তি দেয়। সে জীবনসঙ্গীর প্রতি স্বস্তি বোধ করে।

আমার মুসলিম ভাই,

জেনে রাখবেন, একটু ভালো কথা, একটু সুন্দর কথা একটি অন্তরঙ্গ দাম্পত্যজীবনগঠনে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। উত্তম কথাই পরিবারকে ভক্তি ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে পারে। জীবনকে সুন্দর ও উপভোগ্য করতে পারে। একটি নারী জীবনসঙ্গীর মিষ্টভাষিতায় কত গর্ববোধ করে, তা আপনি জানেন না। সে মনে করে, দুনিয়া পেয়ে গেছে। দুনিয়ার সব পেয়ে গেছে।

গ. আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা

পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা ও আনন্দানুভূতিই দাস্পত্যজীবনের বৈশিষ্ট্য। এতে স্নেহ আসে। হৃদয়ের গভীরে জন্ম নেয় মমত্ব। আর কৃতজ্ঞ মুসলিম

ফিরে এসো নীড়ে

১. সহীহ বুখারী।

নারীর অন্তরে এ এমন এক সাড়া জাগায় যে, সে ভালোবাসায় বশীভূত হয়ে যায়। সে প্রণোদিত হয় আপনাকে সুখী করতে। সর্বস্ব উজার করে দিতে। জীবনে যে বাধাই আসুক, যে বিপত্তিই ঘটুক, সে যদি আপনার প্রতি আশ্বস্ত হয়, তা হলে মনে রাখবেন, তখন আর কোনো কিছুই তার কাছে কঠিন মনে হবে না; মুমিনার কৃতজ্ঞতাবোধ ও হাস্যোজ্জ্বলতা আপনার জীবনে পড়া কড়া রোদকেও নিম্প্রভ করে দিতে পারে নিমিষেই।

ঘ. ধৈর্য, উদারতা ও সহনশীলতা

সহজ কথায় বলতে গেলে, নারী গোলাবের মতো। তাতে যেমন সুঘাণ আছে, তেমনই আছে কাঁটা। আর পূর্ণতার কথা বলবেন? সে তো শুধু আল্লাহর। প্রকৃত অর্থে পূর্ণতা মানব-বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের কথা আলাদা।

কবি বলেন,

وَمُكَلِّف الأَيَّامِ ضِدَّ طِبَاعِها مُتَطَلِّبٌ فِي الماءِ جَذْوَة نَارٍ

যে সময়ের ওপর সময়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু চাপাতে যায়, সে তো পানির ভেতরে আগুনের অঙ্গার খুঁজে পেতে চায়।

এজন্য আদর্শ পুরুষের কর্তব্য হলো সহনশীল হওয়া, সুবিবেচক হওয়া। নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা। তা হলে জীবনসঙ্গিনীর প্রতি সদয় হওয়া, সুন্দর ব্যবহার করা, প্রয়োজনে ধৈর্য ধরা সম্ভব হবে।

হ্যরত উমরের ধৈর্য ও উদারতার দৃষ্টান্ত

একটি বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর রাযি.-এর কাছে এলেন আপন স্ত্রীর মন্দ ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে। লোকটি দরজায় দাঁড়ালেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, হযরত উমর রাযি.-এর স্ত্রীও হযরতকে কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছেন; আর হযরত চুপচাপ; কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। লোকটি এ অবস্থা দেখে ফিরে যেতে লাগলেন। আর মনে ম বিশ্লেন,

হ্যরত উমর রাযি.-এর মতো মানুষেরই এই দশা, তা হলে আমার আর কী হতে পারে?

হ্যরত উমর রাযি. ঘর থেকে বের হয়ে লোকটিকে চলে যেতে দেখে বললেন,

ভাই, আপনার কি কিছু বলার ছিল?

লোকটি বললেন,

হে আমীরুল মুমিনীন, আমি এসেছিলাম আমার স্ত্রীর মন্দ ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে...

হ্যরত উমর রাযি. মৃদু হাসলেন, বললেন,

ভাইরে, ধৈর্য ধরব না তো কী করব? আমার ওপর আমার স্ত্রীর কত অধিকার! অথচ কত কিছুতে তিনি ছাড় দেন! আবার আমার জন্য কত কিছু করেন! আমার খাবার রান্না করেন! আমার কাপড়চোপড় পরিস্কার করেন! আমার ছেলেমেয়েকে পেলেপুষে বড় করেন! অথচ এগুলো তার দায়িত নয়!

লোকটি বললেন,

আমীরুল মুমিনীন, আমার স্ত্রীও তো তা-ই। তা হলে তো আমারও ধৈর্য ধরা উচিত।... যাক, জীবনটা আর কতই দীর্ঘ।

আমার মুসলিম ভাই,

মনে রাখবেন, ছোটখাটো কিছু বিষয়ে একটু উদারতার পরিচয় দিলে দাস্পত্যজীবনের ভিত্তিটা অনেক মজবুত হয়। পরিবারে একতা ও বন্ধন তৈরি হয়।

ঙ. স্ত্রী ও তার পরিবারের সম্মান বজায় রাখা

এভাবে ন্যায়সঙ্গত আচরণের আরেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো স্ত্রীকে সম্মান করা, স্ত্রীর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনকে সম্মান করা; তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বলা; তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা, সম্পর্ক

রাখা; মাঝে মধ্যে তাদের দেখতে যাওয়া; যদি প্রয়োজন হয় তা হলে সহযোগিতা করা।

চ. স্ত্রীর মতামত যাচাই ও মূল্যায়ন

পারিবারিক বিষয়ে, বিশেষত যেগুলোর সাথে স্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা আছে, ক্রীর সাথে পরামর্শ করা, তার মতামত যাচাই করা এবং সঙ্গত উপায়ে তার মূল্যায়ন করাও উত্তম ব্যবহারের দাবি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। তিনি ছিলেন ওহির আলোপ্রাপ্ত। তিনিও স্ত্রীর মতামত যাচাই করতেন। স্ত্রীর মতামতের মূল্যায়ন করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় একটি সংকট-নিরসনে তিনি উন্মূল মুমিনীন হযরত উন্মে সালামা রাযি.-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। উন্মূল মুমিনীনের সেই অবদান শ্রেরণীয় হয়ে আছে ইসলামী ইতিহাসের সোনালি পাতায়।

ছ. স্ত্রীর স্বাস্থ্যসুরক্ষায় যত্নশীল হওয়া

এভাবে ন্যায়সঙ্গত আচরণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, স্ত্রীর স্বাস্থ্যসুরক্ষায় যত্নশীল হওয়া। সে অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। একজন ওয়াফাদার ও কৃতজ্ঞ-কৃতার্থ স্বামীর কর্তব্য হলো যেভাবে নিজের যত্ন নেয়, স্বেয়াল রাখে, ঠিক সেভাবেই স্ত্রীরও যত্ন নেওয়া ও খেয়াল রাখা। এক্ষেত্রে হযরত উসমান রাযি. মুসলিম পুরুষের জন্য উন্নত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁর সম্মানিতা জীবনসঙ্গিনী হযরত রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ থাকায় তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন,

أَقِمْ مَعَهَا ولكَ أَجْرُ مَنْ شَهِدَ بدْرًا وَسَهْمَهُ

অর্থ : তুমি তার সাথে ঘরেই অবস্থান করো, বদরে অংশগ্রহণের সওয়াব ও গনীমতের অংশও তোমার জন্য বরাদ্দ থাকবে।

১. সহীহ বুখারী।

জ. স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতা

এভাবে ন্যায়সঙ্গত আচরণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্ত্রীর প্রতি ওয়াফাদারিতা, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতা—শুধু জীবদ্দশায়ই নয়, মৃত্যুর পরও। আমরা জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন হ্যরত খাদীজা রাযি.-এর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রশংসা করতেন। শুধু প্রশংসাই নয়, শ্রদ্ধাও করতেন। এমনকি, হ্যরত আয়েশা রাযি. বলতেন, হ্যরত খাদীজা রাযি.-এর প্রতি আমার যে ঈর্ষাবোধ হতো, তা আর কোনো নারীর প্রতি হতো না। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুবই বেশি স্মরণ করতেন। বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত খাদীজা রাযি.-এর আলোচনা করতেন, তখন বারবার তাঁর প্রশংসা ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দুআ করতে থাকতেন। একটুও বিরক্তি বোধ করতেন না। এভাবেই একদিন তিনি তাঁর আলোচনা শুরু করলেন। হ্যরত আয়েশা রাযি, বলেন, এভাবে বারবার তাঁর প্রশংসা করায় আমার অভিমান হলো। আমি বললাম, আল্লাহ তো আপনাকে ওই বুড়ির চেয়ে ভালো স্ত্রী দান করেছেন। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারলাম আমার এ কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ, দয়া করে আপনার রাসূলের মনোকষ্ট দূর করে দিন, আর কখনো এমন করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অনুতপ্ততা বুঝতে পেরে বললেন, তুমি কীভাবে এমন কথা বলতে পারলে? আল্লাহর কসম, যখন লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তখন সে-ই আমাকে সত্যবাদী বলেছিল। যখন লোকে আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল, তখন সে-ই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। তার মাধ্যমেই আমি সন্তানপ্রাপ্ত হয়েছিলাম; কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বঞ্চিত আছি।

সুতরাং বৃদ্ধিমান পুরুষের কর্তব্য হলো ধৈর্য, সহনশীলতা ও উদারতার অনুশীলন করা। সুন্দর ব্যবহার ও সুন্দর সহাবস্থানের মাধ্যমেই স্ত্রীর প্রতি তিনি যথাযথ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন এবং বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ

১. আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবা : ১২/২১৮।

ফিরে এসো নীডে

আচরণের কল্যাণেই তার 'হার্কুল কওয়ামা' বা অভিভাকত্বের মর্যাদা যথার্থতা লাভ করবে।

তিক্ত হলেও সত্য

দাওয়াতি ও তাদরিসি কাজ করতে গিয়ে আমি আমার সহকর্মী নারীদের কাছে স্বামীদের প্রতি তাদের অনেক অভিযোগের কথা জেনেছি। যেমন, অনেক ভাই তাদের ওপর স্ত্রীদের যে ওয়াজিব হকগুলো আছে সেগুলোরও পরোয়া করেন না। স্ত্রীর সাথে একটু কোমল ভাষায়, নরম সুরে কথা বলার প্রয়োজনই মনে করেন না। অথচ একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসাবোধের জন্য এটা খুবই জরুরি। একে অপরের প্রতি একটি সুন্দর বাক্যবিনিময়ের মধ্যে যে এক অনাবিল আনন্দ ও সুগভীর অন্তরঙ্গতাবোধ লুকিয়ে আছে, তা থেকে নিজেরাও বিষ্ণিত হন, স্ত্রীদেরও বিষ্ণিত রাখেন। যুক্তি কী? যুক্তি হলো ব্যস্ত জীবন, সময় কম; অর্থনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার, শিক্ষানৈতিক কার্যক্রম, রাজনৈতিক তৎপরতা, এত কিছুর ভিড়ে এত আবেগ-বিবেকের চিন্তা মাথায় আসে কোথেকে?

কেউ বিশিষ্ট শিল্পপতি। সিংহভাগ সময়ই কাটে ঘরের বাইরে। একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করতে হয়; একের পর এক চুক্তি সম্পাদন করতে হয়; পণ্যের চাহিদা, যোগান, মূল্য ইত্যাদির ওঠানামা নিয়ে চিন্তিত থাকতে হয়; ব্যবসায় লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথার চুল সব উঠে যায়।

কেউ গবেষক আলেম; কেউ বইপোকা বিদ্বান। কখনো মোটা মোটা বই পড়তে, কখনো ওরকম গোটা গোটা বই লিখতে, কখনোবা সভাসেমিনারে অংশগ্রহণ করতে করতে জীবনের সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকে না। একটি কাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটি এসে হাজির।

এভাবে কেউ শিক্ষক, প্রভাষক, অধ্যাপক ইত্যাদি। অ্যাসাইনমেন্ট দেখেন, লেকচার-শিট তৈরি করেন, পরীক্ষার খাতা দেখেন, নম্বরপত্র প্রস্তুত করেন। এসব করেও যদি একটু সময় পাওয়া যায়, তা হলে অন্য একটা কাজ করা চাই। জীবনে কিছু করতে হবে না! কেউ আবার আন্দোলনের নেতা। প্রায়ই থাকেন জেলে। বাইরে যখন থাকেন, তখন মাথায় নানা পরিকল্পনা, পেরেশানি। কখনো রাগে চোখমুখ লাল হয়ে থাকে। কখনো দুশ্ভিষায় চেহারা ঝাঁই হয়ে থাকে। যেন পৃথিবীর সব দুশ্ভিষা তাকে জেরবার করে দিয়েছে।

আর সেই হতভাগার কথা কী বলব, যে সারাদিন অজায়গায় ঘুরে, অপাত্রে অর্থ সামর্থ ঢেলে, রাতবিরাত অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত থেকে শেষ রাতে ফেরে ঘরে। দেখে মনে হয়, কোনো মোহাবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, জানে না কী বলছে, কী করছে; সোজা দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও নেই। আল্লাহ যাকে এমন অন্ধ-বিধির-মৃক করে দিয়েছেন, যার মনুষ্যত্ববোধ এভাবেই বিদায় নিয়েছে, তার প্রতি আর কী বলার থাকে? সে যেই পরীক্ষার অবতারণা করেছে, তারচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সম্ভবত দাম্পত্যজীবনে দিতীয়টি নেই।

ভাবতে পারেন, আমি অতিরঞ্জিত করে বলছি। কিন্তু আল্লাহর কসম, এটা অতিরঞ্জন নয়। বর্তমানে এমন মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে তা হলে বলুন, আমাদের জীবন কোন দিকে চলে যাচ্ছে? কীসের আশায়, কীসের নেশায় আমরা ছুটে চলেছি? বাড়ির কর্তা যিনি, তিনি যদি এভাবে পরিবারের প্রতি, পরিজনের প্রতি অবহেলা দেখাতে থাকেন, তা হলে দাম্পত্যজীবনের পরিণতিটা কী হবে? পরিবারজীবনের গন্তব্যটা কী হবে? এতে স্ত্রী-সন্তান যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা হলে দোষটা কার? এজন্য দায়ী কে? এই মানুষগুলো যদি গাফলতের চাদর না সরান, তা হলে ওই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন তারা দেখবেন, তারা এক প্রান্তরে, তাদের স্ত্রী সন্তান আরেক প্রান্তরে।

দায়িত্বহীনতার পরিণতি

মনে রাখবেন, আপনার এই ঘোর একদিন কেটে যাবে। আজকের উদাসীনতার কুফল আপনাকে আষ্ট্রেপৃষ্ঠে ঠেসে নেবে। একদিন আপনার সন্তানেরা বড় হবে। তারা সবাই যার যার জীবনের পথ ও মত, মতি ও গতি নির্ধারণ করে নেবে। সেখানে আপনার কোনো বিচরণ থাকবে না। আপনার কোনো বক্তব্যও থাকবে না। পিতা কী, এই বোধটুকুও হয়তো তারা হারিয়ে ফেলবে।

আর আপনার স্ত্রী? এভাবে একা একা জীবনের পথটুকু চলতে চলতে সে ক্লান্ত-শ্রান্ত; মনে-তনে বার্ধক্যের ছায়া। হাজার অভিযোগ, অনুযোগু তার মনের কবরে চাপা পড়েছে। যা একটু একটু করে শক্ত দেয়াল তৈরি করছে আপনাদের মধ্যে। সে তার জীবনের দায়গুলো পালন করে গেছে, আর আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে আপনার মতো করে।

যদি আপনার ভাগ্যে থাকে, একদিন আপনার ঘার কেটে যাবে। কেননা, আপনি ততদিনে আপনার জীবনের দায় ও স্বপ্ন পূরণ করে ফেলবেন। অথবা সর্বত্র আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। আপনি চাইবেন, নতুন করে পরিবার জীবনে ফিরে আসতে। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি সবাইকে নিয়ে বাকি জীবনটা হাসি আনন্দে কাটিয়ে দিতে। কিন্তু আপনি চমকে যাবেন। হঠাৎ লক্ষ্য করবেন, কী একটা দূরত্ববোধ, কী একটা অপরিচয়বোধ আপনাকে মর্মাহত করছে। আপনি যেভাবে তাদের পেতে চাইছেন, সেভাবে পাচ্ছেন না।

যদি আপনার বোধশক্তি ভালো থাকে, তা হলে হয়তো নিজের প্রতিই আক্ষেপ করবেন। অন্যথায় পুরো দোষটা চাপাবেন ওই অবলা সরলা দ্রীর ঘাড়ে। অনেক মানুষই এমন করেন। সারা জীবনের সব দায় স্ত্রীর ঘাড়ে চাপানো তাদের একটা বাতিকে পরিণত হয়। অনেক মানুষ তখনো মনে করেন না যে, এক্ষেত্রে মূল ক্রটি তারই ছিল। তার মাথায় থাকে না যে, তার কারণেই পরিবারের আজ এই দশা। তিনি ভুলে যান, সন্তানকে তিনি কতটুকু সময় দিয়েছেন, যে কারণে অন্তরে তার প্রতি গভীর কোনো অনুভৃতি দাগ কাটবে? কিংবা স্ত্রীকেই কতটুকু সময় দিয়েছেন, যে কারণে তার প্রতি স্ত্রীর সেই আবেগ অনুভৃতি অক্ষত থাকবে?

অনেক পুরুষই পরিবারের প্রতি নিজের এতদিনের অবজ্ঞার কথা, অবহেলার কথা, দায়িত্বহীনতার কথা ভূলে যান। হঠাৎ করেই তিনি 'পারিবারিক' হয়ে ওঠেন। জীবনের গভীর বোধ তাকে মর্মাহত করে। যতটা না সন্তানদের প্রতি অভিযোগ থাকে, মূল অভিযোগটা গিয়ে পড়ে

ন্ত্রীর ওপর। দীর্ঘ এক আহ.. ধ্বনি উচ্চারণ করে বলে ওঠেন, স্বামীর প্রতি ধৈর্যশীলা, একনিষ্ঠা, কৃতজ্ঞ-কৃতার্থ আদর্শ স্ত্রী কই?

অনেক সময় বলে ওঠেন, আমি কি পরিবারের জন্য কিছুই করিনি? স্ত্রী-সন্তানের জন্যই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি। যেন সমাজে আমার একটু মূল্য থাকে, যেন আমার স্ত্রী-সন্তানও সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে সেজন্যই তো এত কিছু করা।

ভাই আমার, আপনি অবশ্যই সত্য বলছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আপনি আপনার স্ত্রীর আবেগ অনুভূতির যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তার চাওয়া পাওয়া আপনার কাছে কোনো ধর্তব্য বিষয় ছিল। হতে পারে, আপনার স্ত্রী-সন্তান আপনার অর্জনে উপার্জনে গর্বিত, সমৃদ্ধ। এজন্য আপনি সাধুবাদও পাবেন। কিন্তু পরিবারের প্রতি আপনার আরও কিছু দায়িত্ব ছিল। আপনার প্রতি তাদের এই যে অনুভূতিশূন্যতা, এর কারণটা কিন্তু আপনিই।

লক্ষ করুন, আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাই জীবনের ভারসাম্যবোধটুকু হারিয়ে ফেলেছিলেন। যার প্রতি যেই পরিমাণ গুরুত্বটা দেওয়া দরকার, সেটা রক্ষা করেননি বা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। আপনার ব্যর্থতা এখানেই। হতে পারে, এই ব্যর্থতার গ্লানি কখনোই আপনার সঙ্গ ছাড়বে না।

প্রকৃত সফল পুরুষ

প্রকৃত সফল পুরুষ তিনিই, যিনি সবকিছুকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন। সবকিছুর সাথে সাথে স্ত্রীকে স্ত্রীত্বের অধিকারটুকুও পুরোপুরি দিতে পারেন। পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি প্রকৃত দায়িত্বটিও পালন করতে পারেন। যিনি জীবনের কোনো একটি দিকে ঝুঁকে গিয়ে বাকি সবকিছুকে জলাঞ্জলি দেন, তিনি আর যাই হন, সফল পুরুষ নন।

এমন কর্মপুরুষ হয়ে কী লাভ, যার বাণিজ্য পৃথিবীর দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে, যিনি অনেক অনেক লাভবানও হয়েছেন; এমনকি, সমাজে তার উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি হয়েছে; কিন্তু নিজের পরিবারের সাথেই তার সম্পর্ক নেই। তার মনে কোনো ভালোবাসা আছে কি না, তার স্ত্রীই তা উপলব্ধি করেননি। ছেলেমেয়ের অবস্থা এই যে, তাদের পিতাকে তারা চেনে; কিন্তু পিতার ভালোবাসা কী জিনিস, কেমন জিনিস, সেটা তারা বোঝে না।

এমন বাগ্মী বক্তার সার্থকতা কীসে, যিনি হ্বদয়্রপ্রাহী বক্তব্যে হাজারও মুর্দা দিল জিন্দা করতে পেরেছেন, শত শত বিক্ষিপ্ত হ্বদয়কে সমবেত করতে পেরেছেন; কিন্তু নিজের স্ত্রীকে, সন্তানকে নিজের পাশে জড়ো করতে পারেননি। নিজের দাওয়াতি আমলে শরীক করতে পারেননি? তারা তো তার সহকর্মী হতে পারত। সহযোগী হতে পারত। দাওয়াতি আমলে, রিসালাতের আমানতে, ইলমের ইশাআতে তার সালেহ-কাবেল ওয়ারিশ হতে পারত।

এমন দাঈ ও সংস্কারক হয়ে কী লাভ, যিনি সমাজ-সংস্কার করতে পারেন, অন্যের আত্মগুদ্ধি ও ব্যক্তিগঠনের প্রেরণা হতে পারেন; অথচ পরিবার-পরিজনের কথাই ভূলে যান?

ন্ত্রী-সন্তানের খোঁজখবর নেবে কে? তাদের সংশোধন করবে কে? তাদের ব্যক্তিগঠনের প্রয়োজন নেই? তাদের প্রতি একটুও খেয়াল রাখা যায় না? তাদের স্বপ্ন, আশা, প্রত্যাশার কথা ভাবা যায় না? তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, কেমন হবে, কীভাবে হবে, সেটাও কি যোগ্য পিতার উপস্থিতিতেও নিজেদের ঠিক করতে হবে? আচ্ছা, পিতার একটু স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া কি কোনো অধিকার নয়? যিনি অন্যের সংশোধনে এত পারঙ্গম, তার নিজের সংশোধন করবেন কে?

মায়ের ভূমিকা এক, বাবার ভূমিকা অন্য

বলবেন, পিতাকেই যদি এদিকে মনোযোগী হতে হয়, তা হলে মায়ের ভূমিকা কী? সন্তানের লালনপালনে, ব্যক্তিগঠনে তাকেই তো ব্রতী হতে হবে! তিনিই তো সন্তানের পিতার প্রতিনিধি!

বলব, বাস্তবতা হলো মা যতই যোগ্য হন, অভিজ্ঞ হন; শিক্ষিতা হন, দীক্ষিতা হন; কখনোই পিতার অভাব পূরণ করতে পারেন না। সন্তানের

মানস ও ব্যক্তি-গঠনে মায়ের ভালোবাসার যেমন বিকল্প নেই, পিতার ভালোবাসারও কোনো পরিপ্রক নেই। এখানে মায়ের ভূমিকা এক, পিতার ভূমিকা অন্য। পরিবারের মাথা হয়ে সন্তানের প্রতি একজন পিতার উপস্থিতি, রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব, পরিচালনা ও দিক-নির্দেশনা যে কাজে আসবে সেটা অন্য কোনোভাবে আসবে না। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মনমানসিকতা, একটি সুন্দর সমাজ-গঠনে তাদের ভূমিকা কী হবে, তা একজন যোগ্য পিতার যোগ্য তত্ত্বাবধানের ওপরই নির্ভর করে। এখানে মায়ের ভূমিকাও অবশ্যই অপরিসীম। কেননা, মায়ের অংশগ্রহণ ছাড়া শুধু পিতার পক্ষে এগুলোর অনেক কিছুরই যথার্থ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন পিতার তত্ত্বাবধান ছাড়া অনেক কিছুই মায়ের পক্ষে দুরূহ।

স্ত্রীর অবমূল্যায়ন করবেন না

প্রায়ই এমন হয়, বেচারা নারী সব কট্টই স্বীকার করে। নিজের আশা, ভাষা, ভরসা সবকিছুই বিসর্জন দেয়। বিনিময়ে কিছুই চায় না। একটু উৎসাহ চায়, প্রেরণা চায়, প্রণোদনা চায়। স্বামীকে সুখী করতে, সন্তানকে সফল করতে সে যত কিছু করে, যতভাবে করে, কোনো কিছুরই বিনিময় চায় না। চায় শুধু একটু মূল্যায়ন। সে যা করছে, সে জন্য তাকে ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানানো হোক না-হোক, শুধু ভালোবাসায় মূল্যায়ন দেখানে হোক, সেটাই চায়।

অথচ কী পায়?—লাঞ্ছনা, বঞ্চনা। এত কিছু করেও সে যেন কিছুই করে না। পরিবারের সদস্যদের সফলতা, উত্তর-উত্তর উন্নতির পেছনে যে তারও অবদান আছে—যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল অবদান তারই সেটাই যেন কিছু মানুষ শ্বীকার করতে চায় না।

এটা কে না বোঝে, একজন কোমলমতি নারী এভাবে অবমূল্যায়নের যন্ত্রণা সইতে সইতে তার মমতাময়ী কোমল রূপটি হারিয়ে ফেলে। একসময় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, বরং শক্ত পাথরে পরিণত হয়; স্বামীর প্রতি আবেগ, অনুভূতিও লোপ পেয়ে যায়। সংসারে সুখ বলে কিছু আছে, তাও বিস্মৃত হয়।

মুসলিম ভাই, একটু ভাবুন

সুতরাং হে মুসলিম ভাই, এভাবে জীবনের সুখানুভূতি, সৌভাগ্যানুভূতি থেকে কেন নিজেও বঞ্চিত হবেন এবং স্ত্রীকেও বঞ্চিত করবেন? একটু ভালো কথাই তো দাম্পত্যজীবনের মূলধন। একটু হাস্যোজ্জ্বলতাই তো প্রাণের স্পন্দন, হৃদয়ের বন্ধন। স্ত্রী-সন্তানের সাথে একটু বসলে কি আপনার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে? তাদের সাথে একটু বসা, তাদের একটু সময় দেওয়া, সুখ-দুঃখগুলো ভাগাভাগি করা, স্বপ্নের কথাগুলো বলা, প্রত্যাশার কথাগুলো বলা—এতে কত সময় নষ্ট হয়? অথচ একটি জীবনকে সুখকর করতে এগুলোর কত প্রয়োজন?

এমন প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে কী লাভ, যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে, ব্যক্তি ও পরিবারের মাঝে এক অপূরণীয় ঘাটভি, এক অপ্রভ্যাশিত দূরত্বের সৃষ্টি করে? আরে, একটি সফল দাস্পত্যজীবন অনেক অর্থপ্রাচুর্যের চেয়েও দামি। একে অপরের মন বোঝা, ভালোলাগা-মন্দলাগার শেয়ার করা, এভাবে একটি প্রীতি ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবার গঠন করা ইসলামে বিরাট পূণ্যের কাজ। এর প্রতিদানও বিরাট।

স্ত্রীর সাথে আমোদপ্রমোদ অনর্থক নয়

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এমন অনেক কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন, যেগুলোর অনুসরণ করলে খুব সহজেই একজন মুসলিম নারীর অন্তরে চরম ও পরম সুখানুভূতি জাগ্রত করা যায়। খুব সহজেই একজন কৃতজ্ঞ-কৃতার্থ নারীর মন জয়় করা যায়। দেখুন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِرْمُوْا وارْكَبُوْا وأَنْ تَرْمُوَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن تَرْكَبُوْا وأَنَّ كُلَّ شيءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرجُلُ باطِلِّ. إِلَّا رَمْيَةَ الرجُلِ بقَوْسِه وتأديبَه فَرَسَه ومُلَاعَبَتَهُ امْرَأْتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِن الْحُقِّ وَمَنْ نَسِىَ الرمْىَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الذِّي عَلَّمَه

অর্থ : তোমরা তিরন্দাজি শেখো, ঘোড়সওয়ারি শেখো। তবে তিরন্দাজি শেখা আমার কাছে ঘোড়সওয়ারি শেখা থেকে উত্তম। মনে

রেখো, মানুষ যত খেলাথুলা করে সবই অনর্থক। তবে তির নিক্ষেপ করা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ করানো এবং স্ত্রীর সাথে আনন্দ-বিনোদন করা অনর্থক নয়। এগুলো যথার্থ। যে তিরন্দাজি রপ্ত করার পর ভুলে গেল, সে তার প্রশিক্ষকের সাথে অকৃতজ্ঞের আচরণ করল।

পরিবারের জন্য খরচ করলে অধিক সওয়াব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سبيل اللهِ، و دِيْنَار أَنفقتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ودِيْنَار تَصَدَّقْتَ به عَلَى مِسْكِيْنٍ، و دينارٌ أَنفقتَهُ عَلَى أَهلكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الذي أَنفقته عَلَى أَهْلِكَ

অর্থ: ধরো, তিনটি দিনার—একটি তুমি দান করলে আল্লাহর রাস্তায়, একটি ব্যয় করলে কোনো গোলাম আজাদ করতে, বা সদকা করলে কোনো ফকির-মিসকিনের জন্য, আর একটি খরচ করলে তোমার পরিবারের জন্য; এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান পাবে ওই দিনারটির জন্য, যা তুমি খরচ করলে তোমার পরিবারের জন্য।

স্ত্রীর মনোরঞ্জন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রীর প্রতি একজন অন্তরঙ্গ জীবনসঙ্গী ছিলেন। এমনকি তিনি উন্মূল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি.– এর সাথে হালকা দুষ্টুমিও করতেন। তাঁর সাথে দৌড়প্রতিযোগিতা করতেন। গল্প বলতেন। সাথে নিয়ে পানাহার করতেন। সাথে নিয়ে সফর করতেন। একটি বর্ণনায় আছে, মসজিদপ্রাঙ্গনে হাবশিদের পালোয়ানি দেখানোর জন্য হযরত আয়েশা রাযি.–কে তিনি গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন।

১. সহীহ মুসলিম।

२. महीइ भूमिनम।

সন্তানদের প্রতি স্নেহ

তিনি সন্তানদের প্রতিও ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। তিনি হযরত ফাতেমা রাযি.-কে বলতেন 'আমার অংশ'। তিনি নাতি হাসান হুসাইনকে কী ভালোবাসাই না বাসতেন। তাদের পিঠে নিয়ে বলতেন, 'তোমাদের উটটি অনেক ভালো, তাই না!' যায়নাব রাযি.-এর মেয়ে হযরত উমামা রাযি.-কেও কোলে নিয়ে নামায পড়তেন। যখন সিজদায় যেতেন, তখন নামিয়ে রাখতেন। যখন দাঁড়াতেন, তখন আবার কোলে উঠিয়ে নিতেন।

ন্ত্রীর সাথে পরামর্শ

শুধু ভালোবাসাই নয়, স্ত্রীর মতামতকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সুলহে হুদায়বিয়ায় কাফেরদের সব দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বছর উমরা না করেই মক্কা থেকে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাহাবা কেরামকে ব্যথাভরা হৃদয়ে হাদি নহর করার নির্দেশ দিয়ে বললেন.

'তোমরা নহর করে নাও, তারপর হলক করে ফ্যালো।'

তিনি প্রায় তিনবার কথাটি বললেন। কিন্তু সাহাবা কেরাম তখন মনঃকষ্টে আচ্ছন্ন। সবাই স্তব্ধ, বাকরুদ্ধ। কারো কোনো সাড়া না পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তখন উন্মূল মুমিনীন হয়রত উন্মে সালামা রাযি.-এর ঘরে গেলেন এবং দুঃখের সাথে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরলেন। হয়রত উন্মে সালামা রাযি. বললেন.

হে আল্লাহর রাসূল, আপনি বিচলিত হবেন না; তারা আসলে এখনো মেনে নিতে পারছেন না যে, আপনি সত্য সত্যই তাদের এমনটি করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আপনি বরং যান এবং কারও সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট নহর করুন, এরপর হলককারীকে ডেকে হলক করিয়ে নিন। দেখবেন, তারা আপনাকে অনুসরণ করবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বের হলেন এবং কারো সাথে কোনো কথা না বলে নিজের উট নহর করলেন এবং হলককারীকে ডেকে হলক করিয়ে নিলেন। সাহাবা কেরাম যখন দেখলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই এমনটি করলেন, তখন তারাও উঠে যার যার উট নহর করলেন এবং একে অপরকে হলক করিয়ে দিলেন।...

এখনো কি সম্ভব?

অনেকে ভাবতে পারেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহিপ্রাপ্ত ছিলেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে আমাদের মতো মানুষের পক্ষে এসব কী করে সম্ভব? জীবনের এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে কখন স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করব, আর কখন অন্যান্য কাজগুলো করব? আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে একই সাথে জীবনের বিভিন্নমুখী দায়দায়িত্ব সমানভাবে পালন করা এখনো কি সম্ভব?

ড. সাইফ আল বানার বক্তব্য

যারা এমন একটা অক্রিয় অজুহাতকেই বড় করে দেখাতে চান, তাদের জন্য অধ্যাপক সাইফ আল বান্নার বক্তব্যটি তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি,

لَقَدْ كَانَ والدِيْ يَحْرُصُ عَلَى تَطْبِيق السُّنَةِ تَطْبِيقًا مُتَنَاهِيًا وعندَمَا تَزوَّج حرِص أَن يَعْرِفَ أَقَارِبَ زَوْجَتِه فَرْدًا فَرْدًا وأحصَاهُم عدًّا وزارهُم جميعا رغْمَ بُعدِ أَمَاكنِهم وكان رحمه الله يُفاجِئ والدَّتِي بأنه اليومَ قَدْ زارَ فلانًا لأنه يُمِتُ لَمُ يصِلَةِ القَرابة, كَذلكَ كان دَقِيقًا في رِعَايَتِهِ لشُؤون بَيتهِ رعايَةً كامِلةً غيرَ منقُوصةٍ فكان يكتُب بِنفْسِه الطَلَبَاتِ وكُل أَنواعِ الموادِّ الاسْتِهْالاكيةِ التي معتاجُها المنزِلُ شهْرِيًّا ويدْفعها إلى أحدِ أصحاب البَقَالَة ليؤفِرَها كل شهرٍ يحتاجُها المنزِلُ شهْرِيًّا ويدْفعها إلى أحدِ أصحاب البَقَالَة ليؤفِرَها كل شهرٍ

১. সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীড়ে

وكان رحمه الله يُشْعِرُ بثِقْلِ التَبِعَاتِ الْمُلْقَاة على زوجَتِه فعَمِلَ عَلى أَد يكون بِجِوَارِها دائمًا خادمةٌ تُساعِدُها في أعْمَالِ الْمَنْزِلِ

অর্থ : আমার পিতা হাসান আল বান্না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের জীবনাদর্শকে খুবই মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তিনি বিবাহের সময় আমার মাতার যত আত্মীয়ন্বজন আছে, সকলের সাথে আলাদা আলাদাভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রত্যেকের হিসাব মাথায় রেখেছিলেন। মনে হতো যেন পালাক্রমে তিনি তাদের সাথে দেখা করতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন। স্থানিক দূরত্বকে কিছু মনেই করতেন না। তিনি হঠাৎ আমার মাতাকে চমকে দিয়ে বলতেন, আজ অমুকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মাতা বলতেন, কেন? তিনি বলতেন, সে তোমার আত্মীয় না? তিনি পরিবারের বিষয়ে খুবই সৃষ্মদর্শী ছিলেন। পরিবারের প্রয়োজনের ব্যাপারেও পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। কখন কী লাগবে না-লাগবে, কোনটা কত দিন চলবে না-চলবে, সবই হিসাব থাকত তার। তিনি নিজ হাতে মাসিক বাজারসদাইর তালিকা তৈরি করে দোকানিদের দিয়ে দিতেন। তিনি এ ব্যাপারে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, দোকানিরা সবই ঠিকমতো পৌছে দিত, কখনো বিলম্ব করার সুযোগ পেত না। তিনি আমার মাতার কষ্ট গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, তাই নিজেও তাকে সহযোগিতা করতেন। সাথে সাথে প্রায় সবসময়ই ঘরের কাজে মাতাকে সহযোগিতার জন্য কোনো না কোনো সেবিকা রাখার চেষ্টা করতেন।

ড. সানা আল বানার বক্তব্য

এ হলো একজন পিতার প্রতি পুত্রের মূল্যায়ন। এবার দেখা যাক, মেয়ে কী বলেন। হাঁ, তাঁরই বিদুষী কন্যা ডাক্টর সানা আল বান্না বলেন,

لَقَدْ كَانَ رِحْمَهُ الله هادِئ الطبعِ واسِعَ الصدْرِ هيِّنًا لَيْنًا لَمَّ أَذَكُرْ أَنَّ صَوْتَه ارْتَفَعَ عَلى أحدٍ في البيتِ لأي سبَبٍ من الأسبابِ ... كان يُعاون والدتي في بَعْضِ أَعْبَاءِ البيتِ رَغْمَ انْشِغَالِهِ في أَعْبَاءِ الدَّعْوَةِ لقَدْ كان مُلِمًّا بكُلِّ صغيرة وكبيرة في البيتِ فكان يعرِفُ كُلَّ شيءٍ يَخُصُّ البيتَ لدَرَجَةِ أنَّهُ كان يعْرِفُ مَوْعِدَ تخْزِينِ الأشياءِ كالسَمْنِ والبَصَلِ والثُوْمِ ...

অর্থ: আমার পিতা স্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খুবই মহৎ ছিলেন। সদালাপী ও কোমলহাদয় ছিলেন। তিনি কখনো কোনো কারণে পরিবারের কারও সাথে গলা উঁচু করে কথা বলেছেন আমার মনে পড়ে না। দাওয়াতি কাজে এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার মাতাকে খুবই সহযোগিতা করতেন। ঘরের ছোট বড় সব কাজেই হাত দিতেন। একদম যেগুলো ঘরের কাজ সেগুলোতেও পটু ছিলেন। এমনকি রান্নাঘরের জিনিসপাতি—যেমন: পেঁয়াজ, রসুন, তেল, ঘি—কোথায় কী, তাও তার জানা থাকত।

ড. সানা আরও বলেন,

لَقَدْ كَانَ عَطُوفًا رحيمًا بِنَا كَنَّا لا نُحِسُّ فيه الغِلْظَةَ أَبدًا بَل كَانَ يَغْمُرُنَا بِالْمَوَدَّةِ والعَطْفِ وَكَانَ يَدِيُّلُ البيتَ مَتَأْخُرا فِي الليلِ وبِكُلُ هُدُوءٍ حتى لَا يُزْعِجَ أُحدًا مِن النائِمِيْنَ وَكَانَ يَدْخُلُ فَيَطْمَئِنُّ على غِطَاءٍ كُلِّ الأَبْنَاءِ

অর্থ : তিনি আমাদের প্রতি খুবই স্লেহশীল ছিলেন। তার মাঝে কখনোই রুক্ষতা অনুভব করিনি। তার ভালোবাসা সবসময়ই আমাদের ঘিরে থাকত। মাঝে মধ্যে রাতে ঘরে ফিরতে বিলম্ব হতো তাঁর। কিন্তু এত সতর্কভাবে আসতেন যে, ঘুমন্ত কারও ঘুমে ব্যাঘাত ঘটত না। তিনি ঘরে ঢুকে প্রথমে ছেলেমেয়েদের ঘরে যেতেন এবং তাদের গায়ে কম্বল-কাঁখা ঠিকমতো আছে কি না দেখে নিতেন।

এ হলো ইমাম হাসান আল বান্নার জীবনাদর্শ। যিনি কোনো ওহিপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন না। তিনি ওহির ধারা বন্ধ হওয়ার একদিন দুদিন নয়, দেড় হাজার বছর পর পৃথিবীতে এসেছিলেন। যার দ্বীনি দাওয়াতের ব্যাপকতা এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, তাকে বিশ শতকের দাওয়াতি মুজাদ্দিদ ও

ফিরে এসো নীড়ে

১. আল আখাওয়াতুল মুসলিমাত ওয়া বিনাউল উসরাতিল কুরআনিয়্যাহ : ২৭৬-২৭৭।

সংস্কারক মনে করা হয়। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এমন একজন মানুষের কর্মব্যস্ততা কতটা ব্যাপক হতে পারে। তারপরও দেখলেন তো, তিনি পরিবারের প্রতি কতটা দায়িতুশীল ছিলেন।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা, ইমাম হাসান আল বান্নাকে জানুন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ খুঁজে পাবেন তার মাঝে। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও যে নববী আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া যায়, তার বাস্তব প্রমাণ এরকম অসংখ্য মানুষ দেখিয়ে গেছেন, দেখিয়ে যাচ্ছেন। তাদেরকে জানুন, আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করুন।

আরও ভাববার বিষয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত। তিনিই যখন নারীর মর্যাদা ও অবস্থানকে উচ্চে তুলে ধরেছেন, তাদের প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন, মুসলমানদের বিষয়ে স্ত্রীর সাথেও পরামর্শ করেছেন; তখন তাঁর অনুসারী হলে মুসলিম পুরুষদের উচিত নারীদের যথার্থ মূল্যায়ন করা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকারটুকু প্রদান করা। তিক্ত হলেও সত্যা, এ ব্যাপারে জাতিগতভাবে আমাদের অনেক শিথিলতা হয়ে গেছে। এখনই সময় সঠিক পথে ফিরে আসার।

সপ্তম অধ্যায়

একজন আদর্শ মা

মাহাত্ম্যের উৎসমূল, নেতৃত্বের লালনক্ষেত্র

সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ইসলামী শরীআতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে নারী-পুরুষ উভয়কে দেওয়া হয়েছে। তথাপি, মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্কের গভীরতা বেশি। মা-ই শিশুর সাথে সবসময় লেগে থাকেন। তিনিই তাকে গর্ভে ধারণ করেন, স্তন্যদান করেন; তার সবকিছুর দেখাশোনা করেন। মায়ের শরীর ও স্বাস্থ্য থেকেই সন্তানের শরীর ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। মা-ই সন্তানের জন্য রাত জাগেন। মা-ই সন্তানের জন্য অধিকাংশ কাজ করেন।

এটা স্রষ্টার প্রাজ্ঞ সৃষ্টিবিধান। তিনি নারীর সৃষ্টি-উপাদানে এমনই কিছু দিয়ে রেখেছেন, যা তাকে অবলীলায় এসবে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ইসলামের কর্মবন্টন-নীতিও এমনই। তাই মা-ই সন্তানকে উন্নত চরিত্রের দিশা দেন, তাকওয়া-তাহারাত ও পবিত্রতায় দীক্ষিত করেন। মায়ের প্রাজ্ঞ পরিচালনায় শিশু শৈশব, কৈশোর পার করে; পরিণত হয় শক্ত-সমর্থ-পূর্ণ মানুষে। তারপর তারাই সমাজের মাহাত্ম্য হয়, জাতির নেতৃত্ব হয়। তাই তো মা মাহাত্ম্যের উৎসমূল, নেতৃত্বের লালনক্ষেত্র।

কবি হাফিজ ইবরাহিমের ভাষায় বলতে হয়,

ফিরে এসো নীডে

الْأُمُّ مَدرسةٌ إذا أعدَدْتَها أعدَدْتَ شِعْبًا طيِّب الْأعْرَاقِ

অর্থ : জননী জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। যদি এ বিদ্যালয়টিকে ভালোভাবে গড়তে পার, তবে গড়তে পার উন্নত জাতি।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, আমরা যে সমাজে বাস করি, সেই সমাজে তো অনেক অনৈসলামিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, অবস্থাদৃষ্টে ভ্রম হয়, এটা কি ইসলামী সমাজ, না অন্য কিছু। অনেকে বলেন, এটা আধা ইসলামী সমাজ। তা যাই হোক, এমন প্রতিকূল পরিবেশে শরীআতের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয় এমন ফলপ্রসূ লালন-পালন কী করে সম্ভব? অনেকে বলে বসেন, ভবিষ্যতে আর সাচ্চা ঈমানদার, আল্লাহওয়ালা নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়সাল্লামের জীবনাদর্শ লক্ষ করুন, আমাদের সালাফে সালিহীনের জীবনাদর্শে দৃষ্টিপাত করুন, দেখবেন, জীবন ও জগতে পূর্ণ আল্লাহমুখী; মন-মানসে, আচার-ব্যবহারে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম-প্রজন্ম গড়ে তোলা এখনো সম্ভব।

কিন্তু সেরকম একটি গৌরবময় প্রজন্ম যখন-তখন, যেমন-তেমন করে আসে না। এজন্য প্রয়োজন হয় অনেক দিনের নিরন্তর সাধনার, আরাধনার; বেলানাগা মেহনতের, মুজাহাদার। এজন্য আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মৌল নীতি ও আদর্শ এবং ঈমানী রূপরেখা এঁকে দিয়ে গেছেন, যা আমাদের একটি ইসলামী পরিবার ও ইসলামী সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْأَمِيْرُ الذيْ عَلَى الناسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسؤؤلٌ عَنْهُمْ, والْمَرْأَةُ رَاعِيَةً مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ, والْمَرْأَةُ رَاعِيَةً

عَلَى بَيْتِ بَعْلَهَا وَوَلَدِهِ وهِيَ مسؤولة عنهم, والعبدُ راَعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ وهو مسؤولًا عنه ألا فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ : শোনো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকেই যার যার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি নেতা নির্বাচিত হবেন, তিনি সমাজের দায়িত্বশীল। তিনি তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তিনি তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। নারী স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীল। তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। সেবক তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। তিনিও সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। শোনো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।

এই হাদীসটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভান্ন আঙ্গিকে নারী-পুরুষ উভয়ই দায়িত্বশীল। সন্তান মানুষ করার বিষয়টি উভয়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে। এক্ষেত্রে কোনো একজন যদি নিজ দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তা হলেই ঘাটতি থেকে যাবে।

সন্তান মানুষ করার এই নীতিটিই সুন্দর সহাবস্থান, ভালোবাসা ও দয়ার্দ্রতার পরিচায়ক। সন্তান লালন-পালনের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ভেদ আছে। ইসলামে সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সবগুলোই একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলোর কোনো একটিকে কোনো একটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অবকাশ নেই। এগুলোর প্রত্যেকটিই এমনভাবে সাজানো, যেন পূর্বেরটি পরেরটির ক্ষেত্রপ্রস্তুত্বকারী।

ব্যক্তিজীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা যায় শৈশবকে। এজন্যই ইসলাম শৈশবের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ সময় শিশুকে যে চিন্তাচেতনা ও অভ্যাসের ওপর গড়ে তোলা হবে, সেটাই তার মনে বসে যাবে। এটা সারা জীবন তার ওপর প্রভাবক হিসেবে কাজ

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ফিরে এসো নীডে

করবে। শৈশবে সে যে চেতনা লাভ করেছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া তার জন্য খুবই কঠিন হবে।

এজন্য ইসলাম এ ব্যাপারে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, মানুষ যখন বিবাহের চিন্তাভাবনা গুরু করে, তখন থেকেই তাকে এ ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়। যেন কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করা সম্ভব হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِمَا ولِجَسَبِهَا ولِجَمَالِمَا ولِدِيْنِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

অর্থ : মেয়ে বিবাহ করা হয় চারটি গুণ দেখে : অর্থ দেখে, বংশ দেখে, সৌন্দর্য দেখে এবং ধার্মিকতা দেখে। তুমি কিন্তু ধার্মিক মেয়ে খুঁজে নেবে। বুঝলে, হে!

নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وِخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرضِ وفسَادٌ عَرِيْضٌ

অর্থ : যদি তোমরা এমন কাউকে পাও যার ধার্মিকতা এবং স্বভাব-চরিত্র তোমাদের কাছে সন্তোষজনক, তা হলে তার সাথে মেয়ে বিবাহ দাও। নয়তো জমিনে ফেতনা হবে। ব্যাপক গোলযোগ হবে। ২

নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

تَخَيَّرُوْا لِنُطْفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

অর্থ : তোমরা তোমাদের বংশধারার জন্য ভালোমন্দ যাচাই করো। যথাযোগ্য ও সমকক্ষ দেখে বিবাহ করো এবং বিবাহ দাও।

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

২. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকী।

ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকী।

ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পুরুষ যখন তার জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করে নেবে, তখনই বলা যাবে যে, সে তার সন্তানের প্রতি সদাচার করল, ন্যায় বিচার করল। কেননা, সে তার সন্তানকে একজন ভালো মা উপহার দিল। কবি বলেন,

> وَ أُوَّلُ إِحْسَانِيْ إِلَيْكُمْ تَخَيُّرِي لِمَاحِدةِ الأعْرَاقِ بادٍ عَفَافُها

অর্থ : তোমাদের প্রতি আমার প্রথম অনুগ্রহ এই যে, আমি তোমাদের জন্য একজন সৎ বংশজাত মা নির্বাচন করেছি, যার পবিত্রতা সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট।

এভাবে একজন নারীও যখন ধার্মিক জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার প্রয়াসী হন, তখনই মূলত সন্তানের প্রতি সদাচার ও ন্যায় বিচার করেন। কেননা, এভাবেই তিনি তার সন্তানকে একজন ভালো পিতা উপহার দেওয়ার পূর্বশর্তটি পূর্ণ করেন।

ইসলামের বিধি মুতাবিক সম্পন্ন হওয়া এরকম একটি আদর্শ বিবাহের পরই একটি সুস্থ, সুন্দর দাম্পত্যজীবনের নিশ্চয়তা-বিধান সম্ভব হয়। এভাবে একটি সত্যিকারের ইসলামী পরিবার গঠন ও উন্নত প্রজন্ম গড়ে তোলার পথ সুগম হয়। ইনশাআল্লাহ, এরকম একটি ইসলামী পরিবারে আল্লাহর রহমত নেমে আসবে। এই পরিবারের মাতৃকোল হবে আল্লাহর রহমত ও করুণায় ভরা। এই পরিবারের স্বচ্ছ সুন্দর পরিবেশ হবে আল্লাহর অনুগ্রহে আচ্ছাদিত। ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের রক্ষণাবেক্ষণ, আল্লাহপ্রদত্ত ফিতরাতের সংরক্ষণ যদি সম্ভব হয়, তা হলে এই পরিবারেই হবে।

অষ্টম অধ্যায়

শিশুর লালন-পালন

এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম নিয়ে। প্রকারান্তরে এটাই হবে মানুষের আলোচনা। বরং সমগ্র মানব জগতের আলোচনা—দেশে, বিদেশে; পুবে, পশ্চিমে; সর্বত্র। মানুষের যেটি মৌলিক অধিকার, বরং মূল গোড়ার অধিকার, সেটিই যদি আলোচনায় না আসে, তা হলে মানুষের অধিকার আলোচনার কী সার্থকতা থাকে? এজন্যই ইসলামের নবী, মানবতার নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যা আমাদের মানুষের জন্মলগ্ন থেকে তার সমগ্র অধিকার আদায়ে সাহায্য করে।

জনালগ্নে

১. শিশুর কানে আজান দেওয়া

জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই শিশুর কানে আজান দেওয়া। তাৎপর্য এই যে, এতে পৃথিবীর বুকে আগমন করে প্রথম যে বাণীটি তার কানে ধ্বনিত হবে, তা হলো আল্লাহর একত্ব ও বড়ত্বের বাণী।

হযরত আবু রাফে রাযি. বলেন, আমি দেখেছিলাম, হযরত ফাতেমা রাযি.-এর গর্ভে যখন হযরত হাসান ইবনে আলী রাযি. জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে আজান দিয়েছিলেন।

২. তাহনীক করা

অর্থাৎ শিশুর মুখে খেজুর বা এ জাতীয় কোনো মিষ্টিদ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে আবু বুরদাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

وُلِدَ لِيْ غُلَامٌ فَأَنَيْتُ رسولَ اللهِ فَسَمَّاهُ إبراهيمَ وحَنَّكَهُ بالتَمْرِ ودَعَا له بالبَرَّكَةِ

অর্থ: আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম। তিনি তাকে খেজুর দিয়ে তাহনীক করালেন এবং বরকতের দুআ করে দিলেন।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যিনি কানে আজান দেবেন এবং যি ন তাহনীক করাবেন, তিনি সৎ ও মু্তাকী হওয়া কাম্য। আশা করা যায়, এতে শিশুর ওপর ভালো প্রভাব পড়বে।

৩. সুন্দর নাম রাখা

রাসূল সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القيامةِ بِأَسْمَائِكُمْ وِبأسماءِ آباءَكُمْ فأحسنُوْا أَسْمَائِكُمْ

অর্থ : কিয়ামতের দিন তোমাদের নাম ধরে এবং তোমাদের পিতার নাম ধরে তোমাদের ডাকা হবে। সূতরাং তোমরা সুন্দর সুন্দর নাম রাখো।

৪. আকীকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

১. আবু দাউদ, তিরমিযী।

২. আবু দাউদ।

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَمِنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عِنْدَ يَوْمٍ سَابِعِهِ وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ ويُسَمَّى

অর্থ : প্রত্যেকটি শিশুরই আকীকা করানো উচিত। জন্মের সপ্তম দিনে পশু জবেহ করা হবে, শিশুর মাথা মুণ্ডানো হবে এবং সুন্দর নাম রাখা হবে।

৫. সদকা

জন্মের সপ্তম দিনে মাথা মুণ্ডানোর পর চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করা। মাথা মুণ্ডানোর উপকারিতা হলো, এতে মাথার লোমকৃপ উন্মুক্ত হয়; যা মস্তিক্ষে রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক হতে সহায়তা করে। আর সদকা মুসলিম-সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি জাগ্রত রাখে; সেই সাথে একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও হিতাকাঞ্চার মানসিকতাও রক্ষিত হয়। সুখ দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার যে অনুপমতা তাও বিবেচনা পায়।

৬. খতনা

শিশুকে খতনা করানোর উদ্দেশ্য হলো পরবর্তীতে বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে শিশুর স্বাস্থ্যসূরক্ষা।

৭. স্তন্যদান

শিশুকে পূর্ণরূপে খাদ্য যোগানোর জন্য স্তন্যদানের বিকল্প নেই। তবে একে শুধু শিশুর খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। বরং এটা শিশুর লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মায়ের ভালোবাসার সাথে এর সম্পৃক্তি খুবই সরাসরি। শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানস গঠনে অচিরেই এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

এই হলো জন্মলগ্নে শিশুর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সবগুলোরই আছে বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য। এগুলোকে সন্তানপালনের মূল ভিত্তিও বলা চলে। পিতামাতার কর্তব্য এগুলোকে যথাযথভাবে পালন করা, যাতে সন্তান একজন সৎ, মুন্তাকী ও পরহেযগার মানুষে পরিণত হতে পারে।

তিন বছর বয়স পর্যন্ত

শিশুর জন্মের প্রথম বছরে পিতার করণীয় তো অবশ্যই আছে; কিন্তু মায়ের করণীয়ই মুখ্য। শিশুকে স্তন্যদান করা, শিশুর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, পর্যায়ক্রমে শিশুকে বিভিন্ন অবস্থার জন্য প্রস্তুত করা—সবই একজন মা-ই যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

শিশুর মানস ও ব্যক্তিত্ব গঠনে এখন থেকেই মনোযোগী হতে হবে।
শিশুর পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নশীল হওয়ার সাথে সাথে সুনির্দিষ্ট সময়সূচি
ও কর্মবিন্যাস মেনে চললে শিশু পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাও পায়, শৃঙ্খলার
শিক্ষাও পায়।

শিশুকে দুধপান করানো, অতঃপর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিন। এ সময়ও তার মাঝে আনুগত্যের গুণ বপন করার চেষ্টা করুন। কিছু সময় তাকে কাঁদতে দিন। কেঁদে উঠলেই কোলে তুলে নেবেন না। একটু ধৈর্য ধরুন। তারপর কোলে তুলে নিন, এরপর প্রয়োজনে স্তন্যদান করুন। এভাবে তাকে ধৈর্যের দীক্ষা দান করুন। সহনশীলতার দীক্ষা দান করুন।

মনে রাখবেন, শিশু যখন মায়ের দুধ পান করে, তখন সে মায়ের উত্ত গুণাবলি ও সুন্দর চরিত্রমাধুরীর সুধাও পান করে। এভাবেই তার মে ব্যক্তিত্ববোধ আসে, আত্মসমানবোধ আসে। যা ঠিক নয়, তা প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতা আসে।

এখন থেকেই আপনি আপনার কোমলমতি শিশুর মনে আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূলের ভালোবাসা জাগ্রত করার চেষ্টা করুন। এজন্য বারবার তার সামনে আবৃত্তি-পুনরাবৃত্তি করুন এমন সব কথা, কবিতা, হামদ, নাত ও ইসলামী গান যা আপনাকে আপনার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করে। তাকে যখন ঘুম পাড়িয়ে দিতে চান, তখন তার সামনে এই গান-কবিতাগুলো বলুন, আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূলের ভালোবাসা-সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করুন। যখন তার ঘুম ভেঙে যায়, এবং সে চিৎকার করে ওঠে, তখন তার সামনে উচ্চস্বরে সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াত্ল কুরসি ইত্যাদি তাআওউযাতগুলো পড়ন, এবং তাকে শান্ত করার চেষ্টা করুন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, 'আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তর প্রশান্ত হয়।'

এ ব্যাপারে শিথিলতা করবেন না। মনে রাখবেন, জন্মের পর থেকে যত কিছু শিশুর কর্ণগোচর হয়, সবই তার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত থাকে। সে যখন কথা বলতে শেখে, তখন ওইসব কথাই বলে যেগুলো তার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রয়েছে।

প্রিয় বোন,

কখনোই শিশুকে ধমক দেবেন না। তার বয়স যদি কয়েক মাসও হয়ে যায়, তবুও এমন করবেন না। কারণ, সে আপনার গুণেই গুণান্বিত হবে। সুতরাং মন্দ গুণগুলো নিজেও কঠোরভাবে পরিহার করার চেষ্টা করুন। শিশু যদি আপনাকে বিরক্ত করে, তা হলে তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করুন; বরং বেশি বেশি কল্যাণের দুআ-বাক্য উচ্চারণ করুন। পারলে তাকে কুরআনের রেকর্ড শুনিয়ে শুনিয়ে শান্ত হওয়ায় অভ্যন্ত করুন। কুরআনের রেকর্ড শুনিয়ে খুমিয়ে যাওয়ায় অভ্যন্ত করুন। কবি বড় চমৎকার কথা বলেছেন.

وَيَنْشَأُ ناشِئُ الفِتْيَانِ فِينَا عَلَى مَاكَان عَوَّدَهُ أَبُواهُ

অর্থ : সন্তানরা বেড়ে ওঠে মা বাবা যেভাবে গড়ে তোলে সেভাবে

মানুষ সবসময়ই অভ্যাসের দাস। তাই শিশুকে ভালো কিছুতেই অভ্যস্ত করুন। যেন সেটাই সন্তানের জন্য আপনার ঈদ্ধিত বিষয় হতে পারে। এজন্য খুবই সতর্ক হোন। অলসতা ঝেড়ে ফেলুন। মনে রাখবেন, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট আমানত। আপনার প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণ হোক বুদ্ধিদীপ্ত। শিশুর সাথে প্রতিটি কথা চিন্তা করে বলুন। বুঝে শুনে বলুন। যখন, যেখানে যে আচরণ করবেন, বুঝে শুনে করুন, ভেবে চিন্তে করুন। আপনার প্রজ্ঞাপূর্ণ লালন-পালন অভিন্ত লক্ষ্যে আপনাকে পৌছে দেবে। আপনি তো মমতাময়ী মা। শিশুর জ্ঞান ও মাহাত্য্যের উৎসও আপনি। আপনার সন্তানের প্রকৃত আদর্শও আপনি। মনে রাখবেন, শুধু উপদেশে কাজ হয় না। নিজের আচরণ-উচ্চারণ, নিজের চলা-বলা, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি—এগুলোই বেশি কাজে আসে।

বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত

ক, ঈমানী তরবিয়ত

মোটামুটি তিন বছর বয়স থেকেই আমরা আমাদের সন্তানদের ঈমানী তরবিয়ত শুরু করে দেব। এবং এটা জরুরি। এক্ষেত্রে গড়িমসি করা শিশুর প্রতি খুবই অন্যায় হবে। ঈমানী তরবিয়তের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলোর মধ্যে আমরা যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেব:

১. আকীদা বিশ্বাস

এক্ষেত্রে সর্বাশ্রে আসতে পারে তাকওয়া। ক্ষুদ্র অর্থে আল্লাহর ভয় ও সেই ভয়ের প্রভাব। আমরা শিশুর অন্তরে এখন থেকেই আল্লাহর ভয় জাগ্রত করতে সচেষ্ট হব। মনে রাখব, শুধু মুখে মুখে শিশুকে এসব বুঝিয়ে লাভ হবে না। এগুলো তাকে দেখাতে হবে, বোঝাতে হবে—নিজেদের আমলের মাধ্যমে, নিজেদের আলোচনার মাধ্যমে। আমরা আমাদের সন্তানকে বাস্তবভিত্তিক অনুশীলন-পুনর্নুশীলন, চর্চা-পুনচর্চা দেখাব। শিশু আমাদের দ্বারাই প্রভাবিত হবে। আমাদের আমলের মাধ্যমেই সে আল্লাহর অন্তিত্ব কল্পনা করতে শিখবে এবং আল্লাহর প্রতি ভীতি বোধ করতে সক্ষম হবে।

এই একটি বিষয়ই ব্যক্তিকে সারা জীবন পাপ বর্জন ও পূণ্য অর্জনে উৎসাহিত করে। ব্যক্তির জীবনে তাকওয়ার প্রভাব কত বেশি তা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

التَّقْوَى هَهُنَا وأشَارَ إلَى صَدْرِهِ ثَلَاثًا

অর্থ : তাকওয়া এখানে। তিনি প্রায় তিনবার কথাটি বললেন এবং প্রতিবারই নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন।

তা হলে, তাকওয়ার সম্পর্ক মনের সঙ্গে। মন নষ্ট হয়ে গেলে সব নষ্ট। মন ঠিক থাকলে সব ঠিক। সুতরাং আমরা আমাদের কোমলমতি শিশুর মন-মানসের প্রতি যত্নশীল হব সবচেয়ে বেশি। তার কোমল হদয়েই আমরা তাকওয়ার বীজ বপন করব। আমরা এই বিশ্বজগতের সৌন্দর্য তার সামনে তুলে ধরব। এভাবে আল্লাহর মহত্ত্ব-বড়ত্ব তুলে ধরব। তাকে বোঝাব, এগুলোর একমাত্র স্রষ্টা হলেন আল্লাহ। তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এভাবে আমরা আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের সহজ সহজ ও মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি এখন থেকেই তাকে উৎসাহী করে তুলব। আল্লাহ আমাদের তওফিক দান করুন। আমীন।

২. পিতামাতার আনুগত্য

আমরা আমাদের সন্তানদের এই কচি বয়স থেকেই পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করব। এর ফল খুবই ব্যাপক ও সুদ্রপ্রসারী। বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা খুবই কঠিন মনে হচ্ছে। এজন্য খুব বেশি আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব এবং নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করব। আমরা আমাদের শিশুর প্রতি এমন হব, যেন সে এখন থেকেই আমাদের কথা শোনার জন্য, মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। সে যেন আমাদের সামনে গলা উঁচু করে কথা বলতেও লজ্জাবোধ করে; বরং ভীতি বোধ করে। আমাদের উপদেশে বিরক্তি প্রকাশ করার মতো মানসিকতা যেন তার না আসে। এ ব্যাপারে একটুও গড়িমসি করব না। যদি কখনো এমন হয় তা হলে খুব বেশি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করব। কুরআনে কারীমের এই আয়াতটির মর্মবস্তু তার অন্তরে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করব,

وَقَضى رَبُكَ ٱلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُنِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

অর্থ: তোমার আল্লাহ তোমার জন্য এই ফায়সালা করেছেন যে, তুমি তথু তাঁরই ইবাদত করবে। পিতামাতার প্রতি সদাচারী হবে। ... তাদের কারও প্রতি কখনো উফ শব্দটিও উচ্চারণ করবে না। তাদের সাথে গলা উঁচু করে কথা বলবে না। তাদের সাথে গথা বলবে বড় সম্মানের সাথে।

সাত বছর বয়সে

এভাবে মোটামুটি সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমরা আমাদের শিশুর ঈমানী তারবিয়াতের ক্ষেত্রে মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের পাশাপাশি

১ সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪।

আল্লাহর ভয় ও পিতামাতার আনুগত্য—এই দুটো বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। এগুলো আমাদের সফলতার প্রথম ধাপ। এর মধ্যেও সম্ভব হলে তাকে ইবাদত সম্পর্কেও একটু আধটু ধারণা দেব। কিন্তু সাত বছর বয়স থেকে সে অনেক কিছুই ভালো করে বুঝতে শিখবে। ইবাদত সম্পর্কেও ভালো করে বুঝতে শিখবে। এখন আমরা তাকে ইবাদতের প্রতি মনোযোগী করতে সচেষ্ট হব।

১. পবিত্রতা ও নামায

সর্বাগ্রে আসবে তাহারাত ও সালাত—অর্থাৎ পবিত্রতা ও নামায। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مُرُوا أَبناءَكُم بالصلاةِ وَهُمْ أَبناءُ سُبِعِ سِنِيْن واضربوهُمْ عَلَيْها وهُمْ أَبناءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

অর্থ: তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়স থেকে নামাযের নির্দেশ দিতে থাকো। আর দশ বছর বয়স হয়ে গেলে তাকে নামাযের জন্য শাসনও করো। এই বয়সে তোমরা তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিছানার ব্যবস্থা করে দেবে।

২. রম্যানে রোযা

এভাবে সাত বছর বয়স থেকে রমযান মাসে রোযা রাখার ব্যাপারেও উৎসাহিত করা উচিত। কেননা, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আগুরার দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী সাহাবীদের মহল্লায় মহল্লায় লোক পাঠালেন এই মর্মে যে,

مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يؤمِهِ ،ومَنْ أَصْبَحَ صائمًا فَلْيَصُمْ

অর্থ : আজকে যারা রোযা রাখেনি, তারা বাকি সময়টুকু উপোস থাকুক। আর যারা রোযা রেখেছে, তারা রোযা রাখুক।

১. হাকেম, আবু দাউদ।

ফিরে এসো নীড়ে

فَكُنَّا نَصُوْمُ وَنَصُوْمُ صِبْيَانَنَا وَنَحْعَلُ لَهُمُ اللِّعْبَةَ مِنَ العهنِ - الصوف المصبوغ - فإذَا بَكَى أحدُهُمْ أعطيناهُ ذاكَ حَتَّى يَكُوْنَ عندَ الإفطار

অর্থ : আমরা সেদিন সারাদিন রোযা রাখলাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখালাম। আমরা তাদের জন্য খেলনা বানিয়ে রেখেছিলাম। তারা কান্নাকাটি করলে সেই খেলনাগুলো দিয়ে তাদের থামানোর চেষ্টা করছিলাম। এভাবেই আমরা ইফতার পর্যন্ত পার করলাম।

সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশের তাৎপর্য

সাত বছর বয়সেই শিশুকে নামাযের তালীম দেওয়ার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য এই যে, শিশুরা এভাবে আল্লাহর বিশেষ করুণা-দৃষ্টি নিয়ে বেড়ে ওঠে। একেবারে ছোটবেলা থেকেই সময়মতো নামাযে অভ্যন্ত হয়ে ওঠে। একজন মুসলমানের জন্য নামাযই মূল। এই নামাযের মাধ্যমেই শিশু তার প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক করে। নামাযই তাকে শক্তিশালী মুসলিমে পরিণত করে। নামাযই শিষ্টাচার শেখায়। উদ্যমী করে। শান্তশিষ্ট করে। নামাযই জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। মানুষকে পূর্ণ মানুষে পরিণত করে। নামাযের প্রতি যত্নশীল হলে স্বভাবতই মানুষ সময়ের প্রতি যত্নশীল হয়ে ওঠে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, নামায হলো ধর্মের মূল; যে নামায ঠিক রাখল, সে তার ধর্ম ঠিক রাখল। যে নামায নষ্ট করল, সে ধর্ম নষ্ট করল। নামাযই মুসলিম, মুনাফিক আর কাফেরের পার্থক্য ভেদ করে।

৩. বিনয় ও মনোযোগিতা

শিশুকে নামাযে বিনয়ী ও মনোযোগী হতেও উদ্বুদ্ধ করব। এটা তাকে সন্তাগতভাবেই বিনয়ী ও মনোযোগী করে তুলবে। তবে মুখ্যত লক্ষণীয় এই যে, এরকম নামাযই ব্যক্তিকে আল্লাহর মারেফাত ও সত্যিকারের পরিচয় লাভে ধন্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

قَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّهِ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ

অর্থ : অবশ্যই প্রকৃত সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ, যারা তাদের সালাতে খুশু অবলম্বনকারী।

8. একমাত্র আল্লাহর জন্য

এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ইখলাস। আমরা আমাদের সন্তানদের নামায, রোযা ইত্যাদি বিভিন্ন আমলে তো উৎসাহিত করব; কিন্তু এমনভাবে করব, যেন তারা এই উপলব্ধি নিয়েই এগুলো করে যে, তারা এগুলো করছে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতকে, আল্লাহর প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতাকে খুবই যত্নের সাথে লালন করব।

খেয়াল রাখব, আল্লাহপ্রদত্ত মূল ফিতরাত যেন আমাদের অবহেলায় নষ্ট না হয়। তারা যেন কখনোই কপটতা না শেখে। বিষয়টিকে মোটেই কঠিন মনে করব না। আমাদের নিজেদের ইখলাস আমাদের মূল পূঁজি হতে পারে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা আমাদের মূল শক্তি হতে পারে। মনে রাখব, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَ مَا الْمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ "حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

অর্থ : আর তাদের শুধু এই আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে—দীনকে তার জন্য খালেস করে একনিষ্ঠভাবে; এবং সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এটাই প্রকৃত সরল ধর্ম।

১ সূরা মুমিনূন : ০১-০২।

২ সূরা বাইয়্যিনাহ : ০৫।

ফিরে এসো নীড়ে

৫. আল্লাহর ধ্যান ও কল্পনা

সন্তানের ঈমানী তারবিয়াতের মধ্যে আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়ে গেছে—রুহুল মুরাকাবা। আমরা আমাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হব, যেন তারা চলায়, বলায়, কাজে, কর্মে সর্বাবস্থায় মনের গভীর থেকে নিজে-নিজেই আল্লাহর অন্তিত্ব কল্পনা করতে পারে। আল্লাহর ধ্যান-ধারণা যেন প্রতিনিয়ত তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। সে যেন সত্যি সত্যিই উপলব্ধি করে যে, সে কী করছে না-করছে, সবই আল্লাহ দেখছেন; বরং আরও ভালো হয় যদি সে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে নিজেই আল্লাহকে দেখছে। মনে করব, এটাই হবে আমাদের শিশুর ঈমানী তরবিয়তের চূড়ান্ত সফলতা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওফিক দান করন। আমীন।

খ. সামাজিক শিষ্টাচার

আমরা আমাদের কোমলমতি শিশুদের তিন বছর বয়স থেকেই সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া শুরু করব। এ ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে পারি, সেগুলো নিমুরূপ:

১. অন্যদের প্রতি ভালোবাসা

আমরা আমাদের শিশুদেরকে ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও সতীর্থদের প্রতি ভালোবাসাবোধে উৎসাহিত করব। কেননা, এ থেকে তার মাঝে লাতৃত্ববোধ জন্ম নেবে। প্রকারান্তরে এটিই তার মাঝে সত্যিকারের মুসলমানের গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করতে সহায়তা করবে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি; ত্যাগ ও বিসর্জন, দয়ামায়া, পরার্থপরতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তাকে উজ্জীবিত করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا يُؤْمِنُ أَحدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কেউই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার এমন অবস্থা হয় যে, সে নিজের জন্য যা ভালোবাসে অন্যের জন্যও তাই ভালোবাসে।

২. পানাহারের শিষ্টাচার

আমরা আমাদের শিশুদের একেবারে ছোট্টবেলা থেকেই খাওয়া ও পান করার আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া শুরু করব। এ বিষয়ে যে হাদীসগুলো এসেছে, যে দুআগুলো এসেছে, সেগুলো তাদের আত্মস্থ করাব। ভান হাতে খাওয়া, ভান হাতে পান করা; যে কোনো কাজ ভান দিক থেকে, ভান হাতে করা—এগুলো শেখাব।

আমরা এগুলো করব আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে। যেমন তিনি বলেছেন:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمْيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

অর্থ : বৎস, আল্লাহর নাম নাও, ডান হাতে খাও, ডান দিক থেকে খাও। ^২

এভাবে আমরা আমাদের শিশুদের শেখাব, খাওয়ার আগে বলতে হয়:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যে-রিজিক দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।

এভাবে আমরা তাকে শেখাব, খাওয়ার পরে বলতে হয়-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

२. मरीर भूमनिम।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং যিনি আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।

এভাবে আমরা তাকে শেখাব, বয়সে যারা বড় আছেন, তাদের আগে খাওয়া শুরু করতে হয় না।

পান করার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা মোতাবেক আমরা তাকে শেখাব–

لَا تَشْرَبُوْا وَاحدًا كَشُرْبِ البَعِيْرِ ولَكَنْ اشْرَبُوْا مَثْنَى ونَلَاثَ وسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ

অর্থ : তোমরা এক শ্বাসে পান কোরো না। ওভাবে তো উট পান করে। তোমরা বরং দুই শ্বাসে অথবা তিন শ্বাসে পান করো। যখন পান কর, আল্লাহর নাম নিয়ে পান করো।

আমরা আমাদের শিশুকে শেখাব, সে যেন পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। আমরা তাকে বোঝাব, এটা সামাজিক শিষ্টাচারবহির্ভূত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

৩. শোয়ার আদব

শিশু যখন ঘুমোতে যায়, তখন তাকে ঘুমানোর আদব ও শিষ্টাচার শেখাব। সম্ভব হলে, ঘুমের সময় ওযু করতে উৎসাহিত করব। ডান কাতে শোয়াব। ঘুমোনোর সময় যে দুআ পড়ার কথা এসেছে, তা মুখে মুখে উচ্চারণ করাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وُضُوْئَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ

অর্থ : যখন বিছানায় যেতে চাও, তখন নামাযের মতো করে ওযু করে নাও। তারপর ডান কাতে শোও এবং বলো :

১. তির্মিযী।

২. তিরমিযী।

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَجْفُتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، آمَنْتُ وَأَجْفَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَامَنجَا إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذِيْ أَرْسَلْتَ بِكِتَابِكَ الذِيْ أَرْسَلْتَ

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি নিজেকে তোমার কাছে সঁপে দিলাম, তোমার প্রতি মনোনিবেশ করলাম, আমার যাবতীয় বিষয় তোমার কাছেই সোপর্দ করলাম এবং নিজেকে তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম—তোমার ভয় ও ভালোবাসা বুকে ধারণ করে। হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই, মুক্তির উপায় নেই। তুমি যে কিতাব নাজিল করেছ তার প্রতি এবং যে নবীকে পাঠিয়েছ তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম।

8. পরিচ্ছন্নতা

আমরা আমাদের শিশুদের শরীর ও কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার প্রতিও উৎসাহিত করতে থাকব। তার জিনিসপত্র যেন অগোছালো না থাকে সে ব্যাপারেও তাকে মনোযোগী করতে চাইব। এমনকি, ঘরের আসবাবপত্র গোছগাছ থাকছে কি না, তা নিয়েও তাকে ভাবতে শেখাব। এগুলো সবই আমাদের ধর্মের সৌন্দর্য।

এভাবে আমরা আমাদের শিশুদের ইস্তিঞ্জার বিভিন্ন আদব এবং টয়লেটে যাওয়ার দুআ শেখাব :

اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাইছি অনিষ্টকারী দুষ্টদের থেকে।

টয়লেট থেকে বের হওয়ার দুআ শেখাব :

غُفْرَانَكَ الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِيْ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার কষ্ট দূর করলেন এবং আমাকে আফিয়ত নসীব করলেন।

ফিরে এসো নীড়ে

৫. দৃষ্টির শিষ্টাচার ও অনুমতিপ্রার্থনা

আমরা আমাদের শিশুদের সব ধরনের ভদ্রতাই শেখাব। দৃষ্টিপাত করার ক্ষেত্রে ভদ্রতা কী, কীভাবে তাকাতে হয়, কী দেখা উচিত, কী দেখা অনুচিত ইত্যাদি বিষয়েও সচেতন করব। সাথে সাথে কারও ঘরে ঢুকতে অনুমতি চেয়ে ঢোকার বিষয়েও তাদের সতর্ক করব। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَإِذَا بَكَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসী এবং অপ্রাপ্তবয়ক্ষ বালকবালিকা তিনটি সময় যেন অনুমতি প্রার্থনা করে ঘরে প্রবেশ করে—ফজরের পূর্ব পর্যন্ত, দুপুরে তোমরা যখন কাপড় খুলে রাখ এবং এশার পর থেকে। এই তিনটি তোমাদের ভেতরগত সময়। এর বাইরে অন্য সময়গুলোতে তোমাদের এবং তাদের অসুবিধা থাকার বা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তোমরা তো একে অপরের কাছে আসা যাওয়া করোই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশাবলি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। কিন্তু এই শিশুরা যখন প্রাপ্তবয়ক্ষ হবে তখন তারা বড়দের মতো সব সময় অনুমতি প্রার্থনা করবে। –সূরা নূর: ৫৮-৫৯

সুতরাং শিশুদের ছোটবেলা থেকেই এমনভাবে গড়ে তুলব যে, তারা একে অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আমাদেরও উচিত, একটু বুঝ-বুদ্ধি হওয়ার পরই তাদের প্রত্যেকের বিছানা আলাদা করে দেওয়া। এতে ঈমানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা, বরং সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লজ্জাশীলতার দীক্ষা শিশু গঠনমূলকভাবেই লাভ করবে।

আমরা তাদের শেখাব, বাবা-মাসহ যে কারও ঘরে ঢুকতে তারা যেন অনুমতি চেয়ে নেয়। বিষয়টিকে আমরা মোটেও অবহেলা করব না। কারণ তারা ঘরে ঢুকে যদি কাউকে কোপাও এমন অবস্থায় দেখতে পায়, যেভাবে দেখা অশোভন; তা হলে এটা খুবই খারাপ হবে। এর ক্ষতি বড় ব্যাপক। এজন্য আমরা সতর্ক হব। বিশেষত মা-বাবাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে মা বাবার প্রতি তার যে শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত সেটা তো ব্যাহত হবেই, পাশাপাশি চারিত্রিক অবক্ষয়েরও আশঙ্কা আছে।

গ. শিক্ষা-দীক্ষা

শিশু যখন চার বছর পূর্ণ করবে, তখন থেকে আমরা তার বৃদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি-সাধনে মনোযোগী হব। তার মন ও মননের উপযোগী ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার সহজ ও উপকারী বিষয়গুলো তার সামনে তুলে ধরার প্রয়াসী হব। বিশেষত একটু একটু করে কুরআন ও হাদীস মুখস্থ করানোর চেষ্টা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) رواه ابن ماجة

অর্থ : জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। তিনি আরও বলেছেন,

أَدِّبُوْا أَوْلَادُكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وحُبِّ آلِ بَيْتِهِ, وتِلَاوَةِ القُرْآن، فإنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِيْ ظِلِّ عَرْشِ اللهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ

অর্থ : তোমরা তোমাদের শিশুদের তিনটি বিষয়ের দীক্ষা দাও : তোমাদের নবীর ভালোবাসা, তাঁর পরিবারবর্গের ভালোবাসা এবং কুরআন। যারা কুরআনের ধারক হবে, তারা আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে। সেদিন ওই ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।

১. ইবনে মাজাহ।

২. তাবরানী।

আমাদের সালাফে সালিহীন শিশুদের সর্বপ্রথম কুরআন শিক্ষা দেওয়ায় উৎসাহিত করেছেন। সেজন্য আরবী ভাষা শিক্ষা করাও জরুরি। ঈমান ও আকীদার মৌলিক জিনিসগুলো অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। বর্ণিত আছে, ফযল ইবনে যায়দ জনৈকা মহিলার সাথে একটি ছেলেকে দেখলেন। ছেলেটির চলন-বলন তাকে মুগ্ধ করল। তখন তিনি মহিলাটিকে তার ছেলেটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বলল,

إِذَا أَتُمَّ خَمْسَ سنَواتٍ أَسلَمْتُه إِلَى الْمُؤَدِّبِ فَحَفَّظ القرآنَ فَتَلَاه وَعَلَّمَه الشِعْرَ فرَوَاه, ورَغَّب فِي مُفَاحِرَة قومِه ولقَّن مآثرَ آبائه وأحدادِه, فإذا بلَغ الحُلُم حَملتُه على أعْناقِ الخَيْلِ ، فتَمَرَّسَ وتَفَرَّسَ, ولبِس السلاحَ ومشَى بين بُيُوت

الحَيِّ وأَصْغَى إلى صَوْتِ الصارخِ الْمُسْتَغَيْثِ ...

অর্থ : আমার ছেলের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখনই তাকে গুরুর হাতে তুলে দিয়েছি। গুরু তাকে কুরআন শরীফ মুখস্থ করিয়েছেন। এখন সে কুরআন তেলাওয়াত করে মানুষকে শোনায়। গুরু তাকে আরবী কাব্যভাগ্রার মুখস্থ করিয়েছেন। সে এখন দিব্যি প্রাচীন আরবের কবিতা বর্ণনা করে। গুরু তাকে পূর্বপুরুষদের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছেন যে, সে এখন কথায় কথায় তাদের কীর্তিগাথা তুলে ধরে। আমার ছেলে শক্ত সমর্থ হতে না হতেই তাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়েছি। সে এখন পাকা অশ্বারোহী। ধনুক-তরবারি হাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়ায়। কান খাড়া করে থাকে, যদি কেউ বিপদে পড়ে চিৎকার করে, তা হলে সাহায্য করতে ছুটে যাবে তাই।

দেখুন বোন, এই বুদ্ধিমতি মহিলা কেমন কুশলী পরিকল্পনায় একেবারে ছোট্টবেলা থেকেই সন্তানের শিক্ষাদীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন।

আমরা আমাদের শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য পাঠশালায় পাঠাতে পারি। তবে শিশুর পাঠশালা-নির্বাচনে আমাদের দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। আমাদের

১ তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম : ১/২৬৫।

আগ্রহের তালিকায় যেন সর্বাগ্রে এমন পাঠশালা থাকে, যেখানে আমাদের সন্তানেরা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে।

নিছক আধুনিক শিক্ষা আমাদের কাম্য নয়। উন্নত শিক্ষা পাবে এমন মোহে পড়ে ভূলেও কোনো মিশনারি ক্ষুলের ভূত যেন আমাদের মাথায় সওয়ার না হয়। এতে তার ব্যক্তিসত্তা ও ইসলামী মূল্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করা হবে। এটা কেমন করে সম্ভব যে, ঘরে আমরা আমাদের সন্তানদের ইসলামী ভাবধারায় গড়ে তুলতে চাইব, আর পাঠশালায় সেসম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস গিলবে।

একটি বিষয় আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, তা এই যে, একটি প্রকৃত ইসলামী পরিবারে একজন সচেতন মায়ের কোলে যে শিশু বড় হবে, ইনশাআল্লাহ, পরবর্তীতে কোনো বিদ্যাই তার কাছে কঠিন হবে না। সুতরাং আগেই বিচলিত হয়ে শিশুকে বিধর্মীদের বিদ্বেষের বলি বানানো হবে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো।

আমাদের সন্তান যেন বুদ্ধিমান হয়, প্রতিভাবান হয় এবং লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়, সে জন্য আমাদের খুবই চৌকশ হতে হবে। তার সাথে গল্প করতে হবে, তাকে গল্প শোনাতে হবে। তাকে প্রচুর পরিমাণ সময় দিতে হবে। এটাকে সময়ের অপচয় বলা মোটেও ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে, এটা আমাদের বিনিয়োগ। সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ।

আমাদের গভীর দৃষ্টিতে তার ঝোঁক ও প্রবণতা লক্ষ করতে হবে।
এবং সে অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনো কিছুর সংশোধনের
প্রয়োজন মনে হলে খুবই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। তার প্রতিটি
কথায় মনোযোগী হতে হবে। তার যে কোনো মতকে অবশ্যই মূল্যায়ন
করতে হবে। হোক না তা শিশুসুলভ।

সে যখন কিছু জানতে চাইবে, অবশ্যই গুরুত্বের সাথে সেটার উত্তর দিতে হবে। বুঝে গুনে উত্তর দিতে হবে। এটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ, এতে তার জানার অগ্রহ নষ্ট হতে পারে। শিশুর খেলাধুলার প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। বিভিন্ন খেলা ও খেলনার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তার সাথে খেলতে হবে। দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি ইত্যাদি শারীরিক খেলার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক খেলারও ব্যবস্থা করতে হবে। এখন তো শিশুর বুদ্ধিকে শাণিত করে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর খেলনা পাওয়া যায়, এগুলোও কাজে লাগাব। তবে শরীয়তনিষদ্ধি খেলাধুলা থেকে শিশুকে বিরত রাখব।

সুন্দর সুন্দর গল্পের বই, ছড়া-কবিতার বই শিশুকে উপহার দেব। সেগুলো তাকে পড়াব। পড়ে পড়ে শোনাব। তাকে জীবন নিয়ে ভাববারও সুযোগ দেব। মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করব, সে কী হতে চায়? বিভিন্ন উপায়ে তাকে লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহিত করব। কখনো আদর দেব। কখনো পুরস্কৃত করব। কখনো বিশেষ বিশেষ উপহার দেব। কখনো কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাব। মাঝে মধ্যে বুদ্ধির পরীক্ষাও নেব। যেন সে আত্যনির্ভরশীল হতে শেখে।

শিশুর পাঠশালার প্রতি আন্তরিক থাকব। অবস্থার উন্নতি-অবনতির বিষয়ে পাঠশালার সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখব। পাঠশালা থেকে ডাকা হলে কখনো উদাসীনতা দেখাব না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যোগাযোগ করব। শিক্ষিকাদের কাছে নিজেকে দায়িত্বশীল অভিভাবক প্রমাণিত করব। শিশুকে পাঠশালায় নিয়মিত ও নিয়মানুবর্তী করে তুলব।

প্রায়ই শিক্ষিকাগণ আপত্তি করেন যে, অনেক অভিভাবককে তাদের সন্তানদের বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য ডাকা হয়, কিন্তু তারা আসেন না। অনেক ছেলেমেয়ে পাঠশালায় নিয়মিত হয় না, লেখাপড়ায় মনোযোগী হয় না; এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করাও সম্ভব হয় না। অনেক বাচ্চার অনেক রকম দুর্বলতা থাকে, সেসব কাটানোর জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়; কিন্তু তাদের পাওয়াই যায় না।

প্রিয় বোন,

আপনি যেন এমন না হন। আপনি যেন একজন সচেতন অভিভাবক হন। নইলে, অবহেলার ক্ষতি আপনার সন্তানের ওপরও পড়বে, আপনার পরিবারের ওপরও পড়বে। যেই সন্তানকে দিয়ে সমাজের কোনো লাভ হবে না, এমন সন্তান জন্ম দিয়ে লাভ কী? বিশেষত আমরা যে তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রগতির যুগে বসবাস করছি, তাতে অযোগ্য সন্তানের ভবিষ্যতটা কী হবে, ভেবে দেখুন। এ যুগের সাথে পাল্লা দেওয়া কি চাটিখানি কথা! আমাদের অবহেলার কারণে যদি শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়, তা হলে তার অবস্থা হলো এতিমের মতো, যার না মা আছে, না বাবা আছে। কবি বলেন,

لَيْسَ البتيمُ مَنِ انْتَهَى أَبَوَاهُ إن البتيمَ هُو الذي تُلْقِى لَه مِنْ هَمِّ الحِيَاةَ وخَلَّفَاه ذَلِيْلًا أمَّا تَخلتْ أو أبًا مَشْغُولًا

অর্থ: যে মা বাবাকে হারিয়েছে সে এতিম নয়। এতিম তো সে, যে মা বাবাকে পেয়েছে দায়িত্বীন ও উদাসীন অবস্থায়। জীবন চলার পথে সে একা, বড় একা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবারই শিশুর প্রকৃত পাঠশালা। এখানেই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। পাঠশালা একটি অবলম্বনমাত্র। শুধু পাঠশালার ওপর নির্ভর করে থাকলে শিশুর প্রতি অবিচার করা হবে। পরিবার ও পাঠশালার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।

অনেক নারীই আপত্তি করে বলেন, বিষয়গুলো খুবই কঠিন। কাজের ঝামেলা থাকে, আবার সন্তান বেশি হলে তো আরও মুশকিল। কিন্তু আমি মনে করি, মা যখন যথাযথভাবে প্রথম সন্তানের লালন-পালন করেন, তখন তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে যায়। পরবর্তী সন্তানদের লালন-পালন করা অনেক সহজ হয়ে যায়। একটু বুদ্ধিমন্তার সাথে ঘরের কাজগুলো আঞ্জাম দিলে তো সন্তানকে দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

প্রথম জীবনে আমি একজন চাকুরিজীবী নারী ছিলাম। তখনো আমার বড় মেয়ে পাঠশালায় যাওয়ার অনেক আগেই বেশ কিছু সূরা ও হাদীস মুখস্থ করেছিল। আমি নিজে তাকে বর্ণমালা, গণনা ও হস্তলিপি শিখিয়েছিলাম। সত্যিই আমি তখন অনেক ব্যস্ত ছিলাম। তারপরও প্রতিদিন একটু একটু করে সময় দিতে দিতে আমার মেয়ের অনেক উন্নতি হয়েছিল। আমি প্রতিদিন তার লেখা দেখতাম এবং প্রতিদিন তার মুখস্থ করা বিষয়গুলো শুনতাম।

আমার মনে হয়, একটু কুশলী হলে খুব সহজেই বাড়ির কাজগুলো সেরেও সন্তানকে অনেক সময় দেওয়া যাবে। আবার ইচ্ছা করলে ঘরের ছোটখাটো কাজগুলো করতে করতেও শিশুকে অনেক কিছু শেখানো যায়। কাজকর্ম গোছালো হলে ঘরের কাজ ও অন্যান্য দায়িত্বপালন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। অনেক সময়ও বাঁচানো যায়।

তা ছাড়া, মা যদি মনে করেন যে, তিনি বেশি সন্তান লালন-পালন করতে পারবেন না, তা হলে তো ইসলাম সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে সুন্দর নিয়মনীতি দান করেছে। তিনি দুই সন্তানের মধ্যবর্তী সময়ে যৌক্তিক ব্যবধান রাখতে পারেন যাতে প্রতিটি সন্তানকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা যায়।

সুতরাং কোনো অজুহাতেই সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা, শিষ্টাচার, স্বভাব চরিত্র ও মানসগঠনের বিষয়ে অলসতা করা কোনো দায়িত্বশীল মায়ের উচিত নয়। সমস্যা থাকবেই। সবকিছুর মধ্যেও সন্তানের লালন-পালনে সর্বোচ্চ মনোযোগী হতে হবে। একটু ভাবুন তো, অজুহাত যে দেখাবেন, কাকে? কার বিষয়ে? নিজেকে? নিজেরই সন্তানের বিষয়ে?

মনে রাখবেন, সন্তান লালন-পালনের বিষয়টি মানব-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সন্তান লালন-পালন মানে সন্তানকে মানুষ করা। সর্বদিক থেকে মানুষ করা। ঈমানের দিক থেকে। চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে। বিনয়ের দিক থেকে। সততার দিক থেকে। এগুলো কেন? কেননা, এগুলোই তাকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত করে তুলবে।

ঘ, চারিত্রিক শিষ্টাচার

আমরা আমাদের সন্তানদের একেবারে ছোট্টবেলা থেকেই চারিত্রিক শিষ্টাচারে দীক্ষিত করব। এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখব তা হলো:

১. সত্যবাদিতা

আমরা শিশুকে সং ও সত্যবাদী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করব। তার অন্তরে সত্য বলার সাহস যোগাব। এটাকে তার কাছে সুন্দর ও প্রশংসনীয় করে তুলে ধরব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُوْرِ وإِن الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النارِ ومَا زَالَ العبدُ يكْذِبُ ويَتَحَرَّى الكذبَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

অর্থ: তোমরা মিখ্যা থেকে দূরে থাকো। মিখ্যা পাপাচারে ঠেলে দেয়। আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। বান্দা মিখ্যা বলতে বলতে একসময় আল্লাহর কাছে মিখ্যাবাদীদের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়।

আবদুল কাদির জিলানী ও ডাকাতদল

শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী রাহ, বলেন,

'আমি একবার জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে মক্কা থেকে বাগদাদ রওয়ানা করলাম। আমার মা আমাকে চল্লিশটি দিরহাম সঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি আমার কাছ থেকে সদা সত্য বলার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। আমরা যখন হামদান শহরে পৌছুলাম, তখন একটি ছিনতাইকারী বাহিনী আমাদের ওপর চড়াও হলো। তারা কাফেলার যার কাছে যা পেল নিয়ে নিতে লাগল।

একজন আমার কাছে এসে বলল, তোমার কাছে কী আছে? আমি বললাম, আমার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে। লোকটি মনে করল, আমি মিথ্যা বলেছি। সে নাক সিটকিয়ে চলে গেল। এরপর আরেকজন আমার

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ফিরে এসো নীড়ে

কাছে এল। সেও একই প্রশ্ন করল। আমিও সেই আগের উত্তরই দিলাম। তখন লোকটি আমাকে ধরে তাদের সরদারের কাছে নিয়ে গেল। সরদার যখন দেখল সত্যিই আমার কাছে চল্লিশটি দিরহাম আছে, তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ভয় হলো না? কীসে তোমাকে সত্য বলতে বাধ্য করল? আমি বললাম, আমি আমার মাকে সত্য বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তাই আমার ভয় হলো যে, যদি মিখ্যা বলি তা হলে আমার মায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাই সত্য বলেছি।

কথাটি শুনে সরদারের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলো। সে চিৎকার করে উঠল। আবেগে গায়ের জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। বলল, আরে, তোমার মতো একটা পুচকে বালক, মায়ের কথা রাখতে, মায়ের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এতটা উদগ্রীব! আর আমি! আমার কী হলো যে, প্রতিনিয়ত আমার আল্লাহর সাথে নাফরমানি করছি? তার কথা রাখার, তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো মাথাব্যথাই আমার নেই।

সরদার এভাবে কিছুক্ষণ চিৎকার চেচামেচি করার পর যার কাছ থেকে যা নিয়েছিল, সব ফেরত দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। তারপর বলল, হে বালক, আমি তোমার হাতে হাত রেখে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে চাই। তখন অন্যরা বলে উঠল, সরদার, ডাকাতি করতে আমরা আপনাকে সরদার মেনেছি; আজ তাওবা করতেও আপনাকে সরদার মানছি। এভাবে তারা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা করল।

২. বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্লেহ করা

এভাবে আমাদের করণীয় হবে, তাকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে সে ছোটদের স্নেহ করতে শেখে এবং বড়দের শ্রদ্ধা করতে শেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِف حَقَّ كَبِيْرِنَا

১. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম : ১/১৭৫।

অর্থ : যে ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান রক্ষা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. বাগপাণ্ডিত্ব ও কথা বলার শিষ্টাচার

বলতে কী কী মাথায় রাখতে হয়, কথা বলার শিষ্টাচারগুলো কী কী, সেগুলোও তাকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে দেব, বুঝিয়ে দেব। বিশেষ করে

আমরা আমাদের সন্তানদের সুন্দরভাবে কথা বলা শিক্ষা দেব। কথা

বড়রা যখন কথা বলে তখন মনোযোগের সাথে তাদের কথা শোনা, বোঝা এবং বুদ্ধিমন্তার সাথে তার উত্তর দেওয়া—ইত্যাদি বিষয়ে তাকে

সচেতন করে তুলব।

এক বালকের বাগ্মিতা বর্ণিত আছে, হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে গ্রামাঞ্চলে

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। লোকজন হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের দরবারে আসে। তাদের মধ্যে দরবেশ ইবনে হুবাইবও ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর।
লোকেরা হিশাম ইবনে আবদুল মালিককে দেখে কিছুটা ভীতসন্ত্রপ্ত

হয়ে পড়ে, তাই পিছু হটতে শুরু করে। এমন সময় তার চোখ পড়ে যায় ইবনে হুবাইবের ওপর। তখন তিনি রক্ষীকে বলেন,

দ্যাখো কাণ্ড, কেউ আমার কাছে ভিড়তে চাচ্ছে না; অপচ উকরিপুকরি সবসৃদ্ধ চলে এসেছে!

ইবনে হুবাইব বুঝতে পারলেন যে, খলীফা তাকে দেখেই একথা বলেছেন। তখন তিনি মুখ খুললেন। বললেন,

আমীরুল মুমিনীন, লোকেরা বিপদে পড়ে এসেছে; কিন্তু ভয় পেয়ে নিবৃত্ত হয়েছে। কারণ, কথা বলা মানে ঝুড়ি খুলে দেওয়া, আর চুপ করে থাকা মানে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে রাখা। কিন্তু ঝুড়ি না খুললে তো বোঝা যায় না কী আছে।

১. আবু দাউদ, তিরমিযী।

হিশাম বললেন,

নে রে বাপু, তুই তোর ঝুড়ি খুলেই দে।

ইবনে হুবাইবের কথায় মুগ্ধ হয়েই হিশাম এভাবে উৎসাহ দেখালেন।

ইবনে হুবাইব বললেন,

আমীরুল মুমিনীন, আমরা এ পর্যন্ত তিনটি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছি; একটি আমাদের চর্বি খেয়েছে, একটি আমাদের গোশত খেয়েছে; আর অন্যটি আমাদের হাড়ে ঠোকরানো শুরু করেছে।

আর আপনাদের হাতে তো অনেক সম্পদ রয়েছে। যদি এগুলো আল্লাহর হয়, তা হলে আল্লাহর হকদার বান্দা যারা আছে, তাদের মধ্যে ছিটিয়ে দিন। আর যদি এগুলো আল্লাহর বান্দাদেরই হয়, তা হলে তাদের সম্পদ তাদেরকে দেওয়ায় বাধা কীসে? আর যদি আপনাদের হয়, তা হলে দান-খয়রাত করাই তো আপনাদের শান। তাতেই তো আপনাদের সিক্ত করবে আল্লাহর দান-ফয়য়য়ন।

আমীরুল মুমিনীন, দেহের জন্য প্রাণ যেমন, প্রজার জন্য শাসক তেমন। প্রাণ না থাকলে দেহের কী মূল্য থাকে?

হিশাম তখন ওই এলাকায় এক হাজার দিরহাম বিতরণ করার নির্দেশ দিলেন এবং একা ইবনে হুবাইবকেই এক হাজার দিরহাম দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ইবনে হুবাইব তা গ্রহণ করলেন না। বললেন,

আমিরুল মুমিনীন, এগুলোও আমার গ্রামবাসীর মাঝে বিতরণ করার নির্দেশ দিন। সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে আমি বেশি প্রয়োজনগ্রস্ত নই।

খলীফা আবদুল মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণও যুগে যুগে তাদের সন্তানদের উন্নত চরিত্রের ওপর গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তার সন্তানের শিক্ষাগুরুকে অনুরোধ করলেন,

১. তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম : ১/১৮০।

ফিরে এসো নীডে

علَّمْهُم الصِدْقَ كُما تُعَلِّمُهم القرآنَ واخْمِلْهم على الأخلاقِ الحميدةِ، وارْوِهم الشِعرَ وجالِس بِمِم أشْرَافَ الرجالِ وأهلَ العلم منهم، وجَنَّبْهُم السَفَلَة، ووَقِّرْهُم في العلانيةِ وأنَّبْهُم في السِّرِّ، واضْرِبَهم على الكذب، فان الكذبَ يدْعُو إلى الفحُوْرِ والفحورُ يدعو إلى النارِ

অর্থ : আপনি তাদের যেভাবে কুরআন শিক্ষা দেন, সেভাবেই সত্যবাদিতা ও সত্যভাষিতার দীক্ষা দিন। আরবী কাব্যভাগ্তারও মুখস্থ করান। তাদের নিয়ে সৎ, অভিজাত ও জ্ঞানী লোকদের সাথেই শুধু বসবেন। নীচ লোকদের সাথে তাদের মিশতে দেবেন না। প্রকাশ্যে তাদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখুন; কিন্তু আড়ালে তাদের কঠিনভাবে তিরস্কার করুন। মিখ্যা বললে প্রহার করতে পিছপা হবেন না। মিখ্যা পাপাচারের দিকে ঠেলে দেয়; আর পাপাচার ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

খলীফা হারুনুর রশিদের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লামা ইবনে খালদূন তার বিখ্যাত মুকাদ্দিমায় লিখেছেন, খলীফা হারুনুর রশিদ তার ছেলে আমীনকে যখন গুরুর হাতে সঁপে দিলেন তখন গুরুকে বললেন,

يا أَحْمر، إِن أَمِيرَ المؤمنين قَدْ دَفَع إليك مهجة نفسه وغَرة قلبِه فصيِّر يدَك عليه مَبْسُوطة، وطاعته لك واجبة، فكُن له بِحَيْثُ وضعَك أمير المؤمنين، أقرنه القرآن، وعرفه الأحبار، وروه الأشعار، وعلمه السُّنَن، وبصره بموَاقِع الكلام، وامْنَعْهُ من الضِحْك إلا في أوقاتِه، ولا تَمُرُّنَّ بِكَ ساعة إلا وأنت مُغْتَنِمٌ فائدةً تُفِيدُه إياهَا، ولا تُمُعِن في مُسَاتَحَتِه فيَسْتَحْلِي الفراغ ويألفُه، وقومهُ ما استطعت بالقرْب والملايَنةِ فإن أبَاهُمَا فعَلَيكَ بالشِّدَةِ والغِلْظَةِ

অর্থ : হে আহমার, আমীরুল মুমিনীন তার নয়নমণিকে, কলিজার টুকরাকে আপনার হাতে সঁপে দিলেন। এখন সে আপনার দাস। সে

ফিরে এসো নীড়ে

আপনার আদেশ পালন করতে বাধ্য। আমীরুল মুমিনীন আপনাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, আপনি তার মর্যাদা রক্ষা করুন। আপনি একে কুরআন শিক্ষা দিন। ইতিহাস শিক্ষা দিন। কাব্যভাণ্ডার মুখস্থ করান। সুন্নাহর জ্ঞান দান করুন। বুঝে শুনে কথা বলতে পারঙ্গম করে তুলুন। অসময়ে হাসা থেকে বিরত রাখুন। একটি মুহূর্তও যেন এমন না হয়, যখন সে আপনার দান থেকে বিপ্তিত হলো। আপনি এমন হোন, যেন সে আপনার কাছে থাকতে আগ্রহী হয়। এমন হবেন না যে, সে আপনার থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসে। যতদূর সম্ভব, ন্দ্রতা ও কোমলতায় তার সংশোধন করুন। কিন্তু যদি কাজ না হয়, তা হলে কঠোরতা করতে একটুও দ্বিধান্বিত হবেন না।

শিশুর শিষ্টাচার কঠিন কিছু নয়

অনেকেই ঘাবড়ে যান। মনে করেন, এত কিছুর প্রতি খেয়াল রাখা কী করে সম্ভব? অনেকে মনে করেন, শিশু কি পারবে এত কিছু ধারণ করতে? কিন্তু বাস্তবতা হলো, সচেতন মানুষের পক্ষে এগুলো কোনো ব্যাপারই নয়। তারা খুব সহজেই শিশুকে শিষ্টাচার শেখাতে পারেন। কেননা, শিশু প্রকৃতগতভাবেই সব ধরনের জ্ঞান ও গুণ অর্জনের জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজন শুধু বুঝে শুনে তার সহজাত মন ও মানসকে কাজে লাগানো। কবি বলেন

ولَيْسَ يَنْفَعُهم منْ بعْدِه أَدَبٌ قدْ ينفَعُ الأدبُ الأولادَ في صِغَرٍ إن الغصونَ إذا عَدَلْتَهَا اعتدلتْ ولا يَلِيْنُ لو ليَّنْتَه الخشَبُ

অর্থ: পরে আর শিষ্টাচার শেখানো যায় না। একটা শক্ত কাঠকে কি চাইলেই নরম করা যায়? শিষ্টাচার শেখাতে হবে ছোটবেলায়। কাঁচা কঞ্চি যদি সোজা করতে চাও, সোজা হবে; কিন্তু পাকা কঞ্চি কি হবে?

১, তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম : ১/১৪৪।

দৃষ্টির হেফাজত ও পর্দা

শিশু যখন বড় হবে, বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হবে, জীবন ও জগত সম্পর্কে বুঝবে, দীন ও ধর্ম সম্পর্কে জানবে, হালাল-হারাম উপলব্ধি করবে, ইসলামই যে তার পথ ও মত সেটা অনুধাবন করবে, তখন আমাদের করণীয় হবে, দৃষ্টির হেফাজত করার বিষয়ে তাকে সচেতন করা। এতেই তার কল্যাণ নিহিত। মাহরাম কারা, গায়রে মাহরাম কারা; কাদের দিকে তাকাতে পারবে, কাদের দিকে তাকাতে পারবে না—ইত্যাদি বিষয়ে তাকে অবহিত করা।

মনে রাখতে হবে, এ বিষয়ে শিথিলতা করলে খুবই অন্যায় হবে। ফেতনার সূচনা কিন্তু এখান থেকেই। বিশেষ করে বর্তমান যুগে। তাই তাকে প্রজ্ঞার সাথে বোঝাতে হবে যে, বিপরীত লিঙ্গের সাথে কোনো রকম মেলামেশা তার জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে সে যেন খুব সতর্ক থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাঁর প্রতিপালক বলেছেন:

اَلنَّطْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِيْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِيْ قَلْبِهِ رواه الطبراني والحاكم

অর্থ: দৃষ্টি হলো ইবলিসের তীক্ষ্ণ তির। যে আমার ভয়ে এ থেকে বেঁচে থাকবে, আমি তাকে অন্যরকম ঈমান দান করব। এর কল্যাণে সে অন্তরে স্বাদ অনুভব করবে।

একইভাবে আমরা আমাদের কন্যাদের পর্দা ও হিজাব অবলম্বনের নির্দেশ দেব। ইবাদত-বন্দেগির হুকুম-আহকামের সাথে সাথে পর্দা, পোশাক ও সাজসজ্জার বিধিনিষেধ অবহিত করব, পরপুরুষের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে, তাদের সাথে চলাফেরা করতে হলে ইসলামের বিধান কী, তাকে কী কী জানতে হবে, কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—সবই শিথিয়ে দেব।

১. তাবরানী, হাকেম।

মা বাবাই শিশুর সবচে অন্তরঙ্গ বন্ধু

তবে মনে রাখতে হবে, মা বাবা সন্তানের সবচে হিতাকাঞ্চী বন্ধু।
সুতরাং সবই করতে হবে পূর্ণ আন্তরিকতার আলোকে। এমনটা যেন মনে
না হয় যে, সবকিছুতেই তাদের সাথে কঠোরতা করব, মারধর করব,
বকাঝকা করব। বরং আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যে সমাজে বড়
হয়েছি, আমাদের সন্তানেরা তারচে বিকৃত ও ধিকৃত সমাজে বড় হছে।
সুতরাং বিবেচনা ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগাতে হবে। তাদের সাথে
খুবই বুদ্ধিমন্তার সাথে আচরণ করতে হবে। ধৈর্যেরও পরিচয় দিতে হবে।
সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করতে হবে।
শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে, ফল যেন হিতে বিপরীত
না হয়। সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে যেন দূরত্ব সৃষ্টি না হয়। সন্তান যেন
নিশ্চিত হয় যে, মা বাবা যা বলছে, সেটাই আমার জন্য ভালো। আল্লাহ
আমাদের স্বাইকে তওফিক দান করুন। আমীন।

নবম অধ্যায়

সন্তান লালনপালন : কিছু সফল পদ্ধতি

১. হিকমাহ ও মাওইযায়ে হাসানাহ

হিকমাহ অর্থ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। আর মাওইযায়ে হাসানাহ অর্থ উত্তম উপদেশ। অভিজ্ঞতা বলে শিশুর শিক্ষাদীক্ষা ও শিষ্টাচারের জন্য এ দুটিই হলো সবচে সফল পদ্ধতি। সুতরাং আমরা আমাদের কোমলমতি শিশুদের লালনপালনে, তাদের মন ও মননের পরিচর্যায় সুন্দর সুন্দর কথা, প্রাজ্ঞ আচরণ, ন্মৃতা, কোমলতা ইত্যাদি শৈলী প্রয়োগ করব। তাকে তার উপযোগী করে বিভিন্ন শৈলীতে উপদেশ দেব।

মহান আল্লাহ লুকমান আলাইহিস সালাম কর্তৃক আপন পুত্রকে দেওয়া উপদেশ পবিত্র কুরআনে তুলে ধরেছেন। এটা আমাদের জন্য হতে পারে উত্তম আদর্শ ও আলোকবর্তিকা। মহান আল্লাহ হ্যরত লুকমানের জবানিতে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

يُبُنَىَّ اَقِيمِ الصَّلَوةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصَابَكَ 'إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا *إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُفْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ الْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْدِ

অর্থ: পুত্র, সালাত কায়েম করো, সং কাজের আদেশ অসং কাজের নিষেধ করতে থাকো, বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। এটাই প্রকৃত প্রত্যয়। কাউকে ছোট মনে কোরো না। জমিনে দম্ভভরে হেঁটো না। আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি মধ্যম গতিতে হাটো। গলার আওয়াজ নিচু রাখো। নিকৃষ্ট আওয়াজ তো গাধার আওয়াজ। –সূরা লুকমান: ১৭-১৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بَرُّه

অর্থ : আল্লাহ এমন পিতাকে করুণা করুন, যিনি তার সন্তানকে কল্যাণকর কাজে সহায়তা করেন।

তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ رواه البخاري ومسلم .

অর্থ: আল্লাহ কোমল। তিনি সবকিছুতেই কোমলতা পছন্দ করেন।

হিকমাহ ও মাওইযায়ে হাসানাহ অবলম্বনে—

ক. আল্লাহর সাথে শিশুর দৃঢ় সম্পর্ক গড়ুন

এটি খুবই সহজ কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রসৃ। সন্তানকে মসজিদমুখী করে তুলুন। মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মসজিদ। মসজিদই ইসলামী জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মসজিদমুখী হলে শিশুর অন্তরে ইবাদতের ভালোবাসা জাগ্রত হবে। সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের আত্মিক অনুভূতি লাভ করবে। মসজিদে বয়ান শুনবে, উপদেশ গ্রহণ করবে। কুরআন শিখবে, কুরআন মুখস্থ করবে।

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

মসজিদমুখী হওয়ার আরেকটি অনিবার্য ফল হলো সামাজিক চেতনার সৃষ্টি। এতে মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়। সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে তাদের পাশে থাকার প্রেরণা পাওয়া যায়।

সর্বোপরি শিশুর মাঝে সংরক্ষিত হয় আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি, আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর রাস্লের ভালোবাসা। এজন্যই রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الخَطَايَا ويَرفَعُ به الدَرَجَاتِ ؟ قالوا :بلى يا رسول الله، قال :إسْباَغُ الوضوءِ عَلى الْمَكَارِهِ وَكُثْرَةُ الحَطَى إلى المساجدِ وانتِظَارُ الصلاة بَعْدَ الصلاةِ فَذَلِكُمُ الرِبَاطُ

অর্থ: আমি কি তোমাদের এমন কিছুর দিক-নির্দেশনা দেব যার কল্যাণে আল্লাহ তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মোচন করবেন এবং তোমাদের মর্যাদাকে বুলন্দ করবেন? সাহাবা কেরাম আরজ করলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, অনেক অপ্রিয়তা সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওয়ু করা, বেশি বেশি মসজিদে গমন করা, নামাযের পর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। মনে রাখবে, এটিই সত্যিকারের সতর্কতা, প্রকৃত প্রহরা ও প্রস্তুতি।

আল্লাহর সম্পর্ক এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে শিশুকে নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা একান্ত কর্তব্য। চাশত, তাহাজ্জুদ, তারাবীহ ইত্যাদি নামাযে শিশুকে অভ্যস্ত করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি বছর আরাফার দিন, শাওয়াল মাসের ছয় দিন রোযা রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

নিজেরা যত্নবান হলে শিশু আপনা-আপনিই এগুলোর প্রতি যত্নশীল হবে। মনে রাখবেন, হৃদয়কে স্বচ্ছ রাখতে এবং মন-মননকে পরিচ্ছন্ন করতে এই ইবাদতগুলোর বিকল্প নেই।

১. সহীহ মুসলিম।

খ. শিক্ষকের হাতে শিশুকে সঁপে দিন

একজন কামেল, মুন্তাকী শিক্ষকের হাতে শিশুকে সঁপে দিন। তিনি যেমন শিশুর মুআল্লিম হবেন, তেমনি হবেন মুরশিদ ও মুরব্বী। তাঁর সাথে শিশুর অটুট বন্ধন রচনা করুন। মুরব্বীর তত্ত্বাবধানে শিশু ধর্মের মর্ম বুঝবে। কর্মের স্বরূপ আবিষ্কার করবে। উত্তম চরিত্র-মাধুরীতে বিমোহিত হবে। ইলমের মহব্বত, আলেম-ওলামার ইহতিরাম, সৎ সাহস ও ব্যক্তিত্ববোধ ইত্যাদি ঈমানী গুণে গুণান্বিত হবে। হক কথা বলার সাহস অর্জন করবে। হদয়্র্যাহী আবেদনে, বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণে ইসলামবিদ্বেষীদের মুখোমুখি হতে পারবে। অশান্ত চিত্তকে প্রশান্ত করতে পারবে। পণ, প্রত্যয় ও সংকল্পে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। কত উত্তম সে যুবক, যে ইসলাম ও আহলে ইসলামের জন্য কিছু করতে উজ্জীবিত হয়।

কবি বলেন,

شَبَابٌ ذلَّلُوا سُبُل المعَالِي تعْهدهم فأنبتهم نباتا كذلك أخرج الإسلام قومي وما عرفوا سوى الإسلام دينا كريما طاب في الدنيا غصونا شبابا مخلصا حرا أمينا

অর্থ : এরা এমন কিছু যুবক যারা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে—যেন সুন্দর পরিচর্যা সুন্দর ফলে, ফুলে, পত্রপল্লবে সুশোভিত করেছে স্বপ্নের সবুজ উদ্যান। এভাবেই ইসলাম একটি সুন্দর জাতি উপহার দিয়েছে। আমার জাতি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে ধর্ম হিসেবে মানে না। এই তো শাশ্বত ধর্ম। যার কল্যাণে পৃথিবী পেয়েছে ভালো মানুষ—একনিষ্ঠ, চির স্বাধীন, চির তরুণ অনুপম যুবক।

গ. সন্তানের জন্য সৎ সঙ্গ নিশ্চিত করুন

আপনার কোমলমতি শিশুর জন্য অবশ্যই সং সঙ্গ ও সং সংশ্রব নিশ্চিত করুন। উত্তম সাহচর্য নিশ্চিত করুন—বিশেষত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যাদের চিন্তা চেতনা ইতিবাচক, যারা ধর্ম সম্পর্কে সঠিক বুঝ রাখেন, যাদের চিন্তা ভারসাম্যপূর্ণ ও জ্ঞান পরিপক্ত; যেন আপনার সন্তানের সামনে থাকে উত্তম আদর্শ। যেন সে খুঁজে পায় দৈনন্দিন জীবনের পথচলার সঠিক মানদণ্ড। যেন তার ব্যক্তি ও মানসগঠন হয় অনিন্দ্যসুন্দর। যেন সে ইসলাম ধর্মের স্বরূপ অবগত হয় সম্যকভাবে। যেন সে শামিল হতে পারে ওই সব ক্র্যাণী তরুণ-তরুণীর কাতারে, যারা কেতনবাহী প্রকৃত ইসলামের। যাদের কল্যাণে ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে ওঠে স্বাধীন, স্বনির্ভর, সার্বভৌম। যারা ইসলামকে জেনেছে গভীরভাবে। ইসলামকে বুঝেছে গভীরভাবে। যারা উপলব্ধি করেছে ইসলাম—ইবাদতের ধর্ম, আমলের ধর্ম, কুরআনের ধর্ম, জিহাদের ধর্ম।

২. তদারকি ও দেখাশোনা

সন্তান লালনপালনের সফল পদ্ধতিগুলোর মধ্যে তদারকি ও দেখাশোনা অন্যতম। সন্তানের শারীরিক পরিচর্যা করুন। সঠিক শিষ্টাচার শিক্ষা দিন। চলায়-বলায়, শোয়া-বসায়, নাওয়া-খাওয়ায়, আচরণে-উচ্চারণে, প্রাত্যহিক কাজে-কর্মে সর্বাবস্থায় তাকে সবচে সুন্দর ও মহৎ দিকটিতেই দীক্ষিত করুন।

সন্তানের শারীরিক বর্ধনশীলতাকে গুরুত্ব দিন। তাকে গঠনগতভাবে শক্তসমর্থ করে তোলায় ব্রতী হোন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَآعِدُوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنُ قُوَّةٍ

অর্থ : তোমরা সাধ্যমতো শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাক। −সূরা আনফাল : ৬০

ফিরে এসো নীড়ে

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ،

অর্থ : শোনো, শক্তি হলো তিরন্দাজি, শক্তি হলো তিরন্দাজি, শক্তি হলো তিরন্দাজি।

বিষয়টিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে গভীর ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা প্রয়োজনে আমাদের ছেলেদের শরীরচর্চাকেন্দ্রেও ভর্তি করাতে পারি। খেলাধুলায়ও উৎসাহিত করতে পারি। পাড়ার ছেলেদের সাথে, আওকাফ ও মসজিদ-মাদরাসার ছেলেদের সাথে শরীরচর্চা হয় এমন খেলায়ও অবতীর্ণ করতে পারি— যেন আমাদের সন্তানেরা শক্ত-সমর্থ হয়, উদ্যমী-উৎসাহী হয়, কর্মঠ ও প্রাণবন্ত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ٱلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَعِيْفِ.

অর্থ : শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক শ্রেয় ও প্রিয়।

সন্তানের শারীরিক পরিচর্যার পাশাপাশি তার আচার-ব্যবহার ও কাজ-কর্মের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নেরও আবশ্যকতা আছে। এক্ষেত্রে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনায় আনতে পারি

ক, পরোক্ষ উপদেশ

সন্তানের শিষ্টাচারে সরাসরি তাকে ইঙ্গিত না করে পারতপক্ষে পরোক্ষভাবে উপদেশ প্রদান করা যথেষ্ট কার্যকরী। এর বড় সুফল এই যে, এতে সন্তানের ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগে না, সে অন্যের সামনে ছোট হয় না; আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বজায় থাকে; হীনম্মন্যতা জন্মায় না; অথচ সে নিজের সংশোধনের সুযোগ পায় এবং নিজেকে আরও ভালো করার প্রয়াস পায়।

১. সহীহ মুসলিম।

খ. শিশুর সাথে গল্প করা

শিশুর সাথে বসুন। তাকে সময় দিন। তার সাথে গল্প করুন। কথা বলুন। ধীরস্থিরভাবে। ভেবেচিন্তে। মা বাবা সন্তানের সাথে বসলে, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টা করলে পারস্পরিক ভালোবাসা জন্মায়। সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। সন্তান উপলব্ধি করার সুযোগ পায় যে, তার মা-বাবা তার ভালো চান। তাকে ভালোবাসেন। এতে সে মা-বাবার প্রতি খুব সহজে আশ্বন্ত হতে পারে। এমনটি হলেই শিশুর শিশুনাদীক্ষা ও সংশোধন অনেক সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিশুর মনমানসিকতা ও ঝোঁকপ্রবণতার প্রতি খেয়াল রাখা খুব জরুরি। এ বিষয়ে সফলতা লাভেরই অনিবার্য ফলস্বরূপ শিশু মা-বাবার উপদেশ শোনার জন্য এবং মানার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে।

গ. প্রত্যক্ষ উপদেশ ও সংশোধন

শিশুরা যে ভুলগুলো করে বসে, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোর সরাসরি সংশোধন বা সে বিষয়ে সরাসরি তাকে লক্ষ্য করে উপদেশপ্রদানেরও প্রয়োজন আছে। তা না হলে, শিশু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অনেক সময় শিশু ভুল আচরণগুলোকেই সঠিক মনে করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই নীতিটি অনুসরণ করতেন। একবার একটি বালককে দেখলেন, খাবারের পাত্রে তার হাত এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ

অর্থ : বাবা, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে কাছের দিক থেকে খাবার গ্রহণ করো।

ঘ. নিন্দা করুন আচরণের—শিশুর নয়

বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করুন। শিশুর কোনো ভুল পেলে বা তার কোনো আচরণ অসুন্দর মনে হলে সেই ভূলের ও সেই আচরণের নিন্দা করুন। ভূলেও শিশুর সন্তার নিন্দা করবেন না। অর্থাৎ তাকে এ কথা বলবেন না যে, তুমি খারাপ, তোমার এই সমস্যা; তুমি এই করলে, সেই করলে; তোমার কারণে এই ক্ষতি হলো ইত্যাদি। এতে শিশু কষ্ট পায়। তুল বোঝে। সে মনে করে, আপনি তাকে অপছন্দ করছেন। আর এমনটা ঘটলেই ক্ষতি। এরকম হলে সে প্রায়ই ভালো হওয়ার পরিবর্তে হঠকারিতা করতে শুরু করে। বরং তাকে বলুন, আদরের সাথে বলুন, এটা করা ভালো নয়, এরকম করলে এই হয়, সেই হয়। দ্যাখো, এরকম করার কারণে ওই ক্ষতিটা হয়ে গেল ইত্যাদি। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের হেফাজত করুন। আমীন।

ঙ. প্রশংসা

সন্তান ভালো কিছু করলে তার প্রশংসা করা চাই। তাকে আদর করুন। উৎসাহ দিন। ধন্যবাদ জানান। এগুলো হতে পারে তাকে চুমু খেয়ে। কাঁধে, মাথায় উৎসাহমূলক ভঙ্গিতে হাত রেখে। মা-বাবার এমন উৎসাহমূলক আচরণ ও অভিব্যক্তি শিশুকে অনেক আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সেরকম কিছু করলে পুরস্কারও দেওয়া যেতে পারে। যেমন সন্তান কুরআনের একটি পারা মুখস্থ করল, বা কোনো হাদীস-সংকলন মুখস্থ করল ইত্যাদি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, যখন-তখন তাকে পুরস্কার দিতে হবে, বা কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্যই শুধু দিতে হবে। এগুলো ক্ষেত্র ও গুরুত্ব-বিবেচনায় মা বাবা নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী করবেন।

চ. সন্তানদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা

সন্তানদের মাঝে তুলনা করে কথা বলা অন্তত মা বাবার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। সন্তানদের প্রত্যেকের গুণ ও স্বকীয়তাকে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাতেও কাউকে এমন কিছু বলা যাবে না যা তাকে হীনম্মন্য করে তোলে।

অনেক সময় আমরা আমাদের কোনো সন্তানকে গালমন্দ করতে গিয়ে বলে ফেলি, তোমার অমুক ভাইকে দ্যাখো, সে এটা পারে, সেটা পারে; এটা করে, সেটা করে; তার এই গুণ, সেই গুণ ইত্যাদি; কিন্তু তুমি তো এই সেই। ...আল্লাহ মাফ করুন। এতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। শিশুর ব্যক্তিত্ববোধ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মানবপ্রবৃত্তির শিরায় শিরায় ওঁৎ পেতে থাকা শক্রতা ও বিদ্বেষও মানবমনকে আক্রান্ত করার পথ পেয়ে যায়।

৩. অভ্যাস-গঠন

সন্তান লালনপালনের সফল পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অভ্যাস-গঠনও গুরুত্বপূর্ণ। উত্তম গুণাবলি, উন্নত চরিত্রমাধুরী ও ধর্মীয়-সামাজিক শিষ্টাচারে ছোট থেকেই শিশুকে অভ্যন্ত করে তোলা অত্যন্ত সহজ। প্রয়োজন গুধু যোগ্য লালনক্ষেত্র ও সুযোগ্য লালনকারী। মনে রাখতে হবে, শিশু জন্ম নেয় একদম স্বচ্ছ, সুন্দর সাদা কাগজের মতো করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أو يُنَصِّرَانِه أو يُمَجِّسَانِه.

অর্থ : প্রতিটি শিশুই জন্মগ্রহণ করে ফিতরাতের ওপর। কিন্তু পরে মা বাবা তাকে ইহুদি বানায়, নাসারা বানায়, মাজুসি বানায়।

ইমাম গাযালী রাহ. ইহ্ইয়াউ উল্মিদ দীন গ্রন্থে লিখেছেন,

وَالصَّبِيُّ أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالدَيْهِ، وَقَلْبُهُ الطاهِرُ حَوْهَرَةٌ نَفِيْسَةٌ، فَإِنَّ عُوِّدَ الشَّرُ وأَهْمِلَ إِهْمَالَ الْبَهَائِمِ شَقِيَ وَهَلَكَ، وصِيَانَتُهُ بِأَنْ يُؤَدِّبَهُ وَيُهَذِّبَهُ وَيُعَلِّمَهُ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : শিশু মা বাবার কাছে একটি আমানত। তার পবিত্র হৃদয় অমূল্য রতন। তাকে যদি মন্দ অভ্যাসে গড়া হয় এবং পশুর মতো অযত্ন করা হয় তা হলে সে দুর্ভাগা হয়, বরবাদ হয়। এই অমূল্য রতনটি রক্ষা করতে প্রয়োজন তাকে শ্রীলতা-শিষ্টতা শিক্ষা দেওয়া, উত্তম চরিত্রমাধুরীর দীক্ষা দেওয়া।

১. সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীডে

8. আদর্শ স্থাপন

সন্তান প্রতিপালনে এটিই সবচে সফল পদ্ধতি। কেননা, প্রতিপালনকারীই মূলত শিশুর চোখে শ্রেষ্টতম ব্যক্তিত্ব। শিশু যতই প্রতিভাবান হোক, যতই সুস্থ রুচি-প্রকৃতির অধিকারী হোক, যদি অনুকরণীয়-অনুসরণীয় কোনো যথার্থ আদর্শ তার সামনে উপস্থাপিত না হয় তা হলে সে প্রকৃত মাহাত্য্যে বেড়ে উঠতে পারে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন সাহাবা কেরামের মহত্তম আদর্শ। কেননা, তিনি তাদেরকে কুরআনে কারীমের যাবতীয় বিধিনিষেধ শিক্ষা দেওয়ার আগেই সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতেন নিজের মাঝে। সাইয়িদা আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রমাধুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন.

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

অর্থ : তাঁর চরিত্রমাধুরীর মুখপাত্র স্বয়ং আল কুরআন।

৫. উপযুক্ত শাসন

সন্তানের শিষ্টাচারের জন্য যদি কোনো কৌশলই কাজে না আসে তা হলে এই পদ্ধতিটিও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শান্তি মানেই পিটুনি নয়। শান্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। একটু তিরস্কার করা, হালকা বকাঝকা করা—এগুলোও শান্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজনে অভিমান করে একটু দূরে দূরে থাকাও কার্যকরী পদ্ধতি। এতে সন্তান তার অপরাধ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ফলে নিজেকে ওধরে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে। তা ছাড়া, এতে মা বাবার প্রতি সন্তানের ভক্তি-ভালোবাসাও নির্মাপিত হয়।

অনেক সময় তার ভালোলাগার, ভালোবাসার বিষয়গুলোতে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেও শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় তার প্রতি গুরুত্বীনতা দেখিয়েও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। হয়তো কারণ সে নিজেই খুঁজে বের করে নেবে, নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবে; এ বিষয়ে আর মা-বাবাকে কিছু বলতে হবে না।

ফিরে এসো নীড়ে

কোনো কিছুতেই কাজ না হলে সর্বশেষ পদ্ধতি হিসেবে প্রহারের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। তবে তা বেশি বেশি ও ঘন ঘন না হওয়া চাই। অবশ্য এরও আগে সাধারণ ধমকাধমকিতে কাজ হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে নেওয়া উচিত।

মনে রাখতে হবে, শাস্তি তখনই দেওয়া উচিত যখন একটা অপরাধ সে বারবার করে; এবং ততটুকুই দেওয়া উচিত যতটুকু পরিমিত। সুতরাং লঘু পাপে গুরু তাপ, বিষয়টা যেন এমন না হয়। আবার এমনটা হওয়া তো মোটেই উচিত নয় য়ে, আমরা আমাদের সন্তানের ওপর এমন কিছু চাপালাম যা তার সাধ্যের বাইরে; এরপর সে যখন অপারগ হলো তখন তাকে শাস্তি দেওয়া গুরু করলাম। অভিজ্ঞতা বলে.

إِذَا أُرَدُتَ أَنْ تُطَاعَ فَأَمُرْ بِمَا يُسْتَطَاعُ

অর্থ : যদি আনুগত্য চাও, তা হলে যা সাধ্য তারই নির্দেশ দাও।

সন্তানকে শাসন করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—তার সংশোধন। নিছক ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটানো বা কর্তৃত্ব ধরে রাখার মানসিকতা নিয়ে সন্তানকে শাসন করা উপকারী নয়।

কবি বলেন.

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما

فليقس أحيانا على من يرحم

অর্থ : সে কঠোর হলো যেন তারা দূরে সরে যায়। অথচ যে সুবিবেচক, সে অনেক সময় স্লেহাস্পদের প্রতিও কঠোর হয়।

গবেষকগণ—অতীতে, বর্তমানে—একটি বিষয়ে একমত যে, সন্তানকে শাসন করে যে সুফল পাওয়া যায় তা সাময়িক ও ক্ষীণ। পক্ষান্তরে সন্তানকে আদর করে যে সুফল পাওয়া যায় তা স্থায়ী ও ব্যাপক। সহীহ মুসলিমে আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ও মুআয রাযি.কে ইয়েমেনে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন:

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرًا

অর্থ : তোমরা সহজতা করো, কঠিনতা কোরো না; শিক্ষা দিয়ো, দূরে সরিয়ে দিয়ো না।

আল্লামা ইবনে খালদূন রাহ.-ও তাঁর বিখ্যাত মুকাদ্দিমায় বলতে চেয়েছেন, শিশুর শিক্ষাদীক্ষা ও শিষ্টাচারে কঠোরতা করার পরিণতি অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি বলেছেন,

إنَّ مَن يُعامِل بالقَهْرِ يصبِح خَمْلا على غيرِه, فهُو عاجِزٌ عن الذؤدِ عَن نفسه وشرَفِه وأسرَتِه لِخُلُوه مِن الحَمَاسة والحَمِية, فقد كان مربًاه بالعُنْفِ والقَهرِ فهو قد تعوَّد الذُّلُّ والخُنُوع ,ولذلك صارت له هذه عادةً وخُلُقًا وفسَدَت معَانى الانسَانيَّةِ التي لَدَيْهِ

অর্থ: যে ব্যক্তি রুক্ষ ও বদমেজাজি হয়, সে অন্যের কাছে বড় ভারী হয়ে ওঠে। সে নিজ সন্তা, সম্মান এমনকি পরিবারকেও রক্ষা করতে অপারগ হয়ে পড়ে। কেননা, রুঢ়তা ও রুক্ষতায় সে প্রকৃত মহয়ু ও আত্মসম্মানটুকু হারিয়ে ফেলে। তার অধীনে যারা লালিত পালিত হয়, তারাও নিরাপদ নয়; তারাও অপদস্থতা ও অপমানে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। লাঞ্ছনা তাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। ফলে তাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যভুবোধটুকু নষ্ট হয়ে যায়।

সন্তানকে শাসনই করুন, আর আদরই করুন; তিরস্কৃত করুন, আর পুরস্কৃত করুন; উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তটি করুন। তা হলেই আপনার দূরদর্শিতা ফলপ্রসূতা পাবে। আপনি সফলতার মুখ দেখবেন। তবে মনে রাখবেন, সন্তান লালনপালনে মা বাবার অনুসূত রীতিপদ্ধতি ও কলাকৌশল এক ও অভিন্ন হওয়া চাই; একই সূত্র ধরে পরিপূরকতার

ভিত্তিতে হওয়া চাই; নয়তো সকল শ্রম পণ্ড হওয়ার আশন্ধা আছে। আল্লাহই উত্তম তওফিকদাতা।

সন্তানের শাসনের বিষয়ে খুবই তিক্ত হলেও আহনাফ বিন কায়সের বক্তব্যে একটি চরম সত্য উঠে এসেছে। যদিও তার বক্তব্যটি সর্ববিচারে সঙ্গত নয়। কিন্তু অনেক সময় সেটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। যেমনটি ঘটেছিল মুআবিয়ার সাথে।

মুআবিয়া যখন আপন সন্তানের প্রতি বিচলিত হয়ে আহনাফের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন,

تمارُ قلوبِنا وعِمَادُ ظُهُورِنا ونحنُ لهم أرضٌ ذليلةٌ, وسماءٌ ظليلةٌ, فإن طلَبوا فأعْطِهم, وإن غضِبوا فارضِهم, ليمْنَحُوك ودَّهُم ويجِبُّوك جهْدهم, ولا تكن تُقيلا فيَمِلُّوا حياتَك ويُجِبُّوا وَقَاتَك

অর্থ : এরা আমাদের ভিতরের লালিত স্বপ্ন, বাহিরের ভরসা; আমরা এদের জন্য বিনীত জমিনের মতো, উদার আকাশের মতো; সুতরাং তারা যা আবদার করে রক্ষা করুন, কুদ্ধ হলে তুষ্ট করুন; তাও হয়তো তাদের ভালোবাসা পাবেন, মূল্যায়ন পাবেন; এদের বোঝা হওয়া থেকে বেঁচে থাকুন; নয়তো এরা আপনার বেঁচে থাকাটাকেই বোঝা মনে করবে; বিপরীতে আপনার মরে যাওয়াটাকেই 'সোজা' মনে করবে।

প্রতিপালন ব্যর্থ হয় কেন?

প্রত্যেক মা বাবাই সন্তানের ভালো চান। সন্তানকে নিজের চাইতে অনেক অনেক ভালো বানাতে চান। সর্বাঙ্গীন সফল করতে চান। উত্তরোত্তর উন্নতি চান। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চান। কিন্তু তারপরও অনেক সময়, হাজারও কৌশল অবলম্বন করেও, সর্বাত্মক চেষ্টা-শ্রম দিয়েও দেখা যায়, ছেলেমেয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়; যেন সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়; কিন্তু কেন? ভেবে দেখেছেন কি? এর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তবে আমরা আমাদের জীবন-চলার পথে যেগুলো সবচে বেশি লক্ষ করি, সেগুলো নিয়ে কিছু আলোকপাত করা যাক।

ফিরে এসো নীডে

১. মাত্রাতিরিক্ত শাসন

অনেক মা-বাবা সব সময়ই সন্তানের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করেন। কথায় কথায় বকাঝকা ও মারধর করেন। কী সাধারণ বিষয়, কী গুরুতর বিষয়, কোনো কিছুরই বাছবিচার করেন না। সন্তানলালন মানেই বোঝেন শাসন, সন্তানপালন মানেই বোঝেন বারণ। আল্লাহ কিন্তু এমন পথনির্দেশ করেননি। এমন মানসিকতা আল্লাহর পথনির্দেশের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেছেন.

وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرُ هُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অর্থ : হে নবী, আপনি যদি রুক্ষ ও বদমেজাজি হতেন, তা হলে এরা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। সুতরাং আপনি তাদের ক্ষমা করতে থাকুন, তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকুন। যাবতীয় বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। আপনি যখন (পরামর্শের ভিত্তিতে) কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়ার্কুল করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাওয়ার্কুলকারীদের ভালোবাসেন। –সুরা আলে ইমরান: ৫৯

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

إِنْ أَرَادَ اللهُ تعالى بأهلِ بيتٍ خيرًا أَدْخلَ عَلَيْهِم الرِفْقَ وإِن الرِفْقَ لَوْ كَانَ خَلْقًا لَمَا رأى خَلْقًا لَمَا رأى الناسُ خَلْقًا أَحْسَنَ منه وإِن العُنْفَ لَوْ كَانَ خَلْقًا لَمَا رأى الناسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْه

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন সেই পরিবারে নম্রতা প্রবেশ করান। নম্রতাকে যদি অবয়ব দান করা

১. সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীড়ে

হতো, তা হলে মানুষ এরচেয়ে সুন্দর কিছু দেখত না। বিপরীতে ক্রুক্ষতাকে যদি অবয়ব দান করা হতো, তা হলে মানুষ এরচেয়ে অসুন্দর কিছু দেখত না।

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُم الله ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ

অর্থ : যারা দয়ার্দ্র, আল্লাহও তাদের প্রতি দয়ার্দ্র । যারা জমিনে আছে, তাদের প্রতি দয়া করো, তা হলে যিনি আসমানে আছেন, তিনিও তোমাদের দয়া করবেন । ১

প্রিয় বোন,

সন্তানদের প্রতি কোমল হোন, নম্র হোন, দয়ার্দ্র হোন। ছেলে-মেয়ে, ছোট-বড় প্রত্যেককে কাছে টেনে নিন। তাদের কার মনে কী চিন্তা-ভাবনা উকি দেয়, কী কল্পনা-জল্পনা দানা বাঁধে, কী আবেগ-অনুভূতি জায়ত হয়—গভীরভাবে লক্ষ করুন। এমন হোন, যেন আপনার সন্তান নির্ভয়ে কথা বলতে পারে; তার ভালোলাগা-মন্দলাগা, সুন্দরলাগা-অসুন্দরলাগা সব যেন প্রকাশ করতে পারে। এমন হোন, যেন আপনার সন্তান আপনার প্রতি সবচে বেশি স্বস্তি বোধ করে। আপনাকেই সবচে আপন ও আন্তরিক মনে করে। এমন যেন না হয় যে, তাকে অন্য কারও আশ্রয় নিতে হলো। এরই অনিবার্য ফল হিসেবে এমন পরিণতি দেখতে হয়, যা কখনোই সুখকর নয়। আল্লাহ হেফাজত করুন। আমীন।

২. মা-বাবার মধ্যে অতিরিক্ত ঝগড়া-বিবাদ

ছেলেমেয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার একটা বড় কারণ এই যে, অনেক মা বাবাই অতিরিক্ত দাস্পত্যকলহে জড়িয়ে পড়েন। একসময় ছেলেমেয়ের কাছ থেকে আড়াল করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য সীমা ছাড়িয়ে যায়। ছেলেমেয়ের মনমানসিকতা দ্বিধাগ্রস্ত

১. বাইহাকী।

[.] ২. আবু দাউদ, তিরমিযী।

হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বিরাজ করে। বিশেষত যখন ভাঙনের আশঙ্কা হয়, জীবনে ভয়ঙ্কর এক হতাশা ছেয়ে যায়।

অনেক সময় মা বাবার ঝগড়া বিবাদ সন্তানকে অতিষ্ঠ করে তোলে।
তাই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অধিকাংশ সময় তারা বাড়ির বাইরে
কাটানো শুরু করে। কচি মনের ছেলেমেয়ের পক্ষে এটা খুবই গুরুতর।
এর পরিণতি বড় ভয়াবহ। এ পর্যায়ে প্রায়ই ছেলেমেয়ে সঙ্গদোষের
শিকার হয়। মা বাবা থাকেন বিবাদ নিয়ে। ছেলেমেয়ে গা ভাসায় অজানা
স্রোতে। এক সময় অবশ্য মা বাবার টনক নড়ে। কিন্তু অনেক পরে।
হয়তো এমন মুহূর্তটি ততদিনে এসে যায়, যা আক্ষেপের, যা
অনুশোচনার।

মা বাবার মধ্যকার বিবদমানতা থেকে সন্তানের শিষ্টাচারে যে পরস্পর পরিপূরকতামূলক এক ও অভিন্ন রীতিপদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বনের অনিবার্যতা ছিল, তাও বিনষ্ট হয়। মা একভাবে সন্তানের লালনপালন করতে থাকেন। তো বাবা আরেকভাবে। বাবা একদিকে সন্তানকে পরিচালিত করতে চান। তো মা আরেক দিকে। এর ফলও বড় মন্দ। এভাবে মা বাবার টানাপোড়েনের বলি হয় সন্তান। আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুন। আমীন।

৩. অতিরিক্ত আদর-আহ্লাদ ও আরাম-আয়েশ

মা-বাবা অনেক সময় সন্তানকে অতিরিক্ত আদর ও আহ্লাদে শেষ করে দেন। যদিও তাদের কল্যাণকামিতা অনস্বীকার্য; কিন্তু এমন কল্যাণকামিতা কখনোই কাম্য নয়। এটা সন্তানের চরম ক্ষতি সাধন করে। মা বাবা নিঃসন্দেহে সন্তানের ভালোবাসায়ই এমনটা করেন। ভাবেন, সন্তান যা চায়, তা-ই পূরণ করব; তার কোনো আশা অপূর্ণ রাখব না। এই মানসিকতাটা অনেকের পক্ষে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ফল যা হবার তা-ই হয়। মা বাবা ভুলে যান যে, অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ, অতিরিক্ত আদর-আ্রাদ সন্তানকে দুর্বল করে ফেলে, সারশূন্য করে তোলে, ফাঁপা বানিয়ে ছাড়ে। এমন সন্তান প্রায়ই পরনির্ভরশীল হয়। ভবিষ্যতে আত্যনির্ভরশীলতার অভাব জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তোলে।

এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمَ فَانَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُواْ بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

অর্থ : তোমরা বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকো। কেননা, যারা আল্লাহর বান্দা তারা বিলাসী হয় না।

কবি বলেন,

إِنَّ الفَّرَاغِ وَالْجِدَّةِ مَفْسِدةِ للشَّبَابِ أَيُّ مَفْسِدَةٍ

অর্থ : বেকার বসে বসে বিলাসিতা করা যুবসমাজের ধ্বংস সাধন করে।

ছেলেমেয়েকে অনর্থক বসিয়ে রাখা

মনে রাখা চাই, মানুষের মধ্যে নফস নামের যে বস্তুটি আছে, তাকে সব সময় ভালো কাজে লাগিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে নফসই মানুষকে মন্দ কাজে লাগিয়ে দেয়। এই চরম ও পরম সত্যটিকে কোনো মাবাবারই ভূলে থাকা উচিত নয়। এতে যা ঘটে, তা সুফল নয়; কুফল। সন্তান যা হয়, তা নয়নতারা নয়, ননীর পুতূল; অথবা সুপুত্র নয়, আদরের বাঁদর। সুতরাং সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে তাকে ব্যস্ত রাখি। তার মেধা-প্রতিভাকে কাজে লাগাই। লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চাকেন্দ্রে, ভাষা ও সাহিত্যক্লাবে, সাংস্কৃতিক সজ্যে জড়িত রাখি। এভাবে যেমন সে কর্মশূন্যতা থেকে বাঁচবে, তেমনি লাভ করবে নানামুখী যোগ্যতা। বিভিন্ন ভাষা শিখবে। তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবে। ব্যক্তিগত ও জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধন করবে ইত্যাদি।

মেয়েকেও কর্মশূন্যতা ও বেকার সময় কাটানোর ক্ষতি থেকে বাঁচাতে হবে। তার ফাঁকা ও 'খুচরা' সময়গুলো থেকেও সর্বোচ্চ সুফল নিতে হবে। মা তার মেয়েকে অযোগ্য রাখতে পারেন না। লেখাপড়ার সাথে সাথে মেয়েকেও নানা দিক থেকে যোগ্য ও পারদর্শী করে তুলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাজবীদ শেখানো; বিভিন্ন ভাষা শেখানো; ভাষান্তর ও

১. আহ্মাদ।

লেখালেখির চর্চা করানো; কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভাব্য শিক্ষামাধ্যমকে কাজে লাগানো; সেলাই-ফোঁড়া, ফুলতোলা, অ্যামব্রয়ডারি ইত্যাদি সাধারণ হাতের কাজ শেখানো। শুধু এগুলোই নয়, রান্নাবান্না, ঘর সাজানো, গোছানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি ঘরের কাজ শেখার প্রয়োজনীয়তাও মেয়ের আছে। তা ছাড়া সমাজে মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের ব্যাপারেও মেয়েকে সম্যক অবগত করানো জরুরি। যেন সে অদূর ভবিষ্যতে অনেক কিছুর সাথে সাথে একজন ভালো গৃহিণীও হতে পারে। বিশেষত মেয়ের এ ধরনের অনেক বিষয় মায়ের ওপর নির্ভর করে। এগুলোর ব্যাপারে উদাসীনতা কোনো মায়েরই উচিত নয়।

৫. বৈষম্য

ছেলেমেয়ের আদর-যত্নে, পার্থিব-অপার্থিব ভালোবাসায় বৈষম্য করা নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধতা লঙ্খন করার ফলেও অনেক ছেলেমেয়ে বিপথে চলে যায়। বিপদে পা বাড়ায়। এজন্য মা বাবার উচিত প্রত্যেকটি সন্তানকে সমান নজরে দেখা। অন্যদের তুলনায় কারও প্রতি যেন বেশি নজর না হয়, এতে অন্যরা তার প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে, তারা তাকে অপছন্দ করে, তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়; অথবা কারও প্রতি যেন নজরে কমতি না থাকে, এতে সে হীনমন্য হয়ে যায়, অনেক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী খুব ভালো করে মনে রাখা চাই। তিনি বলেছেন,

سَاوُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكم فِي الْعَطِيَّةِ

অর্থ : তোমরা দেওয়ার ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো। গিতিনি আরও বলেছেন,

اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

অর্থ : তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও সাম্য বজায় রাখো।^১

১ তাবরানী।

দশম অধ্যায়

বয়ঃসন্ধি ও তারুণ্যে সন্তানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ

বয়ঃসন্ধিতে সন্তানের মনমানসিকতায়, চিন্তাচেতনায় এবং আবেগঅনুভূতিতে এক ধরনের পকৃতা আসে। এ সময় মা বাবা উভয়কেই
সন্তানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তাদের মনের গভীর
আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। মনে কী কল্পনা-জল্পনা আসে তা
প্রকাশ করার যৌক্তিক সুযোগ দিতে হবে। এমন কিছু কাজকর্মের সুযোগ
করে দিতে হবে যাতে তারা নিজস্ব শক্তি ও সক্ষমতা উপলব্ধি করতে
পারে। জীবন ও জগতের নানামুখী ভাবনায় আত্মনির্ভরশীলতা বোধ
করতে পারে।

ছেলেমেয়ের বয়ঃসদ্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোর প্রতি সজাগ থাকা জরুরি। এ সময় শারীরিক, মানসিক ও চিন্তানৈতিক দিক থেকে ছেলেদের মধ্যে পৌরুষের ছাপ প্রকট হয়। ছেলে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব মত ও নিজস্ব সত্তা প্রকাশ করার প্রয়াস পায়। বিভিন্ন কাজ-সম্পাদনে আগ্রহী হয়। বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রেরণা পায়। একটি সক্ষম সত্তা ও স্বয়ংসম্পন্ন চেতনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয় তার মধ্যে।

> সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

মেয়ের মধ্যেও আসে নানামুখী পরিবর্তন। একদিকে সহজাত লাজুকতা, একটু গুটিয়ে আসা; অন্য দিকে নিজেকে নিয়ে একটু নতুন করে ভাবতে শেখা। কল্পনায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়। নিজেকে আবিষ্কার করে এক স্বয়ংসম্পন্ন সন্তায়। মনে হয়, এখন নিজের সবকিছু একাই সে সামলাতে পারে। সামাজিক বিষয়াদিরও মুখোমুখি হতে পারে একাই; পূর্ণ আস্থার সাথে, পূর্ণ অবিচলতার সাথে।

ঠিক এই যুগে, বয়ঃসন্ধির পর্যায়টিই ছেলেমেয়ের পক্ষে সবচে ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতিনিয়ত মাথায় সওয়ার হওয়া উত্তাল অস্থিরতা, মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া অজস্র প্রশ্ন তাদের সামনে রচনা করে অকূল পাথার। ... কিন্তু কার কাছে প্রকাশ করা যায়? কী ভাবে প্রকাশ করা যায়? ... বিশেষত আমরা যে সময় ও সমাজে বাস করছি, তা তাদের অস্থিরতাকে বৃদ্ধি করে শত গুণে।

বেপর্দেগির সয়লাব, খোলামেলা চলা, অবাধ মেলামেশা; বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম—বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, দূরদর্শন, দূরালাপন, ইন্টারনেট— সবই অগ্রীলতা ও পাপাচারে ইন্ধন যোগাচ্ছে। ছেলেমেয়েকে উসকে দেওয়াই যেন চরম ও পরম লক্ষ্য।

সন্তানের প্রতি একজন স্নেহশীল পিতার এবং একজন মমতাময়ী মায়ের প্রাজ্ঞ তত্ত্বাবধান ঠিক এই পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে মাই আবির্ভূত হবেন পিতা-মাতা উভয়ের ভূমিকায়। কেননা, এই সময় সন্তানের খুবই প্রয়োজন পিতামাতার আন্তরিক সাহচর্যের। তাকে তার প্রকৃত মূল্য বোঝানোর জন্য। জীবন ও জগতে তার ভূমিকা ও অবদান কী হতে পারে, সেটা উপলব্ধি করানোর জন্য। তাকে সাহস যোগানোর জন্য। মূল্যবোধ ও আত্মসম্মানে উজ্জীবিত করার জন্য। গতি হয়ে গতিশীল করার জন্য। স্থিতি হয়ে স্থিতিশীল করার জন্য। ...

ঘরের ভেতর আমরা যদি আমাদের সন্তানদের প্রতি পূর্ণ আন্তরিক না হই, তাদের কথায় কর্ণপাত না করি; জীবন চলার পথে তারা যেসব জটিলতার মুখে পড়ে, বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে যেসব সমস্যায় পতিত হয়, এসব বিষয়ে যদি তারা আমাদের পূর্ণ মনোযোগিতা ও সতর্কতা না দেখে, পূর্ণ ভূমিকা ও ভ্রুক্ষেপ উপলব্ধি না করে, তা হলে অচিরেই ঘরের বাইরে এমন কারও আশ্রয় নেবে যারা আমাদের সন্তানদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের ব্যক্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর। তাদের চরিত্রের জন্য ক্ষতিকর। তাদের ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। অবশ্যই এই মানুষগুলো আমাদের ছেলেমেয়েকে বিপপে নিয়ে যাবে। তাদের সামনে অসুন্দর-অশোভনকে সুন্দর-শোভন করে তুলবে। তাদেরকে লিপ্ত করবে অন্যায় অপকর্মে।...

এজন্যই তো সমাজে এত লুণ্ঠন, রাহাজানি; চুরি, বাটপারি; এত পাপাচার, ব্যাভিচার। এজন্যই তো এত অনিরাপন্তা, এত অস্থিরতা; এত অধঃপতন, এত অবক্ষয়।...

এই ছেলেগুলো কারা? এই মেয়েগুলো কারা? এরা তো আমাদের মতোই কোনো মায়ের কোলছাড়া! আমাদের মতোই কোনো মা-বাবার ঘরছাড়া! ...

আমাদের এই ছেলেমেয়েগুলো কিন্তু ঠিক একদিন নতুন করে সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু ততদিনে তারা অধঃপাতে চলে গেছে নিজেদের অজান্তেই। অনেক দূরে। যেখান থেকে ফেরা যায় না। অগত্যা তারা আত্মরুদ্ধ হয়ে পড়ে। চারপাশে সবকিছু অসুন্দর লাগে। প্রশন্ত পৃথিবীটাও অপ্রশন্ত লাগে। ভেঙে যায় শরীর। ভেঙে যায় মন। জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এক বুক জ্বালা আর অভিমান নিয়ে বিদায় নেয় মায়ার পৃথিবী থেকে।

কিন্তু তারই দৃষ্টিতে এজন্য দায়ী কারা? নিজের প্রতি তো আক্ষেপ হয়, যারা তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে তাদের প্রতি তো ক্ষোভ হয়; কিন্তু মনের কোণে কোখাও কি মা বাবার প্রতি অভিমান হয় না? যেই মা বাবা আর-একটু উদার হলে, আর-একটু আন্তরিক হলে, আর-একটু শাসন করলে তাকে এভাবে ভেসে যেতে হতো না? ...

কেউ বলতে পারেন, বয়ঃসন্ধিকালীন পর্যায়টি নিয়ে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন? ইসলামী যুগে তো একে আয়ুদ্ধালীন অন্যসব পর্যায়ের মতোই মৃল্যায়ন করা হয়েছে। এর রহস্য লুকিয়ে আছে জীবনপ্রকৃতিতেই। ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষের জন্য স্বস্তির সাথে, সুস্থিরভাবে জীবনযাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অনিবার্য করেছে একটি স্বয়ংসম্পন্ন মুসলিমসমাজ। যেখানে ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা বাধ্যতামূলক। যেখানে অবাধ মেলামেশা নেই। সহশিক্ষা নেই। নিত্যনতুন অগ্লীলতা নেই। বেহায়াপনা নেই। বেপর্দেগি নেই। প্রোপাগান্ডা নেই। মুসলমানদের ফাঁসানোর জন্য হাজার রকম ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা নেই। কোটি কোটি 'প্রেতাত্মা' ও 'খারাপাত্মা' দিয়ে ওঁৎ পাতানো নেই। যুবসমাজে কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে তারও কোনো 'সুযোগ-সম্ভাবনা' নেই।

উদাহরণস্বরূপ, একটি সুস্থ-সুন্দর-পবিত্র মুসলিমসমাজে কামপ্রবৃত্তির প্রতিকার-ব্যবস্থাও দান করেছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে,

يَا مَعْشَرَ الشبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ وأحصَنُ لِلْفَرْجِ ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

অর্থ : হে যুবসমাজ, তোমাদের মধ্যে যার সক্ষমতা আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা, এটা দৃষ্টিকে অবনত রাখতে সবচে ক্রিয়াশীল। লজ্জাস্থানের পক্ষে সবচে সুরক্ষার। আর যার সক্ষমতা নেই, সে যেন রোযা রাখে। এটা তার জন্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের মনে রাখা উচিত, যে যুবক ছোট্টবেলা থেকেই আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে, আল্লাহপ্রদন্ত ফিতরাতের ডাক তাকে ডাকতেই থাকবে প্রতিনিয়ত। সতর্ক করতে থাকবে যে কোনো জালে আটকা পড়া থেকে, আলেয়ার পেছনে ছোটা থেকে, মরীচিকার মোহে পড়া থেকে, খারাপ সংস্রব থেকে।

ড. আলেক্সিস করেল 'আল ইনসানু যালিকাল মাজহূল' গ্রন্থে লিখেছেন

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الانسان تفرز نوعا من المادة تتسرب بالدم إلى الدماغ وتخدره فلا يعود يقدر على التفكير السليم

অর্থ : যখন মানবমনে কামপ্রবৃত্তি নড়ে ওঠে, তখন তা এমন একটি পদার্থের রূপ পরিগ্রহ করে যা রক্তকণিকা দিয়ে মস্তিক্ষে চড়ে বসে এবং মানবচিন্তাকে মাদকাবিষ্ট করে ফেলে। ফলে ওই মুহূর্তে সে সুস্থ চিন্তায় অসমর্থ হয়ে পড়ে।

মনোবিজ্ঞানীগণসহ পূর্ববর্তী-পরবর্তী গবেষকগণ অনেকটা ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, অবাধ যৌনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মতো চরিত্রবিধ্বংসী বিষয়গুলোর খোল্লামখোল্লা চলমানতা মহামারীর চেয়েও মানুষের পক্ষে অধিক ক্ষতিকর। এটা ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও পৌরুষ সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

উপনিবেশিক গোষ্ঠী এই হাতিয়ারটার কার্যকরিতা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছে। তারা নতুন প্রজন্মের সর্বস্ব লুট করার জন্য এরচেয়ে ভালো কোনো শক্তি আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি। তাদের মতে এটাই উদ্মতে মুহাম্মাদীর ভবিষ্যতকে ধ্বংস করার মোক্ষম উপায়। তাই তো পৃথিবীব্যাপী কর্মীদের প্রতি তাদের নির্দেশনা,

كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع فأغرقوها في حب المادة والشهوات

অর্থ: মদের পেয়ালা আর 'গায়িকার বেহালা' উদ্মতে মুহাম্মাদীর ধ্বংসসাধনে যে কাজে আসবে, হাজার হাজার ট্যাংক আর লক্ষ লক্ষ কামান দিয়েও সেই কাজ হবে না। সুতরাং সবকিছু উজাড় করে দিয়ে তাদের বস্তুবাদ ও কামপ্রবৃত্তির মোহে ডুবিয়ে রাখো।

তাদের আরও নির্দেশনা,

يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا على الشباب وسنبقى نعرض العلاقات اللاأخلاقية في ضوء الشمس، لكى

لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسيه

অর্থ : আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন চরিত্রের পবিত্রতা বলতে কোথাও কিছু না থাকে। এতে আমরা যদি সফল হতে পারি, তা হলে যুবকদের বশ করা কোনো ব্যাপার হবে না। আমরা অবৈধ সম্পর্ক ও অবাধ মেলামেশার রকমারি চিত্র সূর্যের আলোয় তুলে ধরব। যেন চরিত্র বলতে যে কিছু আছে, তরুণ-তরুণীদের মাথা থেকে সেটা চিরতরে মুছে যায়। তারা যেন লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে। তাদের লক্ষ্য বলতে যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা যেন শুধুই শরীর ও মনের চাহিদা পূরণে হয়; অন্য কিছুতে নয়।

মহান আল্লাহ যে মহান দায়িত্ব দিয়ে মানবজাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, বয়ঃসদ্ধিকালে সেদিকেই আমরা আমাদের সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তাদেরকে বোঝাব, তারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। তাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি সমাজে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে যাওয়া। এই একটি মিশনকে সফল করতে তারা বদ্ধপরিকর। সারা পৃথিবীর সকল মুসলমানের প্রতি তাদের অনেক দায় ও দায়ত্ব আছে। সেই লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন অগাধ জ্ঞান ও অশেষ সাধনার।

তাদের হ্বদয়ের পূণ্যভূমিতে ইলমের মহব্বতের এবং জ্ঞানসাধনার ভালোবাসার বীজ বপন করা পিতামাতা হিসেবে আমাদের বিরাট দায়িত্ব। এই ইলম হাসিল ও জ্ঞানসাধনা যে একমাত্র আল্লাহর সম্ভৃষ্টির জন্য হওয়া উচিত, সেটি তাদেরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করানো আমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা, ইলমের সাথে সাথে আমলও জরুরি। মহান আল্লাহ কোরআনে কারীমে যত জায়গায় ঈমানের আলোচনা করছেন প্রায় সর্বত্রই ইলম ও আমলকে একে অপরের অনুবর্তী ও অবিচ্ছেদ্য বলে তুলে

১, তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম : ২/৮১০।

ধরেছেন, উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা আসরের মধ্যে আমরা পাই,

وَالْعَصْرِ ﴿ إِلَى الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿ ٢﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وُتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٪ ﴿ ٢﴾

অর্থ : শপথ সময়ের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত; তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ করেছে, একে অপরকে হকের তাগাদা দিয়েছে এবং ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে। –সূরা আসর

ইলম ও আমল একে অপরের অনুবর্তী। ইলম তো তা-ই যা জাতিকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে উন্নীত করে। তা হলে যেই ইলম আপনার আমার সন্তানকে আল্লাহর কিতাব ও রাস্লের আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হয়, তা আর যা-ই হোক, ইলম হতে পারে না।

বিশেষত আজকালকার শিক্ষাঙ্গনগুলোই মুসলিম তরুণদের প্রতারিত করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সবচে বেশি। এগুলো হাজারো রকমের ফাঁদ-প্রতারণায় ভরা। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি খুবই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেব। কোনো মা-বাবাই চান না যে, তার সন্তানটি শয়তান ও শয়তানের দোসরদের ফাঁদে আটকা পড়া শিকারে পরিণত হোক। আমরা খুবই সজাগ থাকব, যেন আমাদের সন্তান কিছুতেই কোনো সঙ্গদোষের শিকার না হয়। তার বন্ধুবান্ধব যারা হবে তারা যেন সৎ ও ধার্মিক হয়; ভালো হয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

الْاَ خِلَاءُ يُوْمَئِنٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : রোজ হাশরে দুনিয়ার জীবনের বন্ধুবান্ধব একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। শুধু যারা মুত্তাকী ছিল তারা এই ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে। –সুরা যুখক্রফ : ৬৭

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ٱلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

অর্থ : মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের ওপরই উঠবে; সুতরাং দ্যাখো, তোমরা কাকে বন্ধরূপে গ্রহণ করছ।

কবি বলেন,

تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل

অর্থ : যদি পার, কোনো স্বাধীন মানুষের সঙ্গ ধরো; মনে রেখো, প্রকৃত স্বাধীন মানুষ পৃথিবীতে খুব একটা নেই।

আমাদের তরুণ সমাজকে ঔপনিবেশিকদের অপতৎপরতার ব্যাপারেও সজাগ করতে হবে। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে সবকিছু থেকে সতর্ক রাখতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে যারা মিশনারি তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে সবচে আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলেন খ্রিস্টধর্মের 'প্রচারক' যুমার। তিনি ঔপনিবেশিক পদলেহীদের উদ্দেশে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা আশা করছি মুসলিম মা-বাবাকে একটু হলেও সতর্ক করবে। তিনি বলেছেন,

إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وهذا ما نريده ؛ لأن المسيحية تشريف له فهو جيل لا يهتم بعظائم الأمور ويحب الراحة والكسل

অর্থ: তোমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে এমন এক প্রজন্মকে প্রস্তুত করেছ, যারা আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক উপলব্ধি করে না এবং করতে চায়ও না। তোমাদের সাধুবাদ এজন্য যে, তোমরা মুসলিম যুবসমাজকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত করেছ; কিন্তু তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করনি। তোমাদের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা ছিল। কেননা, খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হলে তো এই অপদার্থদের সম্মান করা হয়ে যায়। এরা তো সম্মানের যোগ্য নয়। এরা তো আয়েশী, বিলাসী; এরা তো কোনো কিছুর মাহাত্যা বোঝে না। (বুঝলে তো তাদের এই দশা হতো না।)

১. তিরমিযী।

২. আল গরাতু আলাল ইসলাম : 89।

একাদশ অধ্যায়

মিডিয়া এবং আমাদের সন্তান

বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত যত ধরনের প্রচারমাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে সবই দুধারি অন্ত্রের মতো—ভালোও আছে, মন্দও আছে। অনুরূপ, দুহাতি হাতিয়ারের মতো। যদি ভালোর হাতে থাকে, তা হলে ভালো; যদি মন্দের হাতে থাকে তা হলে মন্দ। তা ছাড়া, সঠিক ব্যবহারে এগুলো সুদ্রপ্রসারী সুফল বয়ে আনে। অসদ্যবহারে ধ্বংস করে সভ্যতা, ছড়ায় অকল্যাণ। বিদায় নেয় নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ।

তথ্যের আদান-প্রদানে, তত্ত্বের প্রচার-প্রসারে, সমসাময়িক আলোচিত-সমালোচিত বিষয়ে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও চেতনাগঠনে মিডিয়া এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী উৎসমূলে পরিণত হয়েছে। এজন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা; মানবমনের গভীরে ইসলামী আহ্বান ও মুহাম্মাদী পয়গাম পৌছে দেওয়া; এবং উম্মাহর প্রতি প্রতিটি মুসলিমের দায়দায়িত্বের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদেরও সক্ষম ও সার্থক মিডিয়াশক্তির বিকল্প নেই।

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থার বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরা যায়। পৃথিবীর আনাচে কানাচে মুসলিম উম্মাহর কোথায় কী হচ্ছে, কী ঘটছে, তা আলোয় আনা যায়। নতুন প্রজন্মের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষায় এবং ব্যক্তি ও মানসগঠনে মিডিয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। এর সুপ্রভাব যেমন ব্যক্তির চিন্তানৈতিক উৎকর্ষসাধনে, সমাজের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে; তেমনই কুপ্রভাব ব্যক্তির চারিত্রিক, পাবিত্রিক মূল্যবোধকে গলা টিপে হত্যা করতে পারে

এজন্য এমন কিছু মানুষ মিডিয়ার নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যারা সত্যিকার অর্থেই জ্ঞানী-গুণী, জাতি ও ধর্মের কল্যাণকামী; যারা 'তাফাককুহ ফিদ দীন' অর্জন করেছেন, যারা নিত্যনতুন আধুনিক সমস্যার শরন্থ সমাধান উদ্ঘাটনে সক্ষম। কেননা, যদি বলা হয়, মিডিয়াই এখন—ভালো হোক, মন্দ হোক—জাতি গঠন করে, মিডিয়াই জাতির সুন্দর অসুন্দরের প্রতিনিধিত্ব করে, তা হলে বোধ করি—অত্যুক্তি হবে না।

দুঃখ হয়, অন্যরা মিডিয়াশক্তি ব্যবহার করে মুসলিম উন্মাহকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। কিন্তু মুসলিম উন্মাহ অপারগ। সে তার শাশ্বত সৌন্দর্যকে, তার অনিন্দ্যসুন্দর মৌলিকত্বকে পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করতে পারছে না। ইসলাম যে সর্বকালীন, সর্বজনীন, তার সার্থক ও সক্ষম উদাহরণ তুলে ধরতে পারছে না। অথচ কোটি কোটি সুস্থ হদয়, চেতন-অন্তর উনুখ হয়ে আছে সত্যের সান্নিধ্যলাভের আশায়। যাদের বিশ্বাসের কাঁটা ঝুঁকে আছে ইসলামেরই মতো একটি শাশ্বত সুন্দর জীবনধর্ম ও ধর্মজীবনের দিকে।

খুবই দুঃখ হয়, মুসলমানরা আজ এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, তাদেরও জীবনবোধ, মূল্যবোধ ও চিন্তাচেতনা আমদানি হয় পাশ্চাত্য থেকে। এদের গলাটা যেন ওদের ছুরিতলে বশীভূত। এদের তথ্য, তত্ত্ব, জ্ঞান, গবেষণা সবই যেন ওদেরই দান-দক্ষিণা। নিত্যনতুন প্রোপাগান্ডায় মুসলমানরা এতটাই মাদকাবিষ্ট যে, কোনটা পুঁজ আর কোনটা যি, তা নির্ণয় করারও প্রয়োজন বোধ করে না; কিংবা বলা যায়, সেই সক্ষমতাই রাখে না।

যারা এ জাতির আজন্ম শক্র, যারা এ জাতির ভালো চাইবে না কোনো দিনই, কিছুতেই; তাদেরই অন্ধ অনুকরণ এ জাতিকে কোথায় নিয়ে যাবে! এই অদূরদর্শিতা এ জাতির নতুন প্রজন্মকে কোন ধ্বংসাবর্তে ঠেলে দেবে, ফেলে দেবে! তাদের ছড়ানো বিষ ও বীজ গলাধঃকরণ করে নিঃসন্দেহে আমরাও নিঃশেষ হচ্ছি, আমাদের নিরপরাধ সন্তানদেরও নিঃশেষ করছি।

মিডিয়া-বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন,

যে জাতি আপন ঐতিহ্য ও আভিজাত্য অনুযায়ী এবং আপন বিশ্বাস ও মতবাদ অনুসারে নিজস্ব মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমের প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হবে না, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে সে জাতি ব্যর্থ জাতি। অচিরেই এ জাতি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে এবং অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সে পরনির্ভলশীল হয়ে পড়বে। অন্যদের মিডিয়া-আগ্রাসনে তার অস্তিত্ব-সংকট অবশ্যম্ভাবী।

তারা আরও মন্তব্য করেছেন,

বিশ্বায়নের এই যুগে মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যম এখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার। দশজন কুশলী মিডিয়াব্যক্তিত্ব দশ কোটি বইকেও সামাজিক প্রভাবে হার মানাতে পারেন।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, পৃথিবীব্যাপী জনমত এখন মিডিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চিন্তানৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে মতবাদ ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে চিন্তকে আশ্বন্ত করা এবং চিন্তকে উসকে দেওয়ার বিষয়ে মিডিয়াই এখন সবচে শক্তিশালী হাতিয়ার। অত্যুক্তি হবে না যদি বলি, মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে 'শিকারীকে শিকার এবং শিকারকে শিকারী' বানানো 'ওয়ান টুর ব্যাপার'। ওই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন মানুষ এর বাস্তবতা আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন সকলে নির্বাক হবে, নিস্তব্ধ হবে; কিন্তু করার থাকবে না।

মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য অচিরেই এই দুহাতি ও দুধারি মারণাস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়া, এর অকল্যাণের দারকে রুদ্ধ করে কল্যাণের পথকে সুগম করা এবং ইসলাম ও উম্মাহর অনুকূলে একে ব্যবহার করা। মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমগুলোতে এ জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে অনতিবিলম্বে পর্যাপ্ত ও প্রতুল একনিষ্ঠ মুসলিম মানবশক্তি প্রস্তুত ও প্রয়োগ

ফিরে এসো নীডে

করতে হবে। তা হলে জাতির গঠন ও বিনির্মানে, জাতির উন্নতি ও উন্নয়নসাধনে ইতিবাচক ফল পেতে সময় লাগবে না।

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সকল শক্তিকে মানব জাতির কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে। আধুনিক প্রচারমাধ্যমগুলো বিনোদন থেকে শুরু করে রাজনীতি পর্যন্ত যত বিষয়ে যত কিছু প্রচার করছে, যত ভালো-কালোর প্রসার ঘটাচ্ছে, সবগুলোকে পরিশোধিত করার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীকে শাশ্বত সুন্দরের আহ্বান জানাতে হবে। ঘুণে ধরা মানবমন্তিষ্ক ও জরাগ্রন্ত মানবসমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করাতে হবে। রোগজীবাণুভরা চিন্তাচেতনার বীজ থেকে, চরিত্রবিধ্বংসী সিনেমা-নাটকের বিষ থেকে, অশ্রীল পত্রপত্রিকার আগ্রাসন থেকে, নাপাক বইপুন্তকের আক্রমণ থেকে মুক্ত করতে হবে।

প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার যতগুলো মাধ্যম আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সবগুলোরই নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করতে হবে মুসলিম উম্মাহকে। এ ক্ষেত্রে মসজিদ, মাদরাসা ও ধর্মীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তরিক হওয়া অপরিহার্য। পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা বিরাজ করতে হবে যাবতীয় কল্যাণকর কাজে। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, সংশোধনী সময়মতো উপস্থাপন করে জাতিকে উপকৃত করতে সকলকে ব্রতী হতে হবে এখনই। তা না হলে, এখানেও প্রকট হবে অকল্যাণ। ব্যাহত হবে সঠিক ধর্ম ও সুস্থ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের ব্রত।

ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে, আভ্যন্তরীণ মতভেদগুলো ভূলে গিয়ে জাতিগত বৃহৎ স্বার্থকে সামনে রেখে সকলকে একসাথে একযোগে কাজ করতে হবে। একই বৃন্তের মৃণাল ধরে কল্যাণের শপথ নিতে হবে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলিম-হদয়কে। যাতে প্রচারমাধ্যমগুলো ধর্মীয় রাজনীতিতে এক ও অভিন্ন পথনির্দেশ প্রচার করতে পারে।

এমন যেন না হয় যে, নতুন প্রজন্ম ও সাধারণ মুসলমানগণ নেতৃত্বের অভাবে দিকহারা হলো; অথবা নানা মুনির নানা মত তাদের শতধাবিভক্ত করে ছাড়ল। এমন যেন না হয় যে, কেউ তার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করতে চাচ্ছে; আর অন্যজন আদাজল খেয়ে তার সকল শ্রম ও সাধনাকে পণ্ড করে দিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যদি এমন হয়, তা হলে কিন্তু এত কিছু করার কোনোই অর্থ থাকবে না। জাতিকে এখনো অন্যদের লেজ ধরে থাকতে হয়, তখনো হয়তো এমনই কোনো কাণ্ড করতে হবে। দুঃখভারাক্রান্ত কবির ভাষায় বলতে হয়,

> متى يبلغ البنيان يوما تمامه فلو ألف بان خلفهم هادم كفى إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم فكيف ببان خلفه ألف هادم محمد ببان خلفه ألف هادم কবে সমাপ্ত হবে, অভাগা ভবন! গড়ে দলেবলে; ভাঙে একজন? তবে ভাঙাগড়ার এ কেমন খেলা! যবে নিঃসঙ্গের বিপরীতে সহস্রের মেলা?

যাই হোক, মহান আল্লাহ মুসলিম উন্মাহকে একটি স্বয়ংসম্পন্ন বস্তুনিষ্ঠ কার্যকর ও কল্যাণমুখী মিডিয়াশক্তি দান করা পর্যন্ত মা বাবা ও ময়মুরবিবকে মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমগুলোর ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। জীবনের অমূল্য সম্পদ সময়ের প্রতি সন্তানদের খুবই যত্নশীল ও হিসেবি করে তুলতে হবে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাদের সময়ের হিসেব নিতে হবে। কেননা, কেয়ামতের দিন তারা জিজ্ঞাসিত হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ السَّنْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا

অর্থ : নিঃসন্দেহে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ—সবই, সে সম্পর্কে হবে জিজ্ঞাসিত। –সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৬

সন্তান যেন প্রচারমাধ্যমগুলোর কল্যাণকর দিকগুলো থেকে সর্বোচ্চ উপকৃত হতে পারে, এবং অকল্যাণকর দিকগুলো থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে; সেজন্য একজন আদর্শ মায়ের অনেক কিছু করার আছে। সন্তান

ফিরে এসো নীডে

তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কতটুকু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানগত উন্নতি ও উপকার লাভ করল প্রতিনিয়ত তার তদারকি করুন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে এবং মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমের সহায়তায় কতভাবে ইসলাম ও উন্মাহর খেদমত করা যায়, দীন ও ধর্মের প্রসার ঘটানো যায় এবং আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথে আহ্বান করা যায়, তাকে তা উদ্মাটন করতে উৎসাহিত করুন। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য, কিতাব ও সুন্নাহর প্রতি আহ্বানের জন্য সবগুলো মাধ্যমকে কাজে লাগাতে সাহস যোগান।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ ডাক্তারি পড়ছে। তাকে তো চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানতে হবে। নতুন নতুন আবিদ্ধার ও উদ্যাটনের বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানতে হবে। রোগনির্ণয় ও রোগপ্রতিরোধে পারদর্শী হতে হবে। চিকিৎসাসেবার জন্য মাঠেও নামতে হবে। শারীরিক বিষয়ে মানুষের মাঝে যে অজ্ঞতা ও ভুল ধারণাগুলো আছে সেগুলো দূর করতেও প্রচারণা চালাতে হবে। স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রোগীদের সাথে কথা বলতে হবে।

ভাবুন তো, আপনার এই সন্তানটি কতভাবে দাওয়াতি কাজ করতে পারে। রোগীদের সাথে আচারব্যবহারে সে ইসলামী শিষ্টাচার বজায় রাখতে পারে। সেবার মানসিকতা নিয়ে চিকিৎসা করতে পারে। রোগীদের প্রতি আন্তরিক হয়ে তাদের কষ্ট উপলব্ধি করে তাদের অন্তরে আশা জাগাতে পারে। সে মানুষের অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করতে পারে যে, আরোগ্য আল্লাহর হাতে। সে অভাবীদের প্রতি সদয় হতে পারে। তার এই চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন রোগীদের মনে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যম হতে পারে। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার ওপর বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে।

খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।
তারা বিভিন্ন দুর্যোগকবলিত ও যুদ্ধগ্রস্ত দেশগুলোতে সেবার উদ্দেশে পাড়ি
জমায়। আরব ও মুসলিম দেশগুলোতেও 'মানবতার দায়ে' চিকিৎসাসেবা
নিয়ে তারাই প্রথম আগমন করে থাকে। কিন্তু সেবা, শুশ্রুষার মধ্যে তারা

কিন্তু শরণাপন্ন রোগী ও দুর্বলদের মাথায় তাদের চিন্তাচেতনা ও মতাদর্শ ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ করে ব্যাপকভাবে।

উপনিবেশিক গোষ্ঠী দেশে দেশে মিশনারি-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের মিশনারি হাসপাতাল থাকবে। তারাবলুসে অবস্থানরত মিশনারি চিকিৎসক ড. আরাহাস বলেন যে, তিনি প্রায় বত্রিশ বছর মিশনারিতে কাজ করছেন। এ দীর্ঘ সময়ে ধর্মান্তরিতকরণে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন মাত্র দুবার। তিনি তার 'খদ্দেরের' পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে বলেছেন, তাদের আটষ্টি ভাগই মুসলমান। অর্থেক নারী। প্রথম বছর ছিল একশো পঁচান্তর জন। আর শেষ বছর ছিল দুই হাজার পাঁচশো জন। তিনি তার বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন এ কথা বলে:

يجب على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شبيء ثم هو طبيب بعد ذلك

অর্থ: মিশনারিতে কর্মরত প্রতিটি চিকিৎসকের মনে রাখতে হবে, এক মুহূর্তের জন্যও ভূলে গেলে চলবে না যে, তিনি প্রথমত একজন ধর্মপ্রচারক; এরপর তিনি একজন চিকিৎসক।

সন্তানদের বোঝাতে হবে, তারা যেসব বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছে, সেগুলোই দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারে বিশ্বের দরবারে। যুবকরা যত বেশি নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকতে পারবে, তাদের বিদ্যাপীঠ, তাদের দেশ ও তাদের জাতি তত বেশি গৌরবান্বিত হবে।

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আমাদের সন্তানদের শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে। যাতে কলেজ লাইফ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে তারা তাদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। স্রোতে গা না ভাসায়। পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিসর্জন না দেয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আনন্দ-বিনোদনে ও রীতি-

১. আল গরাতু আলাল ইসলাম : ৬২।

নীতিতে তাদের অনুকর না বনে। কেননা, এটা তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিনাশ সাধন করবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنا وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارَى

অর্থ : যে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি-নাসারাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো।

আফসোস, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনুকরণপ্রিয় তোতাপাখিতে ভরপুর। আত্মর্যাদাবোধহীন, ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন তরুণ-তরুণীতে টইটমুর। কেউ চুল লম্বা করে মেয়ে সেজে থাকছে। কেউ চুল খাটো করে ঠিকই; কিন্ত কোনো তারকার ফ্যান হিসেবে। তাদের ছবি বকে-মুখে, পেটে-পিঠে।

মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। প্রতীচি-প্রিয়তার কোমরবাঁধা প্রতিযোগিতায় তারাও মাঠে নেমেছে। কাটা পোশাক, খোলা পোশাক কোনোটাতেই অরুচি নেই। এমন এমন কৃত্রিম সজ্জায়ও দ্বিধান্বিত নয়, যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে। তরুণ-তরুণীর প্রকাশ্য মেলামেশা এমন পর্যায়ে পৌছেছে য়ে, বিশ্বাস হতে চায় না, এ কোনো মুসলিমসমাজ। এর কোনো স্বকীয়তা আছে। বিশেষত্ব আছে।

তাহলে ধার্মিক ছেলে মেয়েরা এরকম প্রতিকূল পরিবেশে তাদের শিক্ষাজীবন কীভাবে অতিবাহিত করবে? এত সব ফেতনা ও ফাঁদ তারা কীভাবে অতিক্রম করবে?

একজন মা অবশ্যই সন্তানকে এই প্রত্যয়ে উজ্জীবিত করবেন যে, সে মুমিন। তার আছে ঈমানী তাকত। যা হাজারও প্রবৃত্তিফাঁদকে উপেক্ষা করতে পারে অনায়াসে। কেননা, সে প্রতিনিয়ত আল্লাহর মুখোমুখি। সে ইয়াকীন করে যে, আল্লাহ গুপ্ত ব্যক্ত সবই প্রত্যক্ষ করছেন। তার মন ও জিহ্বা সদাসর্বদা আল্লাহর ধ্যান ও শ্বরণে মশগুল।

১. তিরমিযী।

সে গভীরভাবে উপলব্ধি করে যে, সে একজন তালিবুল ইলম (বিদ্যার্থী)। আল্লাহর কাছে তার বিরাট মর্যাদা আছে। সমাজের চোখেও তার বিশেষ সম্মান আছে। তার ঈমান আছে। তার আকীদা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারই সম্মানার্থে বলেছেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

অর্থ : সকল তারকার ওপর চন্দ্রের মর্যাদা যেমন, একজন সাধারণ আবেদের ওপর একজন আলেমের মর্যাদা তেমন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَخْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصنَعُ وإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُيْتَان فِي المَاءِ

অর্থ : তালিবুল ইলমের প্রতি খুশি হয়ে ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। আসমানসমূহে যারা আছে, জমিনে যারা আছে, প্রত্যেকেই আলেমের জন্য দুআ করতে থাকে। এমনকি, সমুদ্রের মাছও।

একজন মমতাময়ী মায়ের মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তি তার সন্তানকে ঈন্সিত ছাঁচে গড়ে তুলতে সক্ষম। সন্তানের লালনপালতে সময় স্বপ্নপূরণের জন্য আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করে, কাুকৃতি-মির্না ও অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. সন্তানকে সঠিক পথের দিশা দান করতে মহত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। যখন তাঁর নয়নমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এলেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করে বললেন,

يا أماه خذلني الناس حتى ولدي وأهلي، ولم يبق معي إلا اليسير، ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة

১. আবু দাউদ, তিরমিযী।

২. আবু দাউদ, তিরমিযী।

ফিরে এসো নীডে

অর্থ : মাতা, সাথীরা আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি, আমার স্ত্রী-সন্তানও। গুটিকয়েক মানুষই আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। প্রতিরোধক্ষমতা বলতে যা আছে, কিছুক্ষণ ধৈর্যধারণের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

মহীয়সী মাতার জবাব,

إن كنت على حق وإليه تدعو فامض له، وإن كنت تريد الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك، فقلت لما وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين، فكم خلودك في الحياة الدنيا ؟ القتل أرحم يا ولدي

অর্থ : বেটা, যদি তুমি সত্যের ওপর থাক এবং সত্যেরই আহ্বান জানাও, তা হলে এগিয়ে যাও। আর যদি দুনিয়া কামনা কর, তা হলে কত নিকৃষ্ট তুমি! নিজেকেও বরবাদ করলে, অন্যদেরও বরবাদ করলে। সঙ্গীস্বল্পতায় দুর্বলতা বোধ করা কোনো স্বাধীন মানুষের কাজ নয়। দুর্বলতায় হীনম্মন্য হওয়া কোনো ধার্মিক পুরুষের কাজ নয়। দুনিয়াতে কত দিনই থাকবে তুমি? প্রিয় পুত্র, মৃত্যুই অধিক করুণার।

হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. বললেন:

هذا والله رأيي يا أماه ولكني أخاف أن يقتلني أهل الشام وأن يمثلوا بي ويصلبوني

অর্থ : মাতা, আল্লাহর কসম, আমার ভাবনাও এমনই। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, সিরিয়াবাসী আমাকে হত্যা করে আমার মরদেহকে লাঞ্ছিত করবে।

হ্যরত আসমা রাযি. বললেন:

يا بني امض لما أنت عليه فماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها ؟!

অর্থ : পুত্র, তুমি এগিয়ে যাও। জবেহকৃত দুমার সাথে যা-ই কর। হোক, তাতে কী আসে যায়?!

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহ.-কে কে না চেনেন! সহীহ বুখারীর সংকলক। যাকে মনে করা হয় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কিতাবের পর সবচে বিশুদ্ধ গ্রন্থ। এই মহান মানুষটি কিন্তু আপনার আমার মতো নগণ্য কোনো মায়েরই তরবিয়তের ফল। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রত নিয়েছিলেন সন্তানকে একজন ভালো আলেম বানাবেন। কিন্তু স্বামীবিয়োগের সাথে সাথে দেখা দিল আরেক প্রতিবন্ধকতা। শিশু মুহাম্মাদ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললেন। ভাবুন তো, একজন অভাবী অক্ষম মায়ের পক্ষে তখন কী করার ছিল? কীভাবে তিনি সন্তানকে ঈন্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারতেন?

হাঁ, তিনি দুআর আশ্রয় নিলেন। দিনরাত আল্লাহকে ডাকতে থাকলেন। বিনীত, বিনশ্র, ক্রস্ত হ্বদয়ে নিরুপায় মায়ের প্রার্থনা চলে অহর্নিশ। গভীর রাতে যখন নিঝুমতা ছেয়ে যায়, যখন অন্ধকারের চাদর ঢেকে নেয় প্রকৃতি, তখন অসহায় মায়ের নির্মুম চোখ বেয়ে নামে অশ্রন্থ ঢল। হ্বদয়ের সমস্ত আবেগ অনুভূতি দিয়ে, আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে ক্লান্তশ্রান্ত বদনে এক রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন জনমদ্খিনী মা। আল্লাহর রহমতের সাগরে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো। মমতাময়ী মা স্বপ্লে দেখা পেলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের। তিনি তাকে সালাম দিয়ে বলছেন,

يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك له

ওহে, আল্লাহ তোমার ডাক শুনেছেন, তোমার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মমতাময়ী মায়ের ঘুম ভাঙল। তিনি ছুটে গেলেন কলিজার টুকরার কাছে। ছেলের যখন ঘুম ভাঙল তখন তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। বুঝতে চেষ্টা করছিলেন, তার স্বপ্ন সত্যি হলো কি না! কী আনন্দ, সত্যিই তো ছেলের চোখ ভালো হয়ে গিয়েছে! এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলল মমতাময়ী মায়ের সমগ্র সত্তাকে। শিশু মুহাম্মাদ বুখারী ইলম অন্বেষণে সফর করা শুরু করলেন। প্রথমে মা ও ভাইকে নিয়ে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করলেন। এরপর ছুটে বেড়াতে লাগলেন পৃথিবীর আনাচে কানাচে। যেখানেই কোনো রাবীর সন্ধান পেতেন সেখানেই ছুটে যেতেন। একজন রাবী, অথবা একটি হাদীসই যেন তাঁর গুগুধন। সেই গুগুধনের সন্ধানেই হন্য হয়ে দাপিয়ে বেড়াতেন এখান থেকে সেখানে। পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। দীর্ঘ বন্ধুর পথের কন্ত, ক্লেশ, ক্লান্তি, অবসাদ কিছুই যেন কিছু নয়। আল্লাহ তাকে কবুল করলেন। তিনি সংকলন করলেন সেই অমর হাদীসগ্রন্থ, যা সর্ব যুগে সমাদৃত কিতাবুল্লাহর পর সবচে বিশুদ্ধ কিতাব বলে। যাকে মানুষ চেনে সহীহ বুখারী নামে।

ইমাম বুখারী রাহ. তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিলেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্ব ও প্রখর স্মৃতিশক্তিতে বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ধৈর্য ও সহনীয়তা ছিল আশ্চর্যজনক।

তিনি একবার বাগদাদে আগমন করলেন। তৎকালীন মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও হাদীসবিশারদগণ সংবাদ পেয়ে বাগদাদে সমবেত হলেন। তারা মনস্থ করলেন ইমাম বুখারীকে পরীক্ষা করবেন। সেই লক্ষ্যে তারা একশোটি হাদীস নির্বাচন করলেন। প্রত্যেকটির সনদ ও মতন এলোমেলো করে সাজালেন। দশজন মিলে দশটি দশটি করে হাদীসগুলোর সনদ ও মতন ঠক আছে কি না যাচাই করুন। সুবহানাল্লাহ, ইমাম বুখারী রাহ. একটি একটি করে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি হাদীসের সনদ ও মতন ঠিক করে দিলেন! সমবেত সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম ইমাম বুখারী রাহ.- এর হাদীসের জ্ঞানের শীর্ষতা স্বীকার করে নিলেন অবাক বিস্ময়ে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. বলেন,

مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ محمدِ بْنِ إسماعيلَ

অর্থ : খুরাসানের ভূমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের মতো আর কোনো মানুষ জন্মাতে পারেনি। ইমাম ইবনে খুযাইমা রাহ বলেন,

ما رأيتُ تحت أديم السماءِ أعلمَ بحديثِ رسولِ اللهِ وأحفظَ لهُ من محمد بن اسماعيل البخاري

অর্থ : আমি আসমানের নিচে এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রাহ,-এর মতো হাদীসে পাণ্ডিত্ব লাভ করেছেন বা হাদীস-সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছেন।

সহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম রাহ, ইমাম বুখারী রাহ,-কে সম্বোধন করে বলতেন,

دعني أقبل رحليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله

অর্থ : হে শুরুদের গুরু, হে মুহাদ্দিসীনে কেরামের পথপ্রদর্শক, হে হাদীসশাস্ত্রের 'রোগব্যাধি'র মহান চিকিৎসক, দিন, আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করে ধন্য হওয়ার সুযোগ দিন।

তিনি ছিলেন মুন্তাকী, পরহেজগার। কারও সম্পর্কে কিছু বলতে অত্যথ সতর্কতার পরিচয় দিতেন। আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে খোদাভীতি ও তাকওয়ার পাথেয়কে অবলম্বন করে 'জারাহ-তাদীল' (হাদীসের সূত্রগত সমালোচনা-পর্যালোচনা) করতেন। জারাহ-তাদীলে তার বক্তব্যগুলো সামনে আনলেই যে কারও কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তিনি কতটা খোদাভীতির সাথে অন্যদের ব্যাপারে মন্তব্য করতেন। তিনি বলতেন,

أَرْجُوْ أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ وَلَا يُحَاسِبْنِي أَنِّي اغْتَبَتُّ أَحَدًا

অর্থ : আমি এমনভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চাই যেন আমি কারও সমালোচনা করেছি বলে তিনি আমাকে না ধরেন।

সিয়ার আ'লামিন নুবালা : ১২/৩৯১।

ইনিই হলেন ইমাম বুখারী রাহ.। যার নাম সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। যিনি ছিলেন একজন অতি সাধারণ কিন্তু অতি মমতাময়ী ও আল্লাহমুখী মায়ের সারা জীবনের সাধনার ফল। যেই মা তাকে তিলে তিলে বড় করেছেন কুরআন ও সুনাহর ছায়ায়।

ইমাম শাফেন্ট রাহ.। তিনি ছিলেন হাশেমী বংশীয়। ফিলিস্তিনে তাঁর জন্ম। এতিম অবস্থায় বড় হয়েছেন। সেই ছোট্টবেলা থেকে মা-ই তাঁর মা, মা-ই তাঁর বাবা। দ্রদর্শিনী মাতা একসময় আশঙ্কা করলেন, এভাবে ফিলিস্তিনে পড়ে থাকলে হয়তো একসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশসূত্রের মর্যাদা হারিয়ে যাবে। তাই তিনি শিশু শাফেন্টকে নিয়ে অনেক কন্ট করে মক্কায় চলে এলেন। তিনি তাকে লেখাপড়া শেখানোর সংকল্প করলেন। কিন্তু গুরুকে সম্মানী প্রদান করার সামর্থ তাঁর ছিল না। তিনি আল্লাহকে ডাকলেন। আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিলেন। গুরু ইমাম শাফেন্টর মেধা-প্রতিভায় মুধ্ব হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে তালীম দেওয়া আরম্ভ করলেন। ইমাম শাফেন্ট মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআনে কারীম হিক্ষ করে ফেললেন। তিনি হাদীসও মুখস্থ করতে গুরু করলেন। ইমাম শাফেন্ট রাহ. এই সময়টি সম্পর্কে বলেন.

ثم لما حرجت من الكتاب كنت أتلقط الخزف والدفوف و كرب النخيل وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث، وقال طلبت هذا الأمر عن خفة ذات يد؛ كنت أجالس الناس وأسمع العلم من أفواه العلماء في المسحد الحرام حتى حفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين

অর্থ : তারপর আমি যখন কুরআন কারীম মুখস্থ করলাম তখন মৃৎপাত্র, তবলা, খেজুরবৃক্ষের শাখা, উটের কাঁধের হাড় ইত্যাদি জড়ো করতে লাগলাম হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য। তিনি বলেন, আমি খুবই উৎসাহের সাথে হাদীস সন্ধান করতাম। আমি হারাম শরীফের মানুষদের সাথে ওঠাবসা করতাম। আলেম ওলামার মুখে হাদীস শ্রবণ করতাম। দশ বছর বয়সেই মুআন্তায় সংকলিত হাদীসগুলি আমার মুখস্থ হয়ে যায়।

একটু বড় হয়ে তিনি আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্ব অর্জনে উৎসাহী হন। এ উদ্দেশে প্রায় দশ বছর আদি আরবের বাসিন্দাদের সাথে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আরব-ইতিহাস জানেন। আরবী কাব্যভাণ্ডার আত্মস্থ করেন। অশ্বারোহণ ও অশ্বচালনা শেখেন। তিরন্দাজি আয়ত্ত্ব করেন। তিনি জ্ঞান ও প্রতিভায় ছিলেন বিদ্যুতের মতো। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একাধারে একজন নির্ভরযোগ্য আলেম হিসেবে, বিজ্ঞ ফকীহ হিসেবে, হাফেযে কুরআন ও হাফেযে হাদীস হিসেবে, বিদগ্ধ কাব্যরত্ব হিসেবে, দক্ষ অশ্বারোহী ও তিরন্দাজ হিসেবে। শুধু তাই নয়, ফিকহে শাফেঈ বর্তমান পৃথিবীতে ফিকহে ইসলামীর মৌলিক উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ, ইমাম শাফেঈর প্রশংসায় বলেছিলেন,

كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فهل ترى لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟

অর্থ : ইমাম শাফেঈ ছিলেন পৃথিবীর জন্য সূর্যের মতো, দেহের জন্য আরোগ্যের মতো; এখন তুমিই বলো, এ দুয়ের কোনো বিকল্প বা বিনিময় হতে পারে?

ফযল ইবনে দুকাইন বলেন,

ما رأينا ولا سمعنا أكمل عقلا ولا أحضر فهما، ولا أجمع علما من الشافعي

অর্থ : আমরা ইমাম শাফেঈর চেয়ে পরিপক্ব জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি ও সামগ্রিক বিদ্যা আরও কারও ছিল বলে না কাউকে দেখেছি, না কারও সম্পর্কে শুনেছি।

ইসলামী স্পেনের সুবিদিত নায়ক মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আন নাসের ছিলেন কর্ডোভার সন্তান। খুব ছোট্ট বয়সেই পিতাকে হারান। মায়ের একক তত্ত্বাবধানেই বড় হন তিনি। মায়ের কোমল ছায়া থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন দিশ্বিজয়ী বীরবেশে। পিতামহের মৃত্যুর পর

১. আল ইমামুশ শাফেঈ ফকীহুস সুন্নাহ আল আকবার।

খেলাফতপ্রাপ্ত হন। উমাইয়্যা খেলাফতের তিনিই ছিলেন সবচে দীর্ঘস্থায়ী শাসক। পঞ্চাশ বছর ছয় মাস খেলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। তখন স্পেন ছিল গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অশান্ত। এমন প্রতিকূল পরিবেশেও তিনি যোগ্য নেতৃত্ব ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামী স্পেনের শাসনব্যবস্থাকে সুস্থিত করেন। স্পেনে ফিরে আসে শান্তি। শুধু তাই নয়, স্বয়ং সেনাপতি হয়ে একের পর এক বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন। সত্তরটি দুর্ভেদ্য দুর্গ করতলগত হয় তার। ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যস্থলে ঢুকে পড়ে মুসলিমবাহিনী। বিজিত হয় ইটালির অনেক প্রান্ত।

জানেন, এই মাহাত্ম্যের রহস্য কী? কোখেকে তিনি পেয়েছিলেন পর্বতপ্রমাণ অবিচলতা? সাগরসমান উদারতা? আকাশসমান অসীমতা? কীসে তাকে এত জোশিলা করেছিল? এমন সীমাহীন উদ্দীপনায় ভরিয়ে দিয়েছিল?

তাঁর মা। মা-ই ছিলেন এর মূল রহস্য। মায়েরই একক তত্ত্বাবধান পিতৃহারা শিশুটিকে এত বুদ্ধিদীপ্ত, এত সাহসী, এত উজ্জীবিত, এত ন্যায়বান এত প্রজ্ঞাবান করেছিল।

প্রিয় বোন,

সুতরাং সন্তানের লালনপালনে যত্নশীল হোন। পূণ্যে মাহাত্ম্যে—যদি উপলব্ধি করতে পারেন—এটা কোনো অংশে কম নয়। যদি এটাকেই জীবনের ব্রত বানিয়ে নিতে পারেন, তা হলে মনে রাখবেন, একজন আদর্শ নারী হিসেবে আজকের পৃথিবীতে আপনিই সবচে পূণ্যের কাজটি করছেন। ঘাবড়াবেন না, নির্দ্ধিয় ইসলামের সুমহান শিক্ষায় সন্তানকে গড়ে তুলুন। দেখবেন, পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর কল্যাণে সেও কিছু করছে। ইসলাম ও উন্মাহর প্রতি সেও অবদান রাখছে।

মনে রাখবেন, আপনার সদিচ্ছা যদি একজন প্রকৃত বিদ্বান তৈরি করতে পারে, ক্ষণজন্মা কোনো জাতির কর্ণধার গড়ে তুলতে পারে, যার

১. আল আ'লাম লিযযারাকলি : ৩/৩২৪।

ছোঁয়া লেগে পৃথিবীর আকাশে পতপত করবে উম্মাহর বিজয়পতাকা, তা হলে কে বলেছে, আপনি অচল? ধোঁকায় পড়বেন না, বিদ্রান্ত হবেন না; আল্লাহর কসম, আপনি অচল নন, আপনিই সচল, আপনিই সফল।

প্রিয় বোন,

এমন সন্তান গড়ে তুলুন যে আজকের মিডিয়া-আগ্রাসনে ভেসে যাওয়ার নয়। যে স্রোতের বিপরীতে চলতে জানে, বলতে জানে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে, মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমকে হাতিয়ার বানিয়ে যারা মুসলিম উদ্মাহর ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে মিটিয়ে দিতে চায় আচমকা ফুঁংকারে; আপনারই প্রাক্ত তত্ত্বাবধান ও ইস্পাতকঠিন মনোবল পারে তাদের আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিতে। ...প্রিয় বোন, একটু তো জাগুন। নিজেকে একটু তো জানুন।

অনেক নারীই প্রশ্ন করেন, বিবাহের পর ছেলেমেয়ে জন্ম দিয়ে যে মা শরীআতের বিধিবিধানের পাবন্দি করা শুরু করেন তার পক্ষে নিজের জীবনের গতি এবং আপন পরিবারের আমূল পরিবর্তন করা কী করে সম্ভব? এটা সুবিদিত বিষয় যে, প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে উপদেশ দান করা, একটু একটু করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা, এ লক্ষ্যে আল্লাহর তাআলার কাছে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা, সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর তাওয়াকুল ও ভরসা করা—ইত্যাদি বিষয়গুলো অনায়াসে একজন মাকে নিজের এবং পরিবারের আমূল পরিবর্তনসাধনে সক্ষম করবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলে তিনি নিজেকে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন উত্তম আদর্শ হিসেবে।

প্রকৃত বিচক্ষণ নারী ঈমান ও ইসলামের প্রশ্নে, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে কখনোই জীবনসঙ্গীর কাছে হার মানবেন না। সর্ব উপায় ও সর্ব শৈলী প্রয়োগ করে তাকে রাজি করাবেন। কেননা, ইসলামী জীবনদর্শন সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বজনীন, নির্ভূল, নিখুঁত। ধৈর্য, স্থৈর, সহনশীলতা ও সার্বক্ষণিক সদাচার অচিরেই তাকে পৌছে দেবে লক্ষ্যপানে। সর্বোপরি, প্রিয় বোন, নিশ্ভিন্ত থাকুন যে, মহান আল্লাহ তার একনিষ্ঠ বান্দাদের ডাকে সাডা দেবেনই।

উন্মে সুলাইম রুমাইসা বিনতে মিলহানের ঘটনাটি পড়ুন। তিনি যখন আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন, তখন তার জীবনসঙ্গী আবু ইউনুস এলাকায় ছিলেন না। ফিরে এসে যখন স্ত্রীর ঈমান আনার কথা জানতে পারলেন, তখন তাকে বললেন, তুমি ধর্মান্তরিত হয়ে গেলে? রুমাইসা জবাবে বললেন, ধর্মান্তরিত হইনি; তবে সত্যকে সাদরে বরণ করেছি।

রুমাইসা দুধের শিশু আনাসকে কালিমার তালকীন করাতে লাগলেন।
এক সময় শিশু আনাসও কালিমা পড়ে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে আবু
ইউনুস চেঁচিয়ে উঠলেন—তোমার এত বড় স্পর্ধা, আমারই সামনে
আমারই ছেলেকে বরবাদ করছ? হযরত রুমাইসা আশ্বস্ত চিত্তে উত্তর
দিলেন, আমি আমার ছেলেকে বরবাদ করছি না; তাকে তালীম দিচ্ছি।

ক্রুদ্ধ আবু ইউনুস বের হয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে কোনো শক্রর মুখে পড়েন, ধরাশায়ী হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। হযরত রুমাইসা ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে বললেন, আমার আল্লাহই আমার পথ করে দেবেন। আমি আমার আনাসকে দুধ ছাড়াব না। এবং সে যতদিন না আমাকে অনুমতি দেবে, ততদিন অন্য কোনো স্বামীও গ্রহণ করব না।

একদিন হযরত আবু তালহা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তিনি তখনো ঈমান আনেননি। রুমাইসা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। আবু তালহা আবারও প্রস্তাব দিলেন। এবার রুমাইসা বললেন, আপনি যদি আমার মতো আল্লাহ ও তার রাস্লের প্রতি ঈমান আনেন তা হলেই বিষয়টি বিবেচনা করব। আবু তালহা বললেন, আমি তো আগে থেকেই আল্লাহ ও তার রাস্লের প্রতি ঈমান আনতে আগ্রহী ছিলাম।

হযরত রুমাইসা রাযি. এবং হযরত আবু তালহা রাযি.-এর বিবাহ হলো। জানেন, মোহরানা কী ছিল? হাঁ, ইসলামই ছিল এই মোবারক বিবাহের মোহরানা। এবং এটাই ছিল ইসলামী ইতিহাসের সবচে সম্মানজনক মোহরানা। প্রিয় বোন, এই মহান সাহাবিয়ার মাঝে আপনার আমার জন্য আছে উত্তম আদর্শ। জেনে রাখবেন, আপনি যদি আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাস্লের অনুসরণ করতে পারেন, তা হলে অচিরেই একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারগঠনে সক্ষম হবেন। যার গুণ ও বৈশিষ্ট্য হবে অনুসরণীয়। শোভা ও দীপ্তি হবে অনুকরণীয়।

প্রিয় বোন,

আসুন, এমনই একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারের গুণ ও আদর্শের কথাগুলো জেনে নিই সহজ সরল কথায়:

- ১. একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারের সবচে বড় নিদর্শন এই যে, তাতে কুরআন ও সুন্নাহর সার্থক বাস্তবায়ন থাকবে। তাতে ইসলামী জীবনদর্শনের স্বরূপ মূর্ত এতটাই প্রকট যে, তা চোখে দেখা যায়; হাতে ছোয়া যায়।
- ২. একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার হবে ইলম ও ফিকহের আলোর মিনার। পথহারা মানুষ তাদের দেখে পথ চলবে। চিন্তায়, চেতনায় তাদের পদায় অনুসরণ করবে।
- ৩. এই পরিবারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর সম্ভটির ওপর। নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। নিজ নিজ ভূমিকায় প্রত্যেকে সচল। জীবিকায় থাকবে না হারামের মিশ্রণ। প্রতিটি সদস্য মনে-তনে বড় হবে হালাল উপার্জনের ওপর।
- ৪. মুসলিম পরিবার হবে উত্তম চরিত্রমাধুরীর সুশোভিত ঝরনার মতো। কল্যাণ ও মাহাত্য্যের স্বচ্ছ নির্মরের মতো। বিনয়, মহানুভবতা ও পরস্পর সহায়তা এখানে সুলভ। হিতোপদেশ ও কল্যাণকামিতার দ্বার এখানে অবারিত। সাহায়্যপ্রার্থী এই স্বর্গোদ্যান থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফেরে না কখনো। যেন চারপাশের সামাজিক সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু এই পরিবার।
- ৫. এই পরিবারের মানুষগুলো ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশিষ্ট। তাদের পোশাক-আশাক, আহার-বিহার, আনন্দ-বিনোদন ও আচরণ-উচ্চারণ অনুপম। সম্পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় ভাশ্বর।

ফিরে এসো নীডে

1 20%

পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত। স্বকীয়, স্বাধীন। এই পরিবারের স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা, রীতি-নীতি, আচার-অভ্যাস অসাধারণ। শিক্ষাদীক্ষা অতুলনীয়। আভিজাত্য ও আধুনিকতা অনন্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারে সক্ষম। তবে তারা অনর্থক আড়ম্বরতা, অপচয়-অপব্যয় ও কৃত্রিম সজ্জাপ্রিয় নয়। আয়েশী নয়। বিলাসী নয়।

অনেকে ঘরের আসবাবপত্রের সৌন্দর্য ও সাজানো গোছানো জীবন অপছন্দ করেন। বলতে চান, ইসলাম দুনিয়াবিমুখতা ও অনাড়ম্বরতার নির্দেশ দেয়। সুতরাং আমাদের সাদাসিধে জীবনযাপন করতে হবে। বস্তুগত আভিজাত্যে আমরা নির্মোহ। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইসলামে কাজ্কিত দুনিয়াবিমুখতা ও আমাদের আলোচ্য উন্নত জীবনযাপনে বাস্তবিক কোনো সংঘাত নেই। কেননা, শরন্দ বিধান যদি লজ্ফিত না হয় এবং অর্থসামর্থ থাকে, তা হলে ইসলাম উন্নত জীবনযাপন ও উন্নত জীবনাপকরণে কখনোই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না।

- ৬. মুসলিম পরিবার অত্যন্ত চৌকশ হবে। জীবন ও জগতের নিত্যনত্ন পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সমাজজীবনের গতি-প্রকৃতিতে কী কী পরিবর্তন আসছে, কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে, সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত থাকবে। বিশেষত ইসলামবিদ্বেষীরা মুসলিম সমাজদর্শনের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে যেসব প্রোপাগান্তা ছড়াচ্ছে, ইসলামী সমাজের মূল ক্তম্ভ—ইসলামী পরিবারব্যবস্থা ভেঙে দিতে যত রকমের কূটকৌশল করছে, সবকিছুর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক অসনে এসবের সার্থক মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে।
- ৭. মুসলিম পরিবারের প্রতিটি সদস্য পরিবারের সম্মান ও স্বকীয়তা রক্ষায় আগ্রহী। গোপনীয়তা বজায় রাখতে সচেষ্ট। পরিবারের বিষয়ে যেখানে সেখানে যা তা বলবে না। অনেক সময়, বিশেষত মেয়েরা, অসচেতনতাবশত বা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বা গর্ব করে স্বামী-সন্তানের বিভিন্ন যোগ্যতা ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে পেট আজাড় করা পছন্দ করেন। তাদের মাথায় থাকে না কোন কথার পরিণতিটা কী হতে পারে। একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যাদের দ্বারা ইসলামের কোনো উপকার হতে পারে, মুসলিম উম্মাহর বিপ্রব ঘটতে পারে, তারা সকলে পরোক্ষ ও

প্রত্যক্ষভাবে কুচক্রের কুদৃষ্টির শিকার। বাচাল মেয়েদের অপরিণামদর্শিতায় অনেক পরিবারেই নেমে আসে অশান্তি। অযথাই অনেক দেশে অনেক মুসলিম কর্মপুরুষকে কারাভোগও করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই প্রত্যেকের উচিত, অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা। ইসলামের সৌন্দর্যও এটি। যে বেশি কথা বলে, তার পদশ্বলন বেশি হয়।

৮. মুসলিম পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে আন্তরিক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বপালনে মনোযোগী। সবাই আত্মসম্মান ও উন্নত মানসিকতার অধিকারী। মুমিন তো জানে যে, আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা। তিনিই একমাত্র রক্ষাকারী। সুতরাং কষ্টে, ক্লেশে ভেঙে পড়া মুমিনের শান নয়। মুমিন তো বীর। মুমিন তো পাহাড়ের মতো অটল অবিচল। কবির ভাষায় বলতে হয়.

أنا إن عشت لست أعدم قوتا همتي همة الملوك ونفسي وإذا ما قنعت بالقوت عمري وإذا مت لست أعدم قبرا نفس حر ترى المذلة كفرا فلماذا أهاب زيدا أو عمرا

জীবনে জীবিকার ভয়
করিনি—করে না হ্বদয়;
মোর প্রাণ, সে তো দুর্বার;
নয় অপমানে মাথা নোয়াবার।
যদি ক্ষুধায় মৃত্যু আসে কভু,
মাটির বুকে ঠাই দিয়ো, প্রভু।
চির দুর্জয় মানে না লাঞ্ছনা
করে না ভয়, সহে না বঞ্চনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

দাওয়াতের ময়দানে নারী

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ : ওই ব্যক্তির চেয়ে সুন্দরতম কথা আর কার হতে পারে? যে আহ্বান করে আল্লাহর দিকে, করে নেক আমল; আর বলে, নিশ্চয় আমি অন্তর্ভুক্ত মুসলিমদের। –সূরা ফুসসিলাত : ৩৩

নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ও মহত্তম কর্ম হলো আল্লাহর একত্বের ঝাণ্ডাকে পৃথিবীর আকাশে উড্ডীন করা এবং 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র বাণীকে পৃথিবীর বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ 'يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ' أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ : আর মুমিন নর ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধাপ্রদান করবে; সালাত কায়েম

ফিরে এসো নীড়ে

করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ ও রাস্লের আনুগত্য করবে। এদেরকে অচিরেই আল্লাহ করুণা করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। –সূরা তাওবা: ৭১

হ্যরত আবু মৃসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسُ محمدٍ بيدِهِ لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ ولَتَنْهَوْنَّ عن المنكرِ ولَتَأْخُذُنَّ عَلَى أَيْدِي الْمُسِيْءِ وَلَتَأْطُرُنَّه علَى الْحَقِّ أَطْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ الله بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْض وَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهم (رواه الطبراني والترمذي)

অর্থ : কসম ওই সন্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অতি অবশ্যই তোমাদের সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ করতে হবে। যে ভূল করবে, অতি অবশ্যই তার হাত ধরে তাকে সত্যের ওপর নিয়ে আসতে হবে। তা না হলে, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের অন্তরকে একে অপরের সাথে ামলিয়ে দেবেন; এবং তোমাদের অভিশপ্ত করবেন যেভাবে অভিশপ্ত করেছেন ইহুদিদের।

যারা দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে জড়িত, তারা অবশ্যই নবী রাস্লের কাজ করছেন। উন্মতে মুহাম্মাদী হিসেবে বিশেষভাবে আমরা এ গুরুদায়িত্বটিই প্রাপ্ত হয়েছি। আমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত। আমাদের কাজ হলো নবী রাস্লের কাজ। নবী রাস্লের কাজ ছিল উন্মতকে সঠিক পথের দিশা দান করা, মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা প্রদান করা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা।

মৌলিকভাবে নারী এবং পুরুষ উভয়ই দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে আদিষ্ট। তবে শক্তি ও সামর্থভেদে এবং স্বভাবপ্রকৃতি ও স্বভাববৈশিষ্ট্যভেদে নারী এবং পুরুষের দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্র, পরিধি ও ধরন আলাদা। নারী তার সমশ্রেণির নারীদের কাছে দাওয়াতের নজরানা পেশ করবে। নারীসমাজে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান বাস্তবায়ন করার এবং রাসলের

১. তাবরানী, তিরমিযী।

ফিরে এসো নীডে

রেখে যাওয়া জীবনাদর্শকে সমুন্নত রাখার মহান ব্রত গ্রহণ করবে। যেসব পশ্চিমা, পদলেহী নারীরা ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর, যাদের উত্তপ্ত গরম জলে মুমিনার ঈমানবৃক্ষের পত্রপল্লব শুকিয়ে মরমর, যারা রকমারি ছল করে অপকারীর ঢল আনে, ঈমান ও চরিত্র হরণ করে কৌশলে মন্ত্রবাণে, সেই সব খারাপাত্মা ডাইনিদের মুখোমুখি হওয়ার, তাদের মন্ত্রতন্ত্রকে নস্যাৎ করে মুমিন-মুমিনার ঈমান ও চরিত্র রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিম নারীর একান্ত কর্তব্য।

বিশেষ করে, বর্তমান সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে অনেক নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে মানবমনে নতুন নতুন ভাবনার উদয় হচ্ছে। নিত্যনতুন চিন্তা-চেতনা, হরেক রকম বাদ-মতবাদ—সব মিলিয়ে কেমন এক জটিল-জটলাপাকা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলিম নারীকে ঈমান ও ইয়াকীনের বলে বলীয়ান হয়ে এই সব প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হবে—মুসলিম মেয়েদের বাঁচাতে, মুসলিম মায়েদের বাঁচাতে, মুসলিম বোনদের বাঁচাতে।

যুগে যুগে যত নামে যতখানে নতুন নতুন প্রোপাগান্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার ইয়ন্তা নেই। আপাতমধুর শ্লোগানগুলো সত্যিই স্পর্শকাতর। সরলা নারীকে ফাঁদে ফেলার কী কঠিন পাঁয়তারা! কেউ নারী-স্বাধীনতার কথা বলে, কেউ বলে নারী-অধিকারের কথা! তাদের চোখে, স্ত্রীত্ব নিপীড়ন! মাতৃত্ব লাঞ্ছনা-বঞ্চনা! বোন হওয়া মানে বৈষম্য! মেয়ে হওয়া মানে বন্দিত্ব! কী স্বামী হিসেবে, কী সন্তান হিসেবে, কী বাবা হিসেবে, কী ভাই হিসেবে—সর্ববিচারে, পুরুষের পরিচয় একটাই—তারা আগ্রাসী! তারা আধিপত্যকামী!

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অবান্তর কথাগুলোর সূচনা সামাজিক কিছু অসঙ্গতিকে পুঁজি করে হয় ঠিকই; কিন্তু অনতিবিলম্বে ইনিয়ে-বিনিয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় ইসলাম ও মুসলমান। যেন নারীর ভাগ্যবিভূম্বনার জন্য দায়ী শুধু ইসলাম ও ইসলামী অনুশাসন। শুধু তাই নয়, মিখ্যা প্রোপাগাভাগুলোকে বাতাসে ভাসিয়ে নিতে, আগুনের মতো তাভ়িয়ে নিতে প্রচারমাধ্যমগুলো বিরামহীন,

বিরতিহীন। তাদের যত আন্দোলন ইসলামী অনুশাসনের বিরুদ্ধে, পর্দাব্যবস্থার বিরুদ্ধে, চারিত্রিক ও পাবিত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। যেন এগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই নারী-স্বাধীনতা, এসব থেকে বের হয়ে আসাই নারী-অধিকার।

কিন্তু মিখ্যা মিখ্যাই। মিখ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচেছ যে, এই আপাতমধুর মিখ্যা স্বাধীনতার বুলি কত বড় প্রতারণা, কত বড় ছলচাতুরি! জাগ্রত-চেতন প্রতিটি হ্বদয়েই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এ কোনো স্বাধীনতা নয়; এ স্বাধীনতার হরণ, এ নারীর পায়ে বিধে যাওয়া কোনো বিষাক্ত কাঁটা, যার অনিবার্য ফল নারীর অধিকার লজ্ঞ্বন, সম্ভ্রমহানি, সম্মানহানি, আত্যসম্মানের বিসর্জন, লাজশরমের বিসর্জন।

ভাবতেও অবাক লাগে, মুসলিম নারীর হিতাকাঞ্চীর অভাব নেই। কল্যাণকামিতার কত মাথার কত ব্যথা! উঠে পড়ে লেগেছে তাকে আবরণ ও আভরণ থেকে মুক্ত করে আনতে হবে; 'হিজাব ও পর্দার জেলখানা' থেকে বের করে আনতে হবে। অথচ মুসলিম নারীর মন মগজ যে পশ্চিমাদের পাতা ফাঁদে আটকা পড়ে রসাতলে গমন করছে; এ নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। মুসলিম নারীর প্রতি কত জনের কত রকমের কল্যাণকামিতা! অথচ তার মান-সম্মান, স্বামী-সন্তান, দেশ ও জাতি যে একের পর এক আগ্রাসনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে এসব কল্যাণকামীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। মুসলিম নারী বোঝে না, সে কি সত্যিই কোনো কল্যাণকামীর ছায়া লাভ করেছে, নাকি কোনো সুযোগসন্ধানীর খেলার পুত্লে পরিণত হয়েছে? যে তাকে ব্যবহার করে তারই দেশ ও জাতিকে বরবাদ করার জন্য ওঁৎ পেতে আছে অধীর আগ্রহে।

আজকে দেশে দেশে লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছেন যেন ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরে। কেননা, এমন লেখনী ছাড়া মূল্যায়ন পাওয়া দুদ্ধর। তাই স্রোতের বিপরীতে না গিয়ে, গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসানোই সহজ। আর কোনো মুসলিম এমন কিছু করতে পারলে তো কথাই নেই; সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। তার সম্মানে কত বড় বড় আয়োজন হবে! সে কত বড় বড় পুরস্কার পাবে! চোখের পলকে তার পদচুম্বন করবে হাজার রকমের পদবি।

সে যাই হোক, জনাব কাসিম আমীন নারীমুক্তির দাবি তুলেছেন।
তিনি নাকি এমন দিনের প্রতীক্ষায় আছেন যেদিন মুসলিম নারীও পশ্চিমা
নারীর মতো স্বাধীন হয়ে যাবে। স্বামীর অধীনতা যেদিন হবে অর্থহীন।
যেদিন সকল ধর্মীয় ও সামাজিক 'কুসংস্কার' (পর্দাপ্রথা) থেকে, পুরুষের
'আধিপত্যকামী মানসিকতা' (অভিভাবকত্ব) থেকে নারী বেরিয়ে আসবে
আপন মহিমায়।

কিন্তু মুসলিমসমাজ চোখ মেলে দেখুন, এইসব দৃষিত, বিষাক্ত চেতনা পশ্চিমা সমাজে দীর্ঘকাল বিরাজ করেছে এবং এখনো করছে; এবং আমি নিশ্চিত যে, হাজার চেষ্টা করেও তারা আর এই ধ্বংসাবর্ত থেকে উঠে আসতে পারবে না।

ভাবুন তো, পশ্চিমাসমাজে এসব চেতনার প্রভাব কি ইতিবাচক? নাকি নেতিবাচকতায় নারী-পুরুষ সবাই দিশেহারা? নারী কি আদৌ সেখানে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে? সত্যিই কি তার অধিকারের সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তা হলে অযথা আজগুবি গল্প বলে মুসলিম নারীকে বিভ্রান্ত করছেন কেন? আপন জাতির সাথে প্রতারণা করে, নিজের মাকে, মেয়েকে কোনো নিশ্চিত ধ্বংসাবর্তে ফেলে দিয়ে কী পাবেন শুনি? আমরা তো দেখি, বরং মুসলিম দেশগুলোতে, যেখানে ইসলামের আলো এখনো নিভূ নিভূ, পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় নারী অনেক অনেক গুণ বেশি নিরাপদ। তার অধিকার লক্ষ-কোটি গুণ বেশি সংরক্ষিত। আফসোস, অনেক নারীই আপাতমধুর শ্রোগানে ভড়কে যাচ্ছেন। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এমন দাবি উঁচু হচ্ছে, সমানাধিকার চাই; লিঙ্গবৈষম্য মানি না; ঘরে বসে থাকা স্বীকার করি না ইত্যাদি।

প্রিয় বোন,

এখন নিজে⁷ ঠিক করুন। কী করবেন? কোন পথে চলবেন? উম্মাহর আকাশে এ ভো অশনি সংকেত যা কোনো অত্যাসন্ন কালবোশেখির আগাম সংবাদ দিচ্ছে। এ ঝড় যে দিক দিয়ে যাবে, সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবে, সবকিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, পরিবেশ-পরিস্থিতি কতটা কষ্টদায়ক মনে হয়! চিন্তাচেতনা কতটা জরাজীর্ণ মনে হয়! আবেগ-অনুভূতি কতটা শঙ্কিত-কম্পিত মনে হয়!

প্রিয় বোন,

এ পথে চলতে একটুও নিঃসঙ্গতা বোধ করবেন না। এটাই তো মুমিনার জীবনের পথ। এটাই তো মুমিনার কর্মের ময়দান। এ উদ্দেশ্যেই তো মানুষের সৃষ্টি। যারা দীনের দাঈ হয়, সমাজের সংক্ষারক হয়, যুগে যুগে তাদের জন্ম এরকম প্রতিকূল পরিবেশেই হয়েছে। যদি সমাজের সংক্ষারের প্রয়োজন না হতো, যদি সমস্ত মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত, তা হলে এত নবী রাসূল পাঠানোর কী প্রয়োজন ছিল? মনে রাখবেন, যেখানে গোমরাহি ছেয়ে যায়, সেখানেই দাঈগণ ছড়িয়ে পড়েন। যেখানে চিন্তাচেতনায় ধ্বস নামে, মূল্যবোধের অবক্ষয় গুরু হয়, গভীর অন্ধকার নেমে আসে, সেখানেই সংক্ষারকের আবির্ভাব হয়, সংক্ষার ও সংশোধনের আলো পড়ে।

প্রিয় বোন,

ভালো করে বুঝে নিন, একজন মুসলিম নারী, যিনি দাওয়াতে ময়দানে কাজ করবেন আলোকবর্তিকার মতো; যার আলো পথহারা-পথভোলা মা-বোনদের পথের দিশা দেবে; পশ্চিমা প্রোপাগাভায় প্রতারিতা নারীদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে। মনে রাখবেন, তুমুল ঝড়ের মুখে আপনাকে হতে হবে অনির্বাণ শিখার মতো, যা আকন্মিক ঝাঁপটায় নিভে যাওয়ার নয়; জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো, যা বাতাসে নেভে না; দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

প্রিয় বোন,

গগন্বিদারী গর্জন, আকাশকাঁপানো বিদ্যুচ্চমক, হাঁ করে ধেয়ে আসা দানবীয় ঢেউ, মুষলধারে শিলাবৃষ্টি আর বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গঝড়—এমন রোমাঞ্চকর সুদীর্ঘ অগ্রযাত্রায় যদি টিকে থাকতে চান, যদি চান ইসলামের স্বর্গোদ্যানকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে, তা হলে আসুন, পর্যাপ্ত ঈমান ও ইয়াকীন হাসিল করি; আত্মিক আরাধনায় শাণিত, সুদৃঢ় চিত্তে সুস্থিত বিশ্বাসের পাথেয় সংগ্রহ করি। ইনশাআল্লাহ, সুউচ্চ মনোবল এবং সুবিদিত শক্তিশালী নিদর্শনাবলি আমাদের এগিয়ে দেবে সমুখপানে; এগিয়ে নেবে কূলে।

১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস

ভূপৃষ্ঠে পাহাড়পর্বত যেমন অটলতা ও অবিচলতার অনুপম নিদর্শন স্থাপন করেছে, তেমনই আপনাকে-আমাকে হৃদয়ের পূণ্যভূমিতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের অনন্য উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। আল্লাহই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করতে পারেন। আমরা সকলে তাঁর সৃষ্টি। আমাদের কাজ তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন—সমগ্র সন্তা, আপাদমন্তক আদ্যোপান্ত সবকিছুসহ। তা হলেই আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করবে। সফলতার মুখ দেখবে।

তাই আমরা যখন দাওয়াতের ময়দানে অবতীর্ণ হব, তখন আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা, সবকিছুতে তাঁরই ওপর তাওয়াকুল ও ভরসা করা, সকাতর অনুনয় বিনয়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। তা হলেই আমাদের মতো দুর্বল মানুষের দ্বারা বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ দ্বীনি দাওয়াতি কর্মকাণ্ড আনজাম পাবে এবং হরহামেশা আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য শামিলে হাল হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে আল্লাহর জিকির, সৃষ্টিজগতের প্রতি শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশে কৃত দৃষ্টিপাত এবং কুরআনে কারীমের সচিন্ত তেলাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান ও বিশ্বাসের মূল কেন্দ্রের পরিচর্যা করা। মনে রাখবেন, ঈমান ও বিশ্বাসের মূল কেন্দ্র অন্য কিছু নয়, আপনার আমার হৃদয়। মানবদেহের বক্ষদেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত একটি মাংসপিও। এই মাংসপিও সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الجُسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الجُسَدُ كُلُّهُ ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجُسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ শোনো, মানবদেহে একটি মাংসপিও আছে। যদি সেটা ঠিক থাকে তা হলে পুরো শরীরই ঠিক থাকে। কিন্তু যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে পুরো শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। শোনো, সেটা অন্য কিছু নয়, হ্বদয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেছেন,

وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده

نفسد

অর্থ: মানবহাদয়কে এরকম বিশেষত্বে বিশেষায়িত করার কারণ এই যে, মানবহাদয় পুরো মানবদেহের জন্য শাসকস্বরূপ। শাসক সংশোধিত হলে পুরো জাতিই সংশোধিত হয়। আর শাসক সংশোধিত না হলে পুরো জাতিই অনিয়মে পতিত হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রাহ. বলেন,

ن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا
 لأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا سرور المعرفة بالله

অর্থ : মানবহৃদয়ে এক ধরনের বিক্ষিপ্ততা বিরাজ করে; এই বিক্ষিপ্ততা দূর করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহমুখিতা। এভাবে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা বিরাজ করে; এই নিঃসঙ্গতা দূর করার একমাত্র মাধ্যম হলো আল্লাহর প্রতি অন্তরঙ্গতাবোধ। একইভাবে, এক ধরনের বিষণ্ণতা বিরাজ করে; এই বিষণ্ণতা দূর করার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহর পরিচয় (মারেফাত) লাভের আনন্দানুভূতি।

একইভাবে আমাদের কর্তব্য হলো নফস ও প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حُجِبَتِ الْجُنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

অর্থ : জান্নাতকে আড়াল করা হয়েছে অপ্রিয় ও কষ্টকর বিষয় দ্বারা। যেখানে জাহান্নামকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে প্রবৃত্তি পছন্দ করে এমন সব সম্ভোগায়োজনে।^১

ভূলে যাবেন না, এমন কিছু অপ্রীতিকর বিষয় আছে যেগুলো হ্রদয়ের শুদ্ধি ও স্বচ্ছতার পথে অন্তরায়। এগুলো জমতে জমতে এমন এক আস্তরণের সৃষ্টি করে যা হৃদয়ের পুণ্যভূমিতে আলোর প্রবেশপথকে করে অবরুদ্ধ; আর শয়তানকে সুযোগ করে দেয় ভূত-প্রেতের মতো ভয়ানক আস্তানা গাড়তে। এই অপ্রীতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে আছে:

ক. দুনিয়ার মায়া-মোহ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন

إِعْلَمُوا انَّمَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَا لَعِبُّ وَّ لَهُو ۚ وَيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرُ فِي الْاَمُوالِ وَالْأَزَ ۚ ﴿ كُمَثَلِ غَيْثٍ آغِجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُضْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ

حُطَامًا ۚ أَوَ فِي الْأَخِرَةِ عَذَاكِ شَدِيْكُ ۚ وَ مَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۖ أَوْمَا الْحَلْوةُ

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ অর্থ : জেনে রেখো, এ পার্থিব জীবন হলো খেলাধুলা, হাসি তামাশা,

নিছক চাকচিক্য, পরস্পরের দম্ভ-বড়াই, সম্পদ ও সন্তান বাড়ানোর অসার প্রতিযোগিতামাত্র। পুরো বিষয়টা যেন এক পশলা বৃষ্টি—যার বর্ষণে উৎপন্ন ফলফসল কৃষকের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তারপর একসময় তা ত্তকিয়ে যায়। তুমি দেখবে, তা হলুদ বর্ণ। এরপর তা পরিণত হয়

অর্থহীন খরকুটায়। কিন্তু পার্থিব জীবনের বিপরীতে আখেরাতে আছে (অপরাধীদের জন্য) কঠিন আজাব। আছে (ভালোদের জন্য) আল্লাহর পক্ষ হতে মার্জনা ও সম্ভুষ্টি। এ পার্থিব জীবন সামান্য ধোঁকার সামান ছাড়া আর কী! -সূরা হাদীদ: ২০

১ সহীহ বুখারী।

ফিরে এসো নীড়ে

এভাবে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. পেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم مَا يُخْرِجُ الله لكمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأرضِ فقِيْلَ مَا بركات الأرض قال : زَهْرَةُ الدُّنْيَا. (متفق عليه)

অর্থ: তোমাদের নিয়ে আমার সবচে বেশি ভয় হয় ওই বিষয়ে যা আল্লাহ তোমাদের সামনে তুলে ধরবেন। অর্থাৎ বারাকাতুল আরদ (পৃথিবীর বরকত)। বলা হলো, বারাকাতুল আরদ (পৃথিবীর বরকত) বলতে কী বোঝাচ্ছেন? তিনি বললেন, দুনিয়ার চাকচিক্য।

খ. হিংসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الخستدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النارُ الحَطَبَ

অর্থ : হিংসা নেকি গ্রাস করে যেমন আগুন কাঠ পুড়িয়ে ফেলে।

গ. ক্ৰোধ

রাগী ও বদমেজাজি হলে চারপাশের মানুষকে ধরে রাখা যায় না যেহেতু আপনি একজন দাঈ, সেহেতু আপনাকে অনেক বেশি সংযম। হতে হবে। পার্থিব জীবনের সুখ-সম্ভোগে প্রতারিতা মা-বোনদের যখন দীনের দাওয়াত দেবেন, তখন যেন ক্রোধ সংবরণ করতে সক্ষম হন। প্রকৃত বীরত্বও সেটাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ الشَدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ وَإِنَّمَا الشديدُ الذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থ : প্রকৃত বীর সে নয় যে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারে। প্রকৃত বীর সে, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১. সহীহ বৃখারী ও মুসলিম।

২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

ঘ. আত্মপ্রতারণা

মানুষের নেক আমল বরবাদ করার জন্য শয়তানের সবচে বড় হাতিয়ার হলো আত্ম-অহংকার ও আত্মপ্রতারণা। বিষয়টি, বিশেষ করে, দাঈর পক্ষে খুবই নাজুক। ধরুন, আপনি আজকে একটি দাওয়াতি কাজে সফল হলেন। এতে যেন আপনার এমন আত্মপ্রতারণা না হয় যে, এটা আপনার কৃতিত্ব। মনে রাখবেন, অন্তরে কৃতিত্বের আনন্দানুভূতি এবং সফলতা লাভের কৃতজ্ঞতাবোধ—এসবের একটি ভারাম্যপূর্ণ সীমা আছে। একজন দাঈকে এই সীমার ব্যাপারে অবশ্যই সচেতনতার পরিচয় দিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وهَوَى مُتَّبَعًا وإعْجَابَ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسُكَ

অর্থ : যখন যার যার স্বার্থের অনুগমন, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং নিজ নিজ মত নিয়ে প্রত্যেককে আত্মপ্রশান্তিতে ভূগতে দেখবে, তখন নিজেকে রক্ষা করো।^২

ঙ. অহংকার

অহংকারের অকল্যাণ বলার অপেক্ষা রাখে না। এর নেতিবাচকতা ও অসুন্দরতা সুস্পষ্ট। একজন দাঈর পক্ষে এটা আরও অনেক বেশি মারাত্মক এবং অশোভন। নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ছোট মনে করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা—এগুলোর নিকৃষ্টতা তো কল্পনাও করা যায় না। এমন প্রবণতা দাঈকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تُصَعِّرُ خَلَّ كَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ : 3:

ফিরে এসো নীড়ে

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

২, আবু দাউদ, তিরমিযী।

অর্থ: মানুষকে হেয় জ্ঞান কোরো না। জমিনে দম্ভভরে বিচরণ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। সূরা লুকমান: ১৮

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

ٱلْكَبْرِيَاءُ رِدَائِيْ والْعَظَمَةُ إزارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ فِيْهِمَا قَصَمْتُهُ وَلَا أَبَالِيْ

অর্থ : অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার পরিধেয়। সুতরাং যে এ দুটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করবে, তাকে ধ্বংস করে দেব—পরোয়া করব না।

অহংকার থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবসময় আল্লাহর বড়ত্ব ও তার সৃষ্টিজগত নিয়ে ভাবা যেতে পারে। ভাবা যেতে পারে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়েও। আমার সৃষ্টি-উপাদান আর কী? মাটি! পরিণতি আর কী? বিনাশ! তাই তো রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آَكُفَرَهُ ﴿ اللهِ مِنْ اَي شَى عِ خَلَقَهُ ﴿ اللهِ مِنْ تُطْفَةٍ ﴿ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ اللهِ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَرَهُ ﴿ اللهِ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ الْمَ

অর্থ : অভিশাপ মানুষের প্রতি! কীসে তাকে অস্বীকার করালো, আল্লাহ তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন! সে জানে না, এক বিন্দু শুক্র হতে! তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার দেহের সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর সহজ করে দিয়েছেন তার চলার পথ। অতঃপর তাকে অচিরেই মৃত্যু দান করবেন এবং সমাহিত করবেন। –সূরা আবাসা : ১৭-২১

চ. শিরকে আসগার

শিরকে আসগার বলতে রিয়া বোঝায়। অর্থাৎ সুনাম সুখ্যাতির জন্য কোনো আমল করা। আল্লাহর সম্ভুষ্টির জন্য নয় এমন লোকদেখানো আমলের পরিণতি বড় ভয়াবহ। খুবই মর্মন্ত্রদ ও দুঃখজনক। এটা বড় থেকে বড় নেক আমলকেও বদ আসরগ্রস্ত করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে, একজন সাচ্চাদিল মুসলমানের শান কেমন হওয়া উচিত তার স্বরূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তুলে ধরেছেন নিন্মোক্ত আয়াতে–

قُلْ إِنَّ صَلَا يَنْ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِيْ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ

অর্থ : বলুন, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। –সূরা আনআম : ১৬২

২. ধর্মীয় এবং সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন.

يَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيُرٌ

অর্থ : আল্লাহ, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, তাদের অনেক অনেক মর্যাদায় উন্নীত করেন। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। –সূরা মুজাদালাহ : ১১

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِي آدُعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ إِنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي كُوسُبُحْنَ اللهِ وَمَا آنَا

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ : বলুন, এই হলো আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর পথে আহবান করি পূর্ণ সচেতনতার সাথেই। আল্লাহ তাআলা মহান। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। –সূরা ইউসুফ: ১০৮

জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাসহ বুঝে গুনে যখন দাওয়াতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে, তখন গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়ন অনেক বেশি হবে। জ্ঞানের আলোয় প্রাণ ও প্রবৃত্তির সূক্ষ ও নিগৃঢ় ভেদগুলো ধরা পড়ে। হৃদয়ের গভীরে পৌছার সক্ষমতা সৃষ্টি হয়।

প্রিয় বোন,

যদি দাওয়াতের ময়দানে একজন সক্ষম ও বলিষ্ঠ দাঈয়া হিসেবে অবতীর্ণ হতে চান, যদি চান পৃথিবীর নারীজগতের প্রতি সত্যিকারের কল্যাণটুকু সাধন করতে, তবে আসুন, জ্ঞান আহরণ করুন—জ্ঞানের মূল উৎস থেকে। আকণ্ঠ পান করুন কিতাব ও সুনাহর সরোবর থেকে। তা হলেই, আল্লাহ চান তো, আবেদনে আকর্ষণে মানবপ্রকৃতিকে প্রকৃত ধর্মে দীক্ষিত করা এবং যুক্তির বলিষ্ঠতায় ইসলামবিদ্বেষীদের হতবাক ও হতবৃদ্ধি করা আপনার পক্ষে হবে সহজসাধ্য।

সেই সাথে আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো সালাফে সালিহীনের সীরাত তথা অনুসরণীয় পূর্বসূরিদের ইতিহাস জানা। যারা সর্বস্থ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য রচনা করে গেছেন একটি গৌরবময় ইতিহাস। যাদের রেখে যাওয়া সুউচ্চ কীর্তিপ্রাসাদ, অমূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সুমহান জীবনদর্শন এবং জীবন ও জগতের বিভিন্ন অঙ্গনে দৃগু পদচারণা মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে করেছে গর্বিত, সমৃদ্ধ। তাদের জীবনে আমরা পাব আমাদের জীবন পথের অমূল্য পাথেয়। পাব অফুরন্ত প্রেরণা, অসীম উদ্দীপনা।

বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে পাশ্চাত্যের জীবনযাপনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত করে তোলার সব রকম বন্দোবস্ত শেষ প্রায়। সেবার ছদ্মাবরণে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো এগিয়ে চলেছে উদ্দাম গতিতে। নাস্তিক্যবাদিতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আজগুবি বুলিগুলি আওয়াজ করা শুরু করেছে জোরেশোরে। বিশ্বায়নের নামে চলছে বাছবিচারহীনভাবে সংস্কৃতির আদানপ্রদান, আপন সভ্যতা ও স্বকীয়তা বিসর্জনের উন্মাদ প্রতিযোগিতা। এসবের মোকাবেলা কে করবে? কে করতে পারে?

ফিরে এসো নীড়ে

যে নারী ইসলামী সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি ইসলামী পরিবারের মূল প্রস্তর, সে ছাড়া আর কে আছে, জাতির দুর্দিনে যার কাছে আশা করা যায় যে, এসব প্রোপাগাভার মোকাবেলায় মাথা তুলবে? হাঁ, নারী, নারীই পারে দেশ ও জাতির জন্য ভালো কিছু করতে। যে নারী দাঈয়া। যে নারী ধর্মের জ্ঞানে সম্যক অবগত। যে নারী বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অকাট্য প্রমাণ।

অনেকে ভাবতে পারেন, তা হলে তো সব মেয়েকেই শুধু ধর্মবিদ্যায় পড়াশোনা করতে হবে। বলতে পারেন, আমরা যারা চিকিৎসা, রসায়ন, পদার্থ বা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছি বা করছি, তাদের তো কিছুই করার নেই। কেননা, যারা ধর্মের বিরুদ্ধে মিখ্যা প্রোপাগান্ডা ছডাচ্ছে, তাদের মোকাবেলা করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু, আমি মনে করি, এবং আশা করি অন্যরাও আমার সাথে একমত হবেন যে, এ ধরনের ভাবনার সংশোধনের প্রয়োজন আছে। আমাদের আকাবির ও আসলাফও ছিলেন চিকিৎসাবিদ, পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ইত্যাদি। তবে তারও আগে তারা ছিলেন ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ইত্যাদি। একটি মেয়ে যদি চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করে, তা হলে পাশাপাশি ধর্মবিদ্যা অর্জনে কীসে তাকে বাধা দেবে? আমার তো মনে হয়, যে নারী রসায়ন, পদার্থের মতো বিভিন্ন পার্থিব জ্ঞান অর্জন করেছেন, তিনি যদি ধর্মীয় জ্ঞানার্জনেও ব্রতী হন তা হলে বর্তমান যুগে দাওয়াতি কাজে তিনিই বেশি সফলতা পাবেন। লোকে তাকে বড় চোখে দেখবে, তার কথা শুনবে, মানবে। কিন্তু ধর্মের জ্ঞান ছাড়া, হালাল হারামের অবগতি ছাড়া নিজের ধর্মজীবনই তো অচল; বরং জীবনধর্মই ব্যর্থ; অর্থসামর্থে যত যশখ্যাতিই থাকুক আর জ্ঞানবিজ্ঞানে যত ব্যুৎপত্তিই থাকুক।

চিন্তা করুন, যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার আলেম হন, ফকীহ হন, দীনের দাঈ হন, মানুষ তাকে কত ভালোবাসে! তার দ্বারা মানুষ কত উপকৃত হতে পারে! কত দেশে কত মানুষ আছে, কেউ পেশায় রসায়নের অধ্যাপক; কিন্তু নেশায় সফল সাহিত্যিক! প্রিয় বোন,

জানি না, আপনি কোন পেশার, কোন নেশার। কিন্তু এটা জানি এবং আপনাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানানোর তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি যে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা আপনার কর্তব্য। বর্তমান সময়ে দীনের মুখলিস দাঈ ও মুবাল্লিগ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

প্রিয় বোন,

ভয় পাবেন না। আপনি পারবেন। আপনাকে পারতে হবে। বর্তমানে নারী বিষয়ক প্রোপাগাভা নিয়ে কথা বলা শুধু এমন নারীর কাজ নয়, যিনি ধর্মবিদ্যায় পড়াশোনা করেন বা করেছেন। বরং এটা প্রত্যেক মুমিন, মুসলিম নারীরই কর্তব্য।

আবার জ্ঞান-বিজ্ঞান বলতে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যার কথা বলছি না। বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি ও পরিমণ্ডল অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি আধুনিক অনেক কিছু জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। শরীআতসম্মত উপায়ে এগুলোকে কাজে লাগিয়েও দাওয়াতি কাজকে এগিয়ে নেওয়া যায় অনেক দূর।

যেমন ধরুন, আমরা এখন যে যুগে বাস করছি, তা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ। বিস্ময়কর সব আবিদ্ধারের যুগ। কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগব্যবস্থার অভাবনীয় সব আবিদ্ধারে চোখ বিক্ষারিত হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটতে চলেছে, তা হয়তো আমাদের কল্পনারও অতীত। ইন্টারনেট এখন বহিঃর্বিশ্বের জন্য একটি সুবৃহৎ জানালার মতো। নারী ইচ্ছা করলে এভাবে অনেক কিছু জানতে পারে, শিখতে পারে। বিশেষত এ পর্যন্ত অনেক আরবী ও ইসলামী ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে। নারী এখান থেকে নারীবিষয়ক অনেক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কম্পিউটার শিক্ষা করায়ও কোনো বাধা নেই। আপনি যদি মা-ও হন, তবু। প্রয়োজনে ছেলেমেয়ের সহায়তা নিন। আধুনিক প্রযুক্তিগুলো শিক্ষা করা কোনো বয়সাবদ্ধ বিষয় নয়।

প্রচুর পড়াশোনা করুন। নারীবিষয়ক লেখাগুলো, বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা বেশি বেশি পড়ন। সন্তান-লালনপালনের বিষয়গুলো, জীবন ও জগতের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনগুলো, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো মনোযোগের সাথে পড়ুন। সময় ও সমাজ সম্পর্কেনা জানা মুর্যতার নামান্তর।

মনে রাখবেন, বর্তমান সময় খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন রীতিমত নিত্যনতুন মোড় নিচ্ছে। যখনই কোনো বই পড়বেন, সাথে কাগজ কলম রাখবেন। মূল মূল পয়েন্টগুলো, গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো নোট করে রাখবেন। তা হলে বিষয়গুলো আপনার স্মৃতিপটে বদ্ধমূল হবে।

৩. আমলি ও আখেরাতমুখী জিন্দেগি

যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্ভট্টি কামনা করে, তাকে দুনিয়ার মায়া মোহ ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার সম্পদ, সম্মান, শ্রম—সবই মুমিনের জন্য কারাগারস্বরূপ। দুনিয়া মুমিনের পথ, বাড়ি নয়। মুমিনের বাড়ি তো আখেরাত।

সুতরাং হে দীনের দাঈয়া বোন,

রাতের প্রতিটি মুহূর্তকে সর্বোচ্চ মূল্য দিন। দয়াময়ের সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত, বিনম্র চিত্তে তাঁকে ডাকতে থাকুন; জপতে থাকুন। অচিরেই ঈমানের স্বাদ, ইবাদতের মিষ্টতা আস্বাদন করবেন। দেখবেন, তখন নেক আমল করতে ভালো লাগবে। অবসাদ ও উদাসীনতা এড়াতে সার্বক্ষণিক জিকির জারি রাখুন। দুআ, ইসতিগফার, নফল নামায ও রোযা জারি রাখুন। তা হলে শিগগিরই উপনীত হবেন পরকালীন উচ্চাভিলাষ ও আত্মিক চেতনার পর্বতশৃঙ্গে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِلْتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْقُنِتُتِ وَالْقُنِتُتِ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْقُنِتُ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْقُنِتِيْنَ وَالْفُيْنِ وَالْفُيْنِ وَالْفُيْنَ وَالْفُيْنِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّلِيْتِ وَالْمُقَلِيْنَ فُرُوجَهُمْ

وَالْحَفِظْتِ وَ الذُّكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَ الذُّكِرْتِ 'اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থ: মুসলিম, মুমিন, অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, বিনীত, দানশীল, রোযাদার, সচ্চরিত্র ও অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারী নর ও নারীর জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। –সুরা আহ্যাব: ৩৫

আমাদের পূর্বসূরীদের জীবনীও ইবাদতগোজার নারীর অনন্য দৃষ্টান্তে ভরপুর। বিখ্যাত তাবিঈ কাসিম বর্ণনা করে বলেন,

আমি সকালে বের হয়ে প্রথমে হ্যরত আয়েশা রাযি.-এর বাড়িতে যেতাম এবং তাঁকে সালাম দিতাম। একদিন সকালে গিয়ে দেখলাম, তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি (এই আয়াতটি) বারবার তেলাওয়াত করছেন, দুআ করছেন এবং কাঁদছেন,

فَهَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَ وَقُلنَا عَنَابَ السَّهُوْمِ

অর্থ : কিন্তু আল্লাহ আমাদের করুণা করেছেন এবং লু হাওয়ার আজাব থেকে রক্ষা করেছেন। –সূরা তুর : ২৭

(কাসিম বলেন) আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় বিরক্ত হয়ে আমার কাজে বাজারে চলে গেলাম। তারপর যখন ফিরে এলাম, দেখলাম তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন এবং কাঁদছেন।

মনে রাখবেন, অধিক জিকির ও অধিক ইবাদত বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য করে। হাদীসে কুদসীতে এসেছে,

إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إليهِ ذِرَاعًا، وإذا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِيْ مَشْيًا أَتِيتُهُ هَرُولَةً صحيح الجامع الصغير.

১. উলুওউল হিম্মাহ ফী সলাহিল উম্মাহ : ৭/১৬৩।

অর্থ: আমার বান্দা যখন এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, তখন আমি এক হাত পরিমাণ তার নিকটবর্তী হই। সে যখন এক হাত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হয়, তখন আমি দুই হাত পরিমাণ তার নিকটবর্তী হই। সে যদি আমার কাছে আসে হেঁটে হেঁটে, আমি তার কাছে যাই দৌড়ে দৌড়ে।

হ্যরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسجدَ فإذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فقال : ما هذا الْحَبْلُ ؟ قالوا : هُوَ لِزَيْنَبَ فإذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فقال النبي : لَا، حُلُوهُ لِيُصِلِّيُ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فإذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, দুটি খুঁটিতে লম্বা একটি রশি টানানো আছে। তিনি বললেন, এখানে এই রশি কেন? সাহাবা কেরাম বললেন, এটা যায়নাবের। তিনি ইবাদত করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন হেলান দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না না, এটা খুলে ফ্যালো। কেউ নামায পড়লে যতক্ষণ উদ্যম থাকে ততক্ষণই পড়বে। ক্লান্ত হয়ে গেলে বসে যাবে।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য,

وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر, فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم, هذا رزق القلوب وقوتما للأجساد

অর্থ: আল্লাহর যেমন মেঘ ও বৃষ্টির জন্য নিয়োজিত কিছু ফেরেশতা আছেন, তেমনই হেদায়েত ও ইলমের জন্যও নিয়োজিত কিছু ফেরেশতা আছেন। এটা শরীরের আত্মার খোরাক এবং শক্তি।

১. জামে' সগীর।

২. সহীহ বুখারী।

৪. সময়ের মূল্যায়ন

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সময়ের শপথ করেছেন। কেননা, সময়ের হাত ধরেই ঘটে আশ্চর্য সব ঘটনা। সুস্থতা, অসুস্থতা; সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা; সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সবই সময়ের সাথে আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা সূরা আসরের মধ্যে সময়ের শপথ করে বলেছেন,

وَالْعَصْرِ

অর্থ: শপথ সময়ের...

ইসলামে সময়ের এই যে মূল্যায়ন, এটা মুসলিম নারীর কাছ থেকে কী দাবি করে? নিঃসন্দেহে, এই মূল্যায়নের অনিবার্য দাবি এই যে, সে তার সময়ের হেফাজত করবে। জীবনের মহামূল্যবান সময় সম্পর্কে সচেতন থাকবে। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবে নেক আমলের পাল্লা ভারী করার সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে। সময় থেকে সর্বোচ্চ সুফলটুকু লুফে নেবে। যথাসময়ে যথাযথ কাজে মনোনিবেশ করবে।

মুসলিম নারী তার সময়গুলোকে ভাগ করে নেবে। কিছু সময় তা প্রতিপালকের হক আদায় করার জন্য, কিছু সময় নিজের হক আদা করার জন্য, কিছু সময় অন্যের হক আদার করার জন্য। হযরত মূসা আ. -এর সহীফাসমূহে এসেছে,

ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات. ساعة يناجي فيها ربه, وساعة يحاسب فيها نفسه, وساعة يخلو فيها لله عز وحل, وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب

অর্থ : বুদ্ধিমানের পক্ষে এটাই উচিত হবে যে, তার চারটি সময় থাকবে—একটি সময়ে তিনি আপন প্রতিপালকের সঙ্গে চুপিসারে প্রেমালাপ করবেন, একটি সময়ে নিজের হিসাব গ্রহণ করবেন, একটি সময়ে আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতা নিয়ে ফিকির করবেন এবং একটি সময়ে নিজের পানাহারের জন্য কাজ করবেন।

আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নেক আমলের জন্য সময়ের সদ্যবহার করার উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন,

إغْنَيْمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ، حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ مَرْضِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ مَرْضِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ

অর্থ : তুমি পাঁচটি বিষয় ঘটার আগে পাঁচটি বিষয়ের সদ্মবহার কর—
মৃত্যুর আগে জীবনের, রোগের আগে সুস্থতার, ব্যস্ততার আগে অবসরের,
বার্ধক্যের আগে যৌবনের এবং অভাবের আগে সচ্ছলতার।

আরবী প্রবাদ আছে,

إن الوقت من ذهب إذا تركته ذهب

অর্থ : সময় সোনার চেয়েও দামি। যা চলে যাবে তা আর আসবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারল, সেই জীবনের প্রকৃত মর্ম ও মূল্য অনুধাবন করতে পারল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য জীবন ও জগতে মুসলমানদের আয়ুদ্ধালের গুরুত্ব বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাদের এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে, রোজ হাশরে কত কঠিনভাবে এই আয়ুদ্ধালের হিসাব নেওয়া হবে। তিনি বলেছেন,

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ, وعَن عِلْمِهِ فيمَ فَعَلَ, وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فيم أَبْلَاهُ

অর্থ: কিয়ামতের দিন বান্দা এক পা-ও নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে—আয়ুদ্ধাল সম্পর্কে, কীসে তা ফুরিয়েছে? জ্ঞান সম্পর্কে, কীসে তা কাজে লাগিয়েছে? সম্পদ সম্পর্কে, কীভাবে

১. আহমাদ।

উপার্জন করেছে এবং কীসে ব্যয় করেছে? শরীর সম্পর্কে, কীসে তা শীর্ণ করেছে?^১

কবি বড় চমৎকার কথা বলেছেন,

دقات قلب المرء قائلة له فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها إن الحياة دقائق وثواني فالذكر للإنسان عمر ثاني

অর্থ : হৃদয়ের স্পন্দন বলে বারেবারে, নিজের স্মরণে কিছু করো। মৃত্যুর পরও, যা তোমাকে করবে অমর। এ জীবন তো ক্ষণিকের খেলা। কিন্তু কিছু সুন্দর স্মৃতি ও অমর কীর্তি, সে তো আরেক জীবনের মেলা।

একজন দাঈয়ার জন্য আবশ্যক হলো সময়ের ব্যাপারে সচেতন হওয়া। চিন্তা-চেতনায় এবং আচার-ব্যবহারে তাকে যাবতীয় ক্ষুদ্রতার উধ্বে উঠতে হবে। অনর্থক কথাবার্তা, ক্রিয়াকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। সত্যিকারের সম্পূর্ণা মুসলিম রমণীর জীবনপ্রকৃতির আদলে আঁকতে হবে জীবনের ছক। মেনে চলতে হবে সুচিন্তিত সময়সূচি। হিসেব রাখতে হবে প্রতিটি মুহুর্তের। গড়তে হবে পরিকল্পনামাফিক জীবনযাপন। প্রয়োজন আছে আত্মসমালোচনারও। সারাদিনে মানুষের সাথে আচরণ-উচ্চারণ কেমন হলো, সেটা নিয়ে ভাবুন। কোনো অসৌজন্য বা অমার্জিত আচরণ হয়নি তো? নিজের হিসেব গ্রহণ করুন। আত্মসমালোচনা করুন। আত্মসমালোচনায় নব প্রাণের সঞ্চার হয়। সাধিত হয় ব্যক্তির উত্তর-উত্তর উন্নতি। তা ছাড়া, মুমিনহাদয় তো প্রতিনিয়ত আল্লাহর ভয়ে ভীত, পূণ্যের আশায় উদগ্রীব।

ফজরের নামাজের পর কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-আজকার, দুআ-ইসতিগফার ইত্যাদিতে সময় দেওয়া; তারপর ঘরের সাধারণ কাজ, স্বামী-সন্তানের প্রতি করণীয়, ঘরবাড়ি এবং নিজের

১. তিরমিযী।

ও পরিবারের পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদিতে সময় দেওয়া; এভাবে যোহরের পর ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, হোম-ওয়ার্ক ইত্যাদিতে মনোযোগ দেওয়া; তাদের লেখাপড়া ও জ্ঞানগত অবস্থার তদারকি করা; এভাবে আসরের পর সম্ভব হলে জীবন ও জগতের সঙ্গে জড়িত সাধারণ বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ করা যেমন : পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়য়জনের খোঁজখবর নেওয়া, তাদের সুখে দুখে শরিক হওয়া, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন সংস্থা বা সংগঠনের সভা-সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা; সময় ও সুযোগ বুঝে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া—অর্থ দিয়ে হোক, মেধা দিয়ে হোক, শ্রম দিয়ে হোক—গরিব, দুখী, রোগাতুর, শোকাতুর বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানের মানুষের পাশে দাঁড়ানো; তাদের কল্যাণার্থে সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা; গরিব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা; প্রয়োজনে তাদের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা—সবই একজন মুমিন ও মুসলিম নারীর জীবনের সাধারণ হালচিত্র।

কল্যাণকর ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা মুমিন হিসেবে প্রত্যেকের কর্তব্য। কেননা, ইসলাম ধর্ম পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের ধর্ম, প্রীতি ও সম্প্রীতির ধর্ম, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্বশীলতার ধর্ম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ المؤمنين فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِم وتَعَاطُفِهمْ كَمثَلِ الجُسَدِ إِذَا اسْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجُسَدِ

অর্থ: পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যবোধে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহের মতো। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায়, তখন পুরো শরীরই তাতে সাড়া দেয়।

মুসলিম নারী কুরআন কারীম মুখস্থ করার মতো মহৎ কাজে ব্রতী হতে পারেন। এ তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর কালাম বুকে ধারণ করার যে কী তৃপ্তি তা তো যে কোনো মুমিনই উপলব্ধি করতে

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

পারেন। কত না সৌভাগ্যবান ওই সব ভাই ও বোন, যাদের সিনায় আল্লাহ কালামে পাকের নূর নসীব করেছেন! এ ক্ষেত্রে বয়স কিছু নয়। আমি অনেক মানুষকে জানি, যারা বার্বক্য বা প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েও কুরআন মুখস্থ করার সংকল্প করেছেন। পুরোটুকু না পারুন, অনেকটুকুও না পারুন, কিছুটুকু তো পারবেন। যদি কালামে পাকের সানিধ্যে আপনার জীবনের ইতি হয়, এও কি কম সৌভাগ্যের?

মুসলিম নারী সেলাই-ফোঁড়া, ফুলতোলাসহ বিভিন্ন হাতের কাজ শিখতে পারেন। কম্পিউটারের কাজ শিখতে পারেন। নার্সিংয়ের কাজ শিখতে পারেন। এ জাতীয় আরও অসংখ্য কাজ আছে যেগুলো মুসলিম নারী অনায়াসে করতে পারেন। যেসব কাজে শরীআত নিষেধ করে না, সেগুলো শিখতে এবং যেসব কাজ করতে শরীআতবিরোধী কিছু ঘটে না, সেগুলো করতে বাধা কোথায়?

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম নারীদেরও অংশগ্রহণ ও অবদান রয়েছে। স্বয়ং উন্মূল মুমিনীন হয়রত যায়নাব রাযি, হাতের কাজ করতেন এবং উপার্জিত অর্থে আল্লাহর রাস্তা দান ব্যায়রাত ও সদকা করতেন। হয়রত আয়েশা রাযি, তাঁর সম্প বলেছেন,

ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب إلى الله. كانت زينب رضي الله عنها امرأة صناعة باليد وكانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله

অর্থ: আমি যায়নাব রাথি.-এর চেয়ে অধিক ধার্মিক, মুন্তাকী, সত্যভাষী, আত্মীয়তার সম্পর্করক্ষাকারী, দান খয়রাত ও সদকাকারী নারী দেখিনি। তিনি সবচে বেশি নিজেকে কাজে খাটাতেন, যা দিয়ে তিনি সদকা করতেন এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতেন। যায়নাব রাথি হাতের কাজ করতেন। তিনি চামড়া পাকা করা এবং সেলাইফোঁড়ার কাজ করতেন এবং উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলতেন,

أَسْرَعُكُنَّ لِحُوْقًا بِيْ ٱطْوَلُكُنَّ يَدًا

অর্থ : তোমাদের সেই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে, যার হাত সবচে লম্মা। (অর্থাৎ যে সবচে বেশি দানশীল।) ^২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত যায়নাব রাযি.-ই সবার আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বর্তমান যুগেও এমন এমন মুসলিম নারী পাবেন যারা ঘরসংসার ও দাওয়াতি কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজসেবা ও কল্যাণমূলক কাজেও নিজেকে জড়িয়েছেন। শায়৺ মাহমুদ জাওহারির সহধর্মিনী সাইয়িয়া আমীনা আলী ইয়াতিম শিশুকন্যাদের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদরাসা পরিচালনার পাশাপাশি তিনি হাতের কাজের বেশ কয়েকটি দোকানও পরিচালনা করছেন। লভ্যাংশ যা পান, তা দিয়ে শহীদ, বন্দি ও অবরুদ্ধ ব্যক্তিবর্গের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করছেন।

একজন দাঈয়াকে ঈমান ও বিশ্বাসে হতে হবে অটল অবিচল। অনুসরণ করতে মাল্লাহর দেওয়া জীবনবিধান পুজ্ঞানুপুজ্ঞরপে। নারীমনের সমগ্র শক্তিকে সমবেত করতে হবে আল্লাহর রাহে। তবেই মানবজাতিকে আল্লাহপ্রদত্ত সুমহান দায়িত্বটি আঞ্জাম পাবে; বিপথগামী নতুন প্রজন্ম দিশা পাবে সরল সঠিক পথের, ফিরে পাবে ইসলামের হারানো সেই সুনির্মল স্বর্গোদ্যান।

১. সহীহ মুসলিম।

২. সহীহ মুসলিম।

প্রিয় বোন,

সুতরাং যে দেখাসাক্ষাৎ ও গমনাগমনে পার্থিব-আপার্থিব কোনো কল্যাণ নেই, কোনো উপকার নেই তাতে কেন নিজের জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ সময়কে হেলায় নষ্ট করে দেবেন? যে সম্পর্ক ও সঙ্গদীন ও তাকওয়া তথা ধার্মিকতা ও খোদাভীরুতার ভিত্তিতে নয়, সে সম্পর্ক ও সঙ্গ থেকে নিজেকে বাঁচান। যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মনোবল হারিয়ে, ধর্মের সীমারেখাকে লঙ্খন করে নিচে নেমে গেছে, তাদের সাথে মেলামেশা, ওঠাবসা ছেড়ে দিন। কেননা, তারা আপনাকে আল্লাহর জিকির ও ধ্যান থেকে, আল্লাহর ফিকির ও কল্পনা থেকে বিমুখ করে দেবে। আমি আপনাকে তাদের প্রতি রয়, রক্ষ, কঠিন ও অসৌজন্যপূর্ণ হতে বলছি না; তবে তাদের কুপ্রভাব থেকে নিজেকে, নিজের ঈমানকে, নিজের জিকির-ফিকির, আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহর ধ্যানমন্মতাকে রক্ষা করতে বলছি। সঙ্গনির্ধারণে আপনাকে অবশ্যই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

সতীসাধ্বী ও ধার্মিক নারীদেরই সঙ্গ গ্রহণ করুন। নিঃসন্দেহে সত্যিকারের মুমিনা মুসলিমা ফুলের মতো, যা আপনাকে বিমোহিত করবে সুগন্ধে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ থেকে দূরে সরে গেছে, তারা কাঁটার মতো। আপনাকে কট্ট দেবে। আপনাকেও আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তাই কাঁটা থেকে দূরে থেকে গোলাবেরই সঙ্গ গ্রহণ করুন। ইমাম শাফিস্ট রাহ. কত সুন্দরই না বলেছেন,

> أُحِبُّ الصَالِحِيْنَ ولَسْتُ منهُمْ لَعَلِّي أَنْ أَنَالَ بِحِمْ شَفَاعَةً وأكْرَهُ مَنْ تِحَارَتُهُ الْمَعَاصِي ولَوْ كُنَّا سَوَاءْ فِي الْبِضَاعَةِ ولَوْ كُنَّا سَوَاءْ فِي الْبِضَاعَةِ

অর্থ: আমি ভালোদের ভালোবাসি, যদিও নিজে ভালোদের মধ্যে নই; হয়তো শাফাআত পাব ভালোদের। কিন্তু যারা খারাপ, আমি তাদের ভালোবাসি না; যদিও পাপের বোঝা আমার তাদের মতোই।

৫. হ্রদয়ের গভীরে পৌছে দিন আহ্বান

নিঃসন্দেহে দাওয়াতের কাজ বড় কঠিন। একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন মানবদেহের রোগনির্ণয় ও আক্রান্ত স্থান নির্ধারণের পর ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন তেমনই একজন দাঈ ইলাল্লাহ। তিনিও একজন চিকিৎসক। তিনি চিকিৎসা করেন উম্মাহর হ্বদয়-জগতের। সময় ও সমাজের প্রভাবে, অন্যদের অন্ধ অনুকরণে উম্মাহর অন্থিমজ্জায় যে ব্যধির সৃষ্টি হয়, যে রোগজীবাণু ছড়িয়ে যায়, তারই চিকিৎসা করেন একজন দাঈ ইলাল্লাহ।

তবে দাওয়াতের ক্রিয়াশীলতার জন্য দাঈর প্রয়োজন বলিষ্ঠ যুক্তিশক্তির, সক্ষম বাগ্মিতার। প্রয়োজন আল্লাহর নূরে নূরানী একটি তাজা ও সাচ্চা দিলের। যার প্রতিটি বাণী উৎসারিত হয় হৃদয়ের গভীর থেকে। তাই স্থিত হয় হৃদয়েরই গভীরে। পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে। পূর্ণ আস্থার সাথে। যেন মানুষ আশার আলো দেখে। আভাস পায় একটি সুন্দর জীবনের, একটি সুন্দর পৃথিবীর। রোগাতুর, শোকাহত মানবহৃদয়ে দাঈর আহ্বান যেন রোগনিরাময়কারী এক ফোঁটা প্রতিষেধক হয়েই পতিত হয়। সে যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আল্লাহর স্মরণে।

দাওয়াতের জন্য সম্বোধন করতে হবে মানবস্থদয়কে। মানুষ ও মানবতার প্রতি হিতাকাজ্ফা নিয়ে। হৃদয়্মগ্রাহী ভাষায়। সুন্দর আচরণে, সুন্দর উচ্চারণে। সাথে থাকবে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। সম্বোধিতের প্রতি আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতা। যাতে সে সর্বান্তঃকরণে মনোযোগী হয় আপনার আহ্বানের প্রতি। তা হলেই সে প্রভাবিত হবে। আপনার প্রতিটি কথা তার অন্তরে বদ্ধমূল হবে।

মনে পড়ে, সন্তরের দশকের মাঝের দিকে যখন ইসলামী পুনর্জাগরণের শুভ সূচনা হয় তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী। নতুন প্রজন্মের মেয়েদের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে মুসলিম দাঈয়াগণ তখন কী শ্রমই না দিয়েছিলেন! কী সাধনাই না করেছিলেন!

জীবন ও জগতের নিত্যনতুন বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হতেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নারীদের সাথে আলোচনা করতেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, ঘরে বসে, ক্লাসরুমে গিয়ে বিভিন্ন অবস্থায় তাদের সাথে কথা বলতেন। চলত অনবরত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান, চিন্তার আদানপ্রদান ও আবেগ-অনুভূতির বিনিময়। এভাবে অনেকের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে যেত। মনে উঁকি দিত অজস্র প্রশ্ন। যা জন্ম দিত এক অভ্যন্তরীণ চেতনাশক্তির।

পবিত্র নগরী বাইতুল মাকদিসের একটি বিদ্যালয়ে আমি শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলাম। ওই সময় থেকেই আমি দাওয়াতি কাজকে নিজের ব্রত বানিয়ে নিই। শিক্ষাজীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে আসা মুসলিম দাঈয়াদের দাওয়াতি রীতি-নীতি ছিল আমার পাথেয়।

আমি যেদিন প্রথমবারের মতো শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলাম সেদিন অবাক না হয়ে পারলাম না। আমি আমার ছাত্রীদের লক্ষ করে ইসলামের সম্ভাষণবাক্য উচ্চারণ করলাম। বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। কিন্তু একি, সবাই নিশ্চুপ! একটি ছাত্রীও আমার সালামের উত্তর দিল না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি লক্ষ করলাম, তাদের আচর আমি যতটা অবাক হয়েছি, আমার সালামে তারা তারচে বেশি হতব হয়েছে। জানতে চাইলাম, তারা এমন হতবাক হয়ে গেল কেন? কেন্দ্র উত্তর দিল না কেন?

ক্ষীণ স্বরে একজন জানতে চাইল, কী বলতে হবে? আমি বললাম, তোমরা বলো, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতৃল্লাহি ওয়া বারাকাতৃহ—এটা হলো দুনিয়া ও আখেরাতে ইসলাম ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্ভাষণবাক্য।

এরপর আমি চক ও ডাস্টার হাতে নিয়ে বে।ভের দিকে অগ্রসর হলাম। আমি বোর্ডে একটি বাক্য লিখলাম.

ماذا يعني انتمائي للإسلام

ইসলামের সাথে আমার সম্পর্কের মর্ম কী?

আমি প্রশ্নটি এক এক করে আমার প্রত্যেকটি ছাত্রীকেই জিজ্ঞেস করলাম। খুব কম ছাত্রীই উত্তর দিতে পারল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি মুসলিম? তারা উত্তর দিল, হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্যদের তুলনায় একটি মুসলিম মেয়ের ভিন্নতা কীসে, জানো? তারা উত্তর দিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা। আমি বললাম, আর কিছু? তারা বলল, আর কিছু জানি না।

সেই মুহূর্তেই আমার সমগ্র সন্তা যেন হিম হয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম, এ এক লক্ষ্যহীন দিশেহারা প্রজন্ম; এরা আত্মপরিচয়হীন, আত্মোপলব্ধিহীন। কেননা, এদের বাস এমন এক পরিবেশে যা ইসলাম থেকে দূরে, অনেক দূরে।

আমি ছিলাম ধর্মশিক্ষিকা। তাই অনেকটা সহজ হলো। ছাত্রীদের ধর্মের তালীম দিতে লাগলাম। একদম গোড়া থেকে। ইসলামের রুকন থেকে শুরু করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সকল স্তরের আমলী তালীম। ওযু কীভাবে করতে হবে, নামায কীভাবে পড়তে হবে ইত্যাদি।

আমি ক্লাস শেষে তাদের সাথে নিয়ে প্রতিদিন যোহরের নামায আদায় করতাম। বিদ্যালয়সংলগ্ন একটি নামাযগাহ ছিল। যদিও ছাত্রীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য হলে সবই সহজ হয়ে যায়। ছাত্রীদের মধ্যে সাড়া জাগল। নতুন শিক্ষিকার নতুন নতুন কথাবার্তা তাদের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই পুরো বিদ্যালয়ে শুরু হলো শোরগোল। ধর্মের ক্লাসে এসব কী হচ্ছে? ধর্মশিক্ষিকা ক্লাস করাবেন, বই পড়াবেন। ওযু করাতে, নামায পড়াতে কে বলেছে তাকে? এ তো বিদ্যালয়। একে ধর্মালয় বানানোর অধিকার তিনি কোখেকে পেলেন? এরকম আরও অনেক কথা। কিন্তু আমি পিছপা হলাম না। দৃঢ়তার সাথে আমার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলাম।

আমি আমার ছাত্রীদেরকে পথ চলার, কথা বলার ইসলামী শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে লাগলাম। ক্লাসরুম থেকে সুশৃঙ্খলভাবে বের হওয়া, আবার সুশৃঙ্খলভাবে ফিরে আসা, বিদ্যালয়ের আঙিনা, চলার পথ পরিচ্ছন্ন রাখা—ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহিত করতে থাকলাম।

অভিভাবকরা বিষয়গুলো অবগত হয়ে অনেকে খুশি হলেন। অনেকে আপত্তিও করলেন। বিশেষ করে, ছোট ছোট মেয়েকে ওযু করিয়ে, নামায পড়িয়ে কী চাইছি আমি?

তখন সেখানে নামাযের প্রচলন ছিল না তা নয়। তবে নামাযী ছিলেন শুধু চামড়া-জড়া বুড়োবুড়ি। সেখানকার মানুষের ধারণা ছিল, নামায পড়া অকর্মা বুড়ো বুড়ির কাজ। 'ইয়ং'রা নামায পড়া মানে ঘণ্টাকে ঘণ্টা সময় অপচয়, পেছনে ফিরে যাওয়া, প্রগতিকে ব্যাহত করা ইত্যাদি। আর আমার ওপর আপত্তির মূল মন্ত্রও ছিল এটাই।

যাই হোক, আমি আমার ছাত্রীদের সামাজিক ইসলামী শিষ্টাচারেও উদ্বৃদ্ধ করতে লাগলাম। সালাম থেকে শুরু করে জাযাকাল্লাহু খাইরান বলা, মুসলিম বোনদের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়া, সুন্দর ও শালীন ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি।

প্রায় এক বছর অতিবাহিত হলো। আমার অনেক ছাত্রী, বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষিকা এবং অনেক অভিভাবিকা 'ধর্মের ক্লাস' এবং 'ধর্মশিক্ষিকা'র দ্বারা প্রভাবিত হলেন। আমারও তামান্না ছিল, এ হৃদয়গুলো সত্যের আলো লাভ করুক। কালের অতল গহারে যে সত্য চাপা পড়তে শুরু করেছে সে সত্য আবার উদ্ভাসিত হোক।

এক বছর অতিবাহিত হলো। আমি কিছু নামাযী নারী পেলাম, যারা ধর্মীয় শিষ্টাচার মেনে চলে। বিষয়টি আর যাই বোঝাক, এটা অবশ্যই প্রমাণ করছে যে, সত্যের অঙ্কুর প্রতিটি হৃদয়েই বিদ্যমান; উর্বর ভূমি পেলে অচিরেই উদ্গম হবে চারার, পরিচর্যায় যা হয়ে উঠবে পত্রপল্লবিত, ফুলবতী, ফলবান।

আমি তখন পর্যন্ত পর্দার কথা তুলতে পারিনি। কেননা, পরিবেশ প্রতিকূল ছিল। তাদের কাছে পর্দাপ্রসঙ্গ ছিল একদমই নতুন। এ বিষয়ে তাদের কোনো অবগতিই ছিল না। কিন্তু এক বছরের অবিরাম সাধনায়

ফিরে এসো নীড়ে

আল্লাহ কিছু হাদয়কে আলোকিত করেছন। তারা আর সত্যকে স্বীকার করতে অপ্রস্তুত নয়।

আমি একটু একটু করে পর্দার বিষয়েও বলতে লাগলাম। আমি আমার ছাত্রীদের বোঝাতে লাগলাম যে, পর্দা করা প্রত্যেক মুসলিম নারীর ওপর ফরজ।

কিন্তু নামাযের আহ্বানে যতটা সাড়া পেয়েছিলাম, পর্দার আহ্বানে ততটা সাড়া পাওয়া গেল না। কেননা, জিলবাব (পর্দার পোশাক) তাদের চোখে নতুন বা অছুত বিষয় ছিল। পারিবারিকভাবে আসত বাধা। সামাজিকভাবে পড়তে হতো রোষানলে। আর 'নারীস্বাধীনতা'র হুকাহুয়ার কথা তো বলাই বাহুল্য। সর্বত্র চলছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাহজিবতামাদুন ছুঁড়ে ফেলার তোড়জোর প্রস্তুতি। এমনকি, মা পর্যন্ত মেয়েকে নাকি শুধু পর্দা করতে নয়, বোরখা পরতেও বারণ করতেন।

এক এক করে কয়েক বছর কেটে গেল। একটি দুটি করে অনেক মেয়ে পরিবারের বাধা, সমাজের উপহাস, সহপাঠিনীদের ঠাটা-বিদ্রুপ সত্ত্বেও পর্দার ফরজ বিধানকে মেনে নিল। কোনো একটি শ্রেণিতে একটি মেয়েকেও যখন জিলবাব পরতে দেখতাম, তখন আনন্দে মন ভরে যেত। আমার কাছে এটাকে মনে হতো বিরাট সফলতা। আল্লাহর শোকর, আজ সেখানে অনেক মানুষ তৈরি হয়েছেন যারা জানেন এবং বিশ্বাস করেন, পর্দা একটি ফরজ ইবাদত। প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়ক্ষ মেয়েকে এই ইবাদত করতেই হবে।

বলতে পারেন, যারা শিক্ষকতা বা এ জাতীয় কোনো পেশায় নিয়োজিত, তাদের পক্ষে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ। কিন্তু যারা কোনো কাজে নেই তাদের পক্ষে এসবের সুযোগ কোথায়? কিন্তু আমি বলব, মুসলিম নারীর পক্ষে দাওয়াতি কাজের কোনো সুযোগই হাতছাড়া করা উচিত নয়। কোনো কাজে না থাকলেও অপরাপর নারীর সাথে যোগাযোগের অসংখ্য সুযোগ আছে।

আমাদের দেশে তো বিভিন্ন সাপ্তাহিক মজলিস হয়। পাড়াপ্রতিবেশিনীরা, বান্ধবীরা সপ্তাহে অন্তত একদিন কোনো একজনের বাড়িতে জড়ো হয়। গল্পগুজব করে, আনন্দ-বিনোদন করে, এরপর যার যার বাসায় ফিরে যায়। তা হলে আধুনিকতার দোহাই দেওয়া এসব গল্পগুজব, আনন্দ-বিনোদন না করে আমরা কি সেখানে দ্বীনি আলোচনা করতে পারি না? কুরআন হাদীসের কথা বলতে পারি না? পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা ও অসঙ্গতিগুলোকে ধর্মীয় আঙ্গিকে পর্যালোচনা করতে পারি না?

মনে হতে পারে, যেখানে যেটা চালু হয়ে গেছে, সেটাকে তুলে দেওয়া বা বদলানো কঠিন। কিন্তু এও সত্য যে, আপনি যদি সংকল্প করেন, তা হলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আপনাকে সঙ্গ দেবে।

একসময় আমি সউদি আরব রিয়াদের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। প্রতি শনিবার শিক্ষিকাদের কক্ষে গেলেই ছুটির দিনে তাদের আহার-বিহার ও ঘোরাফেরার গল্পগুজব শুনতে পেতাম। ছুটির দিনে কে কার বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেসব গল্প।

আমি জিজ্ঞেস করতাম, ছুটির দিনে বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে কীভাবে সময় কাটান? তারা বলতেন, 'ভাই, খাই-দাই, নাচি-গাই, ফুর্তি করি।' আমি বলতাম, আচ্ছা, সারা সপ্তাহে মাত্র একটা দিন—মাত্র একটা দিন অন্তত—পুরো সময়টা পরিবারের সাথে কাটানো যায় না? আহার-বিহার, আনন্দ-বিনোদন যা করার স্বামী-সন্তান নিয়েই তো বেশি জমে। তারাই তো অধিক হকদার এই সময়টুকু আপনাকে কাছে পাবার।

তারা আমার কথার কোনো উত্তর দিতেন না। কেউ হেসে উড়িয়ে দিতেন। কেউ রাগও করতেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে, আল্লাহর শোকর, শিক্ষিকাদের কক্ষে ওসব অনর্থক গল্পগুজব আর শোনা যেত না।

আমি আমার নিজের জীবনের কথাগুলো বলছি গর্ব করার জন্য নয়; বরং এজন্য যে, এতে বাস্তবতা অনেক সহজ হয়ে দেখা দেয়—হাতে ধরার মতো, চোখে দেখার মতো মূর্ত সহজ হয়ে। আল্লাহই উত্তম তওফিকদাতা।

৬. প্রজ্ঞা এবং উত্তম উপদেশ
 মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيُ هِيَ آحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

অর্থ : তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞার সাথে, উত্তম উপদেশে। তুমি বিতর্ক করো তাদের সাথে সুন্দরতম পদ্ধতিতে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই অধিক অবগত পথদ্রষ্টদের সম্পর্কে। তিনিই অধিক অবগত হেদায়েতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে। –সূরা নাহল : ১২৫

সূতরাং যিনি আল্লাহর পথের দাঈ হবেন, তার অন্তর হতে হবে প্রশস্ত, চিন্তা-চেতনা হতে হবে মহৎ। তার আচরণ হবে দয়া ও করুণানির্ভর, ক্ষমা ও মার্জনাভিত্তিক। তা হলেই মানুষের অন্তরে জায়গা করে নেওয়া হবে সহজসাধ্য। তখনই মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। সাদরে বরণ করে নেবে তার উপদেশ।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকেরই মন যোগাতে হবে বা প্রত্যেকেই তার কথা গভীর আগ্রহে গ্রহণ করে নেবে। কেননা, কারও কথা গ্রহণ করা না-করার ব্যাপারে মানুষের রুচি প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং যদি কেউ সাড়া না দেয়, বা কেউ প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে হতাশ হওয়া বা রাগান্বিত হওয়ার কিছু নেই। বরং ব্যথিত, মথিত হ্বদয় নিয়ে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয়় করতে হবে মানুষের কল্যাণসাধনে।

দাঈ হবেন কল্যাণের ধারার মতো। যেদিক দিয়ে অগ্রসর হবেন, সকলকে সিঞ্চিত করবেন কল্যাণে। সুউচ্চ মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাবেন সমুখ পানে। বিরামহীনভাবে। ক্লান্তিহীনভাবে। ক্ষুদ্রতার উর্ধের্ব থেকে। কঠোরতা বা বাড়াবাড়ি ছাড়া। কেননা, যিনি মানুষকে চারপাশে সমবেত করতে চান, তাকে অবশ্যই হতে হবে বিনীত উটনীর মতো। হাজার উপেক্ষা, হাজার অত্যাচার বরণ করে নেবেন অম্লান বদনে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য রেখে গেছেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, সদাচারী। প্রতিকূলতায় সাহাবা কেরাম যখন উৎকণ্ঠিত বা হতবিহ্বল, কিংবা উন্তেজিত হয়ে উঠতে চাইতেন, তখন তাঁর অমীয় বাণী তাদের উৎকণ্ঠা দূর করত, তাদের শান্ত করত। তিনি তাদের বিপদাপদ ও প্রতিকূলতার মুখে অবিচল থাকার শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদের এই দীক্ষাই দিতেন যে, ধৈর্য ও সহনশীলতার দ্বারাই মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। দাঈর সফলতাও এখানেই নিহিত।

দেখুন না, মহান আল্লাহ হযরত মৃসা ও হারুন আ. কে নির্দেশ দিলেন ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে। ফেরাউন ছিলেন কওমের নেতা। বরং বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি। আল্লাহ তাদেরকে কীভাবে দাওয়াত দিতে বললেন, তা নিজেই পড়ে নিন পবিত্র কুরআন থেকে,

إِذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ مُ اللهِ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِنَّا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخْشَى ﴿ ١٣﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي ﴿ ١٣﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي ﴿ ١٣﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمُا آسُمَعُ وَالرى ﴿ ٢٩﴾

অর্থ : তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালজ্ঞন করেছে। তোমরা তাকে বলো কোমল কথা। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভীত হবে। তারা দুজন বলল, হে আল্লাহ, আমাদের ভয় হয় যে, সে আমাদের সাথে স্বেচ্ছাচারিতা বা সীমালজ্ঞন করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনব, দেখব। –সূরা তুহা: ৪৩-৪৬

আল্লাহ মহিমান্বিত দুই নবীকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা ফেরাউনকে দাওয়াত দেন, এবং আল্লাহর একত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। সাথে সাথে আল্লাহ তাদের এও নির্দেশ দিলেন যে, তাদের দাওয়াতের শৈলী হতে হবে সরল ও কোমল, যথাযথ সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক ও যথাযোগ্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে।

আলোচ্য বিষয় থেকে আরও একটি বিষয় বুঝে আসা উচিত যে, প্রতিটি মানুষকেই তার রুচি ও প্রকৃতি বুঝে দাওয়াত দিতে হবে। প্রতিটি মানুষের মৌলিকত্বের প্রতি পোষণ করতে হবে সুধারণা। সূতরাং আমরা ধনী-গরিব, আমীর-ফকির, ছোট-বড়, সবল-দুর্বল সবাইকেই দাওয়াত দেব। আমরা বিশ্বাস করি, এভাবে আমরা যদি এক হয়ে যেতে পারি, একে অপরের সহযোগী হতে পারি, তা হলে আমরা অকল্যাণ রোধ করতে পারব সার্থকভাবে, বাতিলের মোকাবেলা করতে পারব সক্ষমভাবে। তখনই আল্লাহ তাঁর দীনকে সাহায্য করবেন। পৃথিবীর আকাশে পতপত করবে ইসলামের পতাকা।

প্রিয় বোন,

দাওয়াতের শৈলীতে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করুন। নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করুন। নতুনত্ব একঘেয়েমি ও অবসাদ দূর করে। হযরত নূহ আ.এর জবানিতে পবিত্র কুরআনে আমরা এরই শিক্ষা পাই,

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيُلَا وَ نَهَارًا ﴿ هِ ﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِ فَى إِلَّا فِرَارًا ﴿ ٢﴾ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اصَابِعَهُمْ فِي الدَّانِهِمْ وَ اسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَ اصَرُّوا وَ اسْتَغْفِرُ وَ اسْتِكْبَارًا ﴿ ٤ ﴾ ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ٨ ﴾ ثُمَّ إِنَّى اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ ٩ ﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارَبَكُمْ النَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ ٩ ﴾ لَهُمْ وَ اسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ ٩ ﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَارَبَكُمْ النَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴿ ٩ ﴾

অর্থ : নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার কওমকে রাত দিন দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়নপরতাই বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি যখনই তাদের আহ্বান করেছি, যেন তুমি তাদের ক্ষমা কর, তখনই তারা কানে আঙুল দিয়েছে এবং কাপড় দিয়ে আত্মগোপন করেছে। তারা বাড়াবাড়ি করেছে এবং অতিরিক্ত অহংকার প্রদর্শন করেছে। আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি উচ্চস্বরে। আমি তাদের দাওয়াত দিয়েছি গোপনে। আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ইসতিগফার করো। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।...-সূরা নূহ: ০৫-১০

অনেক সময় দাওয়াত দিতে হয় একজন একজন করে, আলাদা আলাদাভাবে। প্রত্যেকের প্রতিই আরোপ করতে হয় আলাদা গুরুত্ব। আবার অনেক সময় দাওয়াত দেওয়া ভালো হয় একই জায়গায় একই সাথে অনেক মানুষের সমাগমে। এগুলো মূলত নির্ভর করে মানুষের জীবনপ্রণালি, রুচি-প্রকৃতি ও স্বভাববৈশিষ্ট্যের ওপর।

তবে প্রাথমিক পর্যায়ে দাওয়াতি কাজ গোপনে করাই শ্রেয়। কেননা, ধর্মীয় বিপ্লবের আশঙ্কায় যে কোনো দ্বীনি কাজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সমরনীতি গৃহীত হয়েছে সর্বত্র।

সভা-সেমিনারে, বিভিন্ন তর্কানুষ্ঠানে বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করুন। আয়োজন করুন নারীদের জন্য ধর্মীয় আলোচনা ও মতবিনিময়সভার। এভাবে ইসলামী জীবনদর্শনকে ব্যাপক পরিসরে এমনভাবে উপস্থাপন করুন যাতে মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রাস্লের সুন্নাহকেই শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করার অনিবার্যতা স্বীকার করে।

লেখালেখিও অতি উত্তম উপায়। বিশেষত সমসাময়িক বিষয়ে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত হওয়া খুবই জরুরি। কোনটি কতটুকু ধর্মানুগ, ন্যায়ানুগ; কোনটা ধর্ম থেকে কত দূরে—এগুলো আলোচনায় আসা চাই।

দাঈয়াকে অবশ্যই চারপাশের নারীদের ঝোঁক ও প্রবণতা এবং যোগ্যতা ও সামর্থ সম্পর্কে জানতে হবে। কার মধ্যে কী প্রতিভা আছে, কে কীভাবে দাওয়াতি কাজকে এগিয়ে নিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষরাখতে হবে। অনেক নারী লেখালেখিতে পারদর্শী হন। অনেকের মুনশিয়ানা বিতর্কে বা উপদেশদানে। অনেকের দানের হাত ভালো। অনেক শ্রম দিতে পারেন কোমর বেঁধে। দাঈয়াকে সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যদি কখনো এমন হৃদয় পেয়ে যান, যা ধর্মের প্রতি অনুরাগী, দাওয়াতের প্রতি অনুরাগী, তা হলে তাতে সাহস ও প্রণোদনা যোগান। প্রায়ই এমন হয় যে, হৃদয়ে ধর্মীয় আবেগ জ্বলম্ভ অঙ্গারের মতো চাপা

পড়ে থাকে পার্থিব ধ্যানধারণার নিচে। অবস্থা এমন—যদি কেউ একটু ফুঁক দেয় তা হলেই জ্বলে উঠবে, জেগে উঠবে; আলো ছড়াবে অনির্বাণ শিখা হয়ে, প্রদীপ্ত প্রদীপ হয়ে।

প্রিয় বোন,

যদি কখনো এরকম একটি হ্বদয়ও পেয়ে যান, তা হলে এ হ্বদয়টিকে জাগাতে ব্রতী হোন। একে তুচ্ছ মনে করবেন না। এটাই হতে পারে আপনার জীবনের মহন্তম কীর্তি। হয়তো আপনার উসিলায় একজন নারী সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশ করবে ধর্মের প্রতি, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি। হতে পারে, তারই সার্থক নেতৃত্বে একদিন পরিচালিত হবে মুসলিম নারীসমাজ; স্বাদ পাবে ইসলামের, ঈমানের।

৭. ধৈৰ্য ও অবিচলতা

প্রিয় বোন,

জেনে রাখুন, ধৈর্য হলো আল্লাহর দাসত্ত্বেরই বিভিন্ন পর্যায়ের একটি। কুরআনে কারীমে অসংখ্য আয়াতে ধৈর্যের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ

অর্থ : হে ওই সমস্ত লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। –সুরা বাকারা : ১৫৩

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

وَاصْبِدْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمُ تُرِيْدُ إِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ فَكُمْ عَنْ اَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ فِرُكُونَا وَالنَّانَعَ لَهُمُ هُولُكُا

অর্থ : সকাল সন্ধ্যা যারা সম্ভৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, তুমি তাদের সাথে ধৈর্যধারণ করো। পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের মোহে তোমার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায়। আমি যার হৃদয়কে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন রেখেছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে, যার বিষয়টি সুস্পষ্ট সীমালজ্ঞন তুমি তার আনুগত্য কোরো না। –সুরা কাহক : ২৮

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لِعِبَادِ الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ ۚ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْدِ حِسَابٍ

অর্থ : তুমি বলে দাও, হে আমার ওই সমস্ত বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো; এই দুনিয়ায় যারা কল্যাণ করবে, তাদের জন্য থাকবে মহাকল্যাণ। আল্লাহর জমিন তো অনেক প্রশস্ত। নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের দেওয়া হবে অপরিমিত পুরস্কার। সুরা যুমার : ১০

যাই হোক, ধৈর্য কয়েক প্রকার:

- আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ : অর্থাৎ ধৈর্যের সাথে আল্লাহর হকুম আহকাম মেনে চলা।
- বিপদাপদে ধৈর্যধারণ : অর্থাৎ বিপদাপদ ও আল্লাহর রাহে জুলুম অত্যাচারের মুখেও আপন ধর্ম ও বিশ্বাসের ওপর অবিচল পাকা।
- ত. আত্মনিয়ন্ত্রণে ধৈর্যধারণ : অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানি ও গোনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা।
- ৪. দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ : জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখী বিপদাপদ, কষ্ট-ক্লেশ, জুলুম-অত্যাচারে ধৈর্যধারণ ও পূর্ণ পণ ও প্রত্যয়ের সাথে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করা।

ধৈর্য প্রকারভেদসহ দাঈয়ার সফলতার পূর্বশর্ত। আপনার চারপাশের প্রত্যেকেই খুশিমনে আপনার কথা মেনে নেবে, আপনার কাজে সাড়া দেবে—এমনটা আশা করা ঠিক নয়। এমনিতেই মানুষকে নিয়ে কোনো কাজ করা কঠিন। দাওয়াতি কাজ করা আরও কঠিন। আর মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন আনা যারপরনাই কঠিন। এজন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। প্রয়োজন বিনয়ী, নম্র ও সহনশীল আচরণ।

দাঈয়ার কাজ হলো নিরাশ না হওয়া। অবিরাম দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া। যতক্ষণ একটিও কান আছে শোনার মতো। একটিও হ্বদয় আছে ভাবার মতো। একটুও আশা আছে সাড়া পাবার মতো।

আবু উমাইয়া শাবানী বলেন, আমি আবু সালাবা খশানীর কাছে গেলাম, বললাম, এই আয়াতটি সম্পর্কে আপনার কী মত? তিনি বললেন, কোন আয়াত? বললাম,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امِّنُوا عَلَيْكُمْ انفُسَكُمْ الايضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। তোমরা নিজেরা যদি হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে যাও, তা হলে যে গোমরা হলো সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। –সূরা মাইদাহ : ১০৫

তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তিকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

بَلِ ائْتَمرُوْا بِالمعروفِ وتَنَاهَوْا عن الْمُنْكَرِ, حتى إذا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا, وهَوَى مُتَبَعًا, ورأَيْتَ أَمْرًا لا يَدَانِ وهَوَى مُتَبَعًا, وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً, وإعْجَابَ كُلِّ ذِي رأي برأيه, ورأَيْتَ أَمْرًا لا يَدَانِ لَكِ بِهِ, فَعَلَيْكَ خُويْصَةَ نَفْسِكَ, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ, الصبرُ فيهِنَّ

مثُلُ القَبْضِ عَلَى الْحَمْرِ, لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا بِمِثْلِ عَمَلِهِ عَلَى الْقَبْضِ عَلَى الْحَمْرِ, لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أُجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا بِمِثْلِ عَمَلِهِ عَلَى الْعَمْدِ عَلَى الْحَمْرِ بِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ مِثْلُ أُجْرِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا بِمِثْلِ عَمَلِهِ عَمْلِهِ

অসং কাজে বাধা প্রদান করতে থাকো। অবশেষে যখন স্বার্থের অনুগমন, প্রবৃত্তির অনুসরণ, পার্থিবতার ব্যাপক প্রাধান্য এবং নিজ নিজ মতে প্রত্যেকের আত্মতুষ্টির ব্যাপক চর্চা হতে দেখবে, এবং এমন কিছু হতে দেখবে যাতে তোমার করার কিছুই নেই, তখনই শুধু নিজের কথা ভেবো।
নিশ্বয় তোমাদের পশ্চাতে আসছে ধৈর্যের দিন। ওই দিনগুলোতে ধৈর্য
ধারণ করা—হাতে জ্বলস্ত অঙ্গার চেপে ধরে থাকার মতো কঠিন হবে।
তখন একজন আমেল পঞ্চাশজন আমেলের বিনিময় লাভ করবে।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهُ أَخْرُ خَمْسِيْنَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ ؟ قال : بل أَخْرُ خمسين مِنْكُمْ

অর্থ : বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন, নাকি তাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন? তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্য থেকেই পঞ্চাশজন।

অন্য একটি বর্ণনায় বিনিময়ের আধিক্যের কারণ দর্শানো হয়েছে এভাবে,

إِنَّكُمْ تَمِدُوْنَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا ,ولَا يَجِدُوْنَ عَلَى الْخَيْرِ أَعْوَانًا

অর্থ : তোমরা কল্যাণে সহযোগী পাচ্ছ, কিন্তু তারা কল্যাণে সহযোগী পাবে না।

আমাদের প্রিয় নবীজীর মাঝে আমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ তিনি কত বিপদের মুখে পতিত হয়েছেন! কত উপেক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন! কত গালমন্দ সহ্য করেছেন! এমনকি, মহান আল্লাহ পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠালেন এই মর্মে,

إِنْ شِئْت أَطْبَقْتُ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْن. فيقول : لَا إِنِي أَسَالُ اللهَ تعالى أَن يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَاكِمِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

অর্থ : হে নবী, আপনি যদি চান, তা হলে তাদের ওপর দুই পাহাড় ধ্বসিয়ে দেব। কিন্তু তিনি বললেন, না, আমি বরং আল্লাহর কাছে এটা চাই যে, তিনি এদের ঔরসেই জন্ম দেবেন এমন কিছু মানুষ যারা

১. বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ। শব্দ ইবনে মাজাহ ও তিরমিয়ীর।

আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না।^১

হলোও তাই। আল্লাহ ওয়ালিদ বিন মুগীরা ও আবু জেহেলের মতো কাফের ও খোদাদ্রোহীর উরসে জন্ম দিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো দিশ্বিজয়ী বীর ও ইকরিমার মতো মুসলিম সাধককে।

দাওয়াতে পর্যায়ক্রমতা আছে। আগে মনকে প্রস্তুত করতে হয়। তারপর নতুন কিছু তুলে ধরা। অপ্রস্তুত অবস্থায় কারও কাছে কোনো কিছু গৃহীত হওয়া অনেকটা আকস্মিকতা। তাই দাওয়াতি কাজে পর্যায়গুলো বিবেচনায় রাখা আবশ্যক।

প্রথমে দাওয়াত-পরিচিতি। অর্থাৎ দাওয়াতের বিষয়, অঙ্গন, পরিধি ইত্যাদি ঠিক করা। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্র নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে, দাওয়াতি কাজে সহযোগী নির্বাচন করা। এমন কিছু মানুষ—যারা আপনার চিন্তা চেতনাকে গ্রহণ করবে, জীবন-সফরের এই মহতী উদ্যোগে আপনার সঙ্গী হবে। তৃতীয় পর্যায়ে চিন্তা-চেতনার বান্তবায়নে মাঠে নামা। মনে রাখবেন, এখানে যা মৌলিক প্রয়োজন তা হলো এমন আলোকিত হৃদয়—যাতে ঈমান আছে, ইখলাস আছে।

এভাবে ধাপে ধাপে সফলতার সাথে এগোতে পারলে আশা করা যায় আমাদের দাওয়াতি কাজের একটি শক্তিশালী, সুসংহত, কার্যকর ভিত্তি স্থাপিত হবে। আমাদের শ্রম সার্থকতা পাবে, ফলপ্রসূ হবে। জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন আনাও সম্ভব হবে। অচিরেই মানবজীবন পরিচালিত হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পতাকাতলে।

আমরা যখন কোনো নারীকে দাওয়াত দেব, তখন সে হয়তো খুব অনায়াসে সালাত আদায় শুরু করবে। কিন্তু পর্দার বেলায় অপারগতা প্রকাশ করবে। হয়তো নিজের প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হয়ে, কিংবা অন্য কোনো প্রতিকূলতার কারণে। তখন হতাশ হলে চলবে না। তার সাথে লেগে থাকতে হবে। দীনের দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। তাকে উপলব্ধি

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

করাতে হবে যে, অচিরেই কাল কিয়ামতে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে; সেখানে মা বাবা ভাই বোন স্বামী সন্তান কেউ থাকবে না; সেখানে আল্লাহ ছোট বড় সবকিছুর হিসেব নেবেন।

আশা করা যায়, থীরে ধীরে আমরা আমাদের এই বোনটিকে বর্বরতার পয়জন থেকে মুক্ত করতে পারব। পাশ্চাত্যপ্রিয়তা ও অন্ধ অনুকরণের বেড়াজাল থেকে বের করে আনতে পারব। বিশেষ করে, আধুনিকতার নামে যে অপচর্চা শুরু হয়েছে, নারীরা আত্মবিস্মৃত হয়ে যে মরণফাঁদে পা দিতে আরম্ভ করেছে, হয়তো তা থেকে তাকে বাঁচাতে পারব। আমাদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে কবুল করে হয়তো আল্লাহ তার মাঝে ধার্মিকতা সৃষ্টি করবেন। এই বোনটির মাঝেই, অচিরেই আমরা একটি সত্যিকারের ধার্মিক নারীকে দেখতে পাব। যিনি মনে প্রাণে ইসলাম ও মুসলমানকে ভালোবাসবেন। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কাছে কঠিন কিছু নয়।

প্রিয় বোন,

এ পথে চলতে হয়তো অনেক বাধা আসবে। হয়তো অনেক কঠিন কঠিন পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে। নিশ্চয় এ পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এটা যেমন সত্য, এর চেয়েও বেশি সত্য এই যে, এর বিনিময় ও প্রতিদান আল্লাহর কাছে অনেক বড়, অনেক মহৎ।

হ্যরত সুমাইয়া রাযি.-কেই দেখুন। তিনি ছিলেন ইসলামের পথে শাহাদতবরণকারী প্রথম নারী। কাফেররা তাকে, তার ছেলে ও স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে নিয়ে গিয়ে পুরো পরিবারকে কী নির্মম অত্যাচার করল। কিন্তু হ্যরত সুমাইয়া রাযি. ধৈর্য ও অবিচলতার কী জীবন্ত উদাহরণই না রেখে গেলেন যুগ যুগের মুসলিম নারী সমাজের জন্য। তিনি আপন ছেলেকে স্বামীকে উৎসর্গ করলেন আল্লাহর রাহে, প্রাণ সঁপে দিলেন আপন প্রভূর সমীপে; কিন্তু নিজের ঈমানকে কাফের বেঈমানের সামনে বিসর্জন দিতে রাজি হলেন না।

১. সালাহল উম্মাহ ফী উলুবিল হিম্মাহ ৭/১৬৭।

এই যে উম্মে শারিক গাযিয়া বিনতে জাবের বিন হাকিম। ইনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কুরাইশ নারীদের কাছে গিয়ে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। একদিন কুরাইশ কাফেররা ধরে ফেলল। তারা কঠিন কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে ধমক দিয়ে বলল, তোমার গোত্রের লোকেরা না থাকলে আজ তোমার সাথে যা করার করতাম। কিন্তু আজকের মতো তোমাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিচ্ছি। উম্মে শারিক বলেন, আমার কণ্ডমের লোকেরা আমাকে একটি উটের পিঠে ফেলে দিল। নিচে কিচ্ছু দিল না। এভাবে তিন দিনে এক মনজিল অতিক্রম করতাম। এ দীর্ঘ সময়ে তারা আমাকে না কিছু খেতে দিত, না কিছু পান করতে দিত। প্রত্যেক মনজিলে আমাকে রোদে ফেলে রাখত। নিজেরা ছায়ায় বিশ্রাম করত। বিশ্রাম করে খেয়ে পান করে তৃপ্ত হয়ে আবার যাত্রা করত। এক দিন এভাবেই রোদে পড়ে ছিলাম। আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। হঠাৎ মুখের ওপর শীতল কিছু অনুভব করলাম। মনে হলো, পানির বালতি ধরা হয়েছে। আমি একটু পান করলাম। বালতিটি সরিয়ে নেওয়া হলো। আবার ধরা হলো। আমি আবার পান করলাম। এভাবে কয়েক দফায় পান করে আমি পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ত হলাম। এবার वानि कि मेर करत धरत नवश्वा भानि भारत उभत एएन निनाम। আমার শরীর কাপড় ভিজে গেল। আমি তাজা হয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে সবাই জেগে গেল। তারা পানির ছাপ দেখতে পেল। আমিও একদম তাজা হয়ে আছি। তারা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বলল, তুমি নিশ্চয় রশির বাঁধন খুলে আমাদের পানি খেয়ে ফেলেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি এমন কিছু করিনি। আসলে এরকম এরকম ঘটেছিল। তারা বলল, যদি তুমি সত্য বলে থাক, তা হলে তো তোমার ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম। এরপর তারা পানপাত্রগুলো দেখতে লাগল। তারা হতবাক হয়ে দেখল যে, তাদের পানপাত্র ঠিকই আছে। তারা আর বিলম্ব করল না। সকলে মুসলমান হয়ে গেল।

১. আল ইসাবাহ ৮/২৪৮।

চিন্তা করুন, একজন উম্মে শারিকের ধৈর্যের বদৌলতে একটি সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করল। আমাদের জন্য তার মাঝে আছে সুন্দর আদর্শ।

এই বিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীর বুকে নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত
সংগ্রামী জীবনের জীবন্ত উদাহরণ নেই তা নয়। যায়নাব আল গাযালি।
ইসলামী সংগ্রাম সাধনার এক জীবন্ত কিংবদন্তী। তিনি কল্যাণের সুবাস
ছড়াচ্ছেন। পথনির্দেশের আলো ছড়াচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, অচিরেই
আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করবেন। শক্ররা তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে
দিয়েছে। তাকে কারাবন্দি করে রেখেছে দিনের পর দিন, মাসের পর
মাস। তবু তিনি ঈমান ও বিশ্বাসের পথ থেকে বিন্দুমাত্র নড়েননি।
ইস্পাতকঠিন মনোবল, সীমাহীন ধৈর্য, পর্বতপ্রমাণ অটলতা অবিচলতায়
তিনি এখনো টিকে আছেন দাওয়াতের ময়দানে। কারাগারের
বিভীষিকাময় দিনগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন,

"তারা অন্ধাকারাচ্ছন্ন ঘরটি খুলল। ঘর ভর্তি কুকুর। আমার বুক কেঁপে উঠল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। লোহার দরজাটি বন্ধ করে দেওয়ার বিকট আওয়াজ হলো। মুহূতের মধ্যেই চতুর্দিক থেকে আমা শরীরের সাথে কুকুরগুলো যেন সেঁটে গেল। ওদের ঘেউ ঘেউ শব্দ ছি ভয়ানক। কুকুরগুলো আমার সারা শরীরে কামড়াতে শুরু করেছে। আমি আল্লাহ আল্লাহ জপতে লাগলাম। হতভন্ধ হয়ে শুধু বলে চলেছিলাম,

اللهم اشغلني بك عمن سواك، اشغلني بك أنت يا إلهي يا فرد ياصمد أوقفني في حضرتك واصبغني بسكينتك وارزقني الشهادة فيك والحب فيك والرضى بك والمودة لك وثبت الأقدام يا الله أقدام الموحدين

অর্থ: আল্লাহ, আমাকে তোমাতে রত রাখো। আমার আল্লাহ, আমাকে তোমাতে ব্যস্ত রাখো। হে চির একক, হে চির নির্মুখাপেক্ষী, তোমার অনুভূতিতে আমাকে বিভোর করে দাও। তোমার উপলব্ধিতে আমাকে ডুবিয়ে রাখো। মাবুদ, তোমারই তরে শাহাদত নসীব করো। তোমাতে প্রেম দান করো। তোমার সম্ভৃষ্টি জোটাও। তোমার ভালোবাসা দান করো। পদ অবিচল রাখো, আল্লাহ, তোমার একতে বিশ্বাসীদের পদ।...

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। ভেবেছি, খ্যাপা কুকুরেরা আমার সাদা কাপডকে রক্তে লাল করে ফেলেছে।...

দরজা খোলা হলো। আলোর আভাস পেয়ে আমি আমার কাপড়ের দিকে লক্ষ করলাম। কিন্তু, কী আন্চর্য! কাপড় দেখে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারারক্ষীরা যারপরনাই চমকে গেল। কুকুরগুলো আমার কাপড়ই ছিড়তে পারেনি।"

দিন যায়। বছর যায়। বাইরের আলো বাতাস দেখেন না। জেলের শেলের অন্ধকারেই কাটে সময়। সঙ্গী কিছু নয়। কেউ নয়। শুধু আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস।

সময়ের পরিবর্তন হলো। সমাজের পরিবর্তন হলো। তিনি ছাড়া পেলেন। বিশ্বাস ও প্রত্যয় হলো আরও সুদৃঢ়। তিনি এখনো পথ চলছেন। আল্লাহর একত্বের উদান্ত আহ্বান জানাচ্ছেন। মানুষ তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের বিষোদ্যার ও অগ্নি-উদ্গীরণ থেমে নেই। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে?

শায়খ মুরশিদ হাসান হুদাইবির স্ত্রী জেলে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যান। সহিষ্ণু হ্বদয় জানে না ভয়, মানে না বাধা। থেকে থেকে কিছু খাবার, কিছু জামাকাপড় নিয়ে যান। কারা-কর্তৃপক্ষের লোকেরা সার্চ করতে আসে। একদিন এক যুবক অতি উৎসাহে সার্চ করছিল। মনে হচ্ছিল, সে বিশাল কোনো যুদ্ধকর্ম সাধন করছে। তিনি অত্যন্ত স্থৈর্যের সাথে বললেন,

"বেটা, এটা তোমার জায়গা নয়। এটা তোমার কাজও নয়। তোমার জায়গা ছিল রণাঙ্গন। তোমার কাজ ছিল অস্ত্রধারণ। মাতৃভূমি থেকে শক্রদের বিতাড়িত করতে। জন্মভূমির ওপর থেকে লাঞ্ছনাকে অপসারণ

১. আইয়ামুম মিন হায়াতি ৪৭।

করতে। ভিনদেশীদের হয়ে দেশীয় এক মায়ের ব্যাগের আলু-পটোল আর রুটি-পরাটা সার্চ করে কী এমন মহৎ কর্ম করছ, শুনি!"

যুবকটি হতচকিত হলো। অল্পক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। অপারগতার তিজ্ঞতাবোধ তাকেও ব্যথিত করেছে। লজ্জিত চোখে তাকাল। বলল, 'জনাবা, আপনি যথার্থ বলেছেন।'

বানান তানতাভী। জার্মানিতে স্বামীর সাথে দাওয়াতের কাজ করতেন। সেখানে একটি নারীসংগঠনও তৈরি করেছিলেন। তার দাওয়াতি তৎপরতায় অনেক জার্মানি নারী তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। স্বৈরাচারী শাসক তাকে ও তার স্বামীকে নির্বাসিত করেছিল। এই দম্পতির সত্য বলার সাহস স্বৈরশাসককে উৎকণ্ঠায় ফেলে দিয়েছিল। তাই শুধু নির্বাসনকে যথেষ্ট মনে করেননি। দুষ্ট প্রেতাত্মারা তাদের তাড়া করে বেড়িয়েছে এখান থেকে সেখানে, এদেশ থেকে সেদেশে। সর্বশেষ তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন জার্মানির আখন শহরে। স্বৈরাচারী ষড়যন্ত্রজাল সেখানেও পৌছে গিয়েছিল। সাড়ে তিন হাত শরীরের এক মুসলিম বীর—ইসাম আত্তার থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়া পর্যন্ত যেন তাদের ঘুমই হারাম। এক প্রতিবেশিনীর কপালে অন্ত্র ঠেকিয়ে শয়তানের দোসররা ইসামের ঘরে পৌছে গেল। দরজায় কড়া নাড়ল। বানান তানতাভী দরজা খুললেন। ইসাম ঘরে ছিলেন না। তিনি হাসপাতালে। অস্ত্রসজ্জিত তিনজন হায়েনা। কোনো কথা নেই। বানানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। ঘাতকদের পাঁচটি গুলি নিরীহ মুসলিম দাঈয়ার বক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। বানান মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ঝরা তাজা রক্তের ওপর বানানের নিথর দেহটি পড়ে রইল। তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন দেশ থেকে দূরে, প্রিয়জন থেকে দূরে, আপনজন থেকে দূরে। বানান দূনিয়া থেকে চলে গেছেন। কিন্তু তার অমর উক্তি আজও দুনিয়াতে আছে কোটি কোটি মুসলিম নারীর প্রেরণা হয়ে.

১. আল আখাওয়াতৃল মুসলিমাত : ২৫০।

لا تحزن يا عصام ولا تفكر بي ولا في أهلك، تابع طريقك إلى الله بيقين وثبات، إنا لا نطالبك إلا بالموقف السليم ومتابعة جهادك الخالص في سبيل الله لإعلاء راية الحق

অর্থ : দুঃখ করবেন না, হে ইসাম। আমাদের কথা ভেবে চিন্তিত হবেন না। আল্লাহর পথে অবিচল থাকুন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখুন। সত্যকে বিজয়ী করতে আপনার সঠিক অবস্থান এবং আল্লাহর রাস্তায় একনিষ্ঠভাবে জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই আমাদের কাম্য। আমরা আপনার কাছে আর কিছুই চাই না।

আমার ফিলিস্তিনী বোনেরা,

তোমরা ধৈর্য হারিয়ো না। শত প্রতিকূলতায়, শত ঝড়ঝাঁপটায় এই সব দাঈয়া, মুজাহিদা, সাবেরা বোনদের মাঝে আছে আমাদের আদর্শ, আছে সাত্ত্বনা। আমরা প্রতিনিয়ত পরীক্ষায় নিপতিত। আমাদের পবিত্র ভূমিতে কোনো প্রতাত্মা আশ্রয় নিতে পারে না। আমাদের পূণ্যভূমিতে কোনো মিখ্যার উপনিবেশ ঘটতে পারে না। চিরন্তন এ লড়াই চলবেই। সত্যই হবে বিজয়ী। বিজয় হয় সত্যেরই। আল্লাহ তার ধৈর্যশীল বান্দাদেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজয় ও প্রতিষ্ঠার।

আমরা দুআ করি, ফিলিস্তিনের শহীদ বন্দি ও অন্তরীণ পরিবারগুলাকে আল্লাহ যেন রহম করেন। তাদের স্ত্রীদের মায়েদের মেয়েদের বোনদের ইজ্জত-আবরু, সম্মান ও সম্ভ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ধৈর্য ও অবিচলতা দান করেন। তারা অসহনীয় কষ্ট, বিরহ, দহন সহ্য করে চলেছেন অনেকটা কাল। আমরা আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের ধৈর্যের বিনিময় ও প্রতিদান দান করবেন। ঈমান ও বিশ্বাসের মযবুতি নসীব করবেন। শেষ অবধি তাঁর ফায়সালায় সম্ভষ্ট থাকার তওফিক দান করবেন।

মাওয়াকিফু নিসাইয়য়াতৃন মৃশরিকতৃন : ৯০-৯৩।

আমরা আমাদের পবিত্র ভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে গিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের শিকার, গুম-খুনের শিকার, অকথ্য নির্যাতনের শিকার। আমাদের দুধের শিশুদের, অথর্ব বুড়োদের গুলি করে, পুড়িয়ে মারতে ওদের বাধে না। রাতের আঁধারে আমাদের নারীদের গগনবিদারী আর্তচিৎকার আকাশ বাতাশ প্রকম্পিত করে। কিন্তু কোনো সাড়া আসেনা। সাহায্য আসে না। এতিমেরা কেঁদে বুক ভাসায়। হন্য হয়ে খুঁজে ফেরে মাকে, বাবাকে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া নেই। কোথাও কোনো শব্দ নেই।

আমাদের পবিত্র ভূমি বিরান হয়ে চলেছে। গাছপালা, নদীনালা, পশুপাখিও ওদের দৌরাত্য্য থেকে মুক্ত নয়। আমাদের মাদরাসা, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যাংক, শিল্পকারখানা ধ্বংস হয়েছে। বিপদগ্রস্তদের দিকে যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, আমাদের প্রতি তাদের সাহায্যের হাত বিকারগ্রস্ত। সারা পৃথিবীর—পুরো মুসলিম উদ্মাহর—সামনে তারা আমাদের শিশুদের স্বপুকে ধূলিসাৎ করছে, আমাদের হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দিছে। আমাদের কবিরা শোকগাখা রচনা করে। কোমলহৃদয়রা অশ্রু বিসর্জন দেয়। অত্যাচারিত মুসলিমজাতি চেয়ে থাকে আরববিশ্বের প্রতি। ইসলামী বিশ্বের প্রতি। কিংবা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি। কিন্তু কোনো সাড়া নেই। আমি চিৎকার করে ডাক দিলাম। যদি কোনো জীবন্ত মানুষ পাই। কিন্তু আছে কি কোনো জীবন্ত মানুষ? পাবো কি কোনো প্রাণের সাড়া? কবি উমর আবু রিশার কথা মনে পড়ছে,

أمتي هل لك بين الأمم أتلقاك وطرفي مطرق خجلا رب وامعتصماه انطلقت لامست أسماعهم لكنها منبر للسيف أو للقلم من أمسك المنصرم

ملأ أفواه الصبايا اليتم

لم تلامس نخوة المعتصم

অর্থ- আমার জাতি, আছে কি তোমার সম্মান আজকের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা হাজারও জাতির মাঝে? আমি তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখি, আর আমার দৃষ্টি লজ্জায় অবনত। হায় কত মুতাসিম বিদায় নিল! কত আবাল বনিতার আর্তিহ্কার আকাশ বাতাস ভারী করল! কিন্তু তুমি শুনলে না! হায়, তোমার শাণিত কলম, অপ্রতিহত তরবারি কে রুখে দিল! মুতাসিম, তোমার আত্যসম্মান কোথায় বিদায় নিল!

আমাদের শহীদদের প্রতি আসমান জমিন অশ্রুপাত করে। টিলা উপকূল কেঁদে বুক ভাসায়। অত্যাচারীদের বন্দুকের গুলি আমাদের শহীদদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে। তাদের শরীরের মাংসপিওওলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পাথরে কন্ধরে ছিটকে পড়ে। তাদের শোণিতধারায় রচিত হয় জলপ্রপাত। রক্তের নদীতে পবিত্র ভূমির পূণ্য মাটি হয় সিক্ত, তৃপ্ত।

একবিংশ শতকের হত্যাকাণ্ডগুলো কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল। দুঃখ, ক্ষোভ ফিলিস্তিনের আকাশ বাতাসকে ভারী করেছে। ফিলিস্তিনের মাটি ও মানুষ শোকের সাগরে মুহ্যমান। ফিলিস্তিনের প্রতিটি ধূলিকণায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জিহাদের আহ্বান—ভেঙে দিতে ওদের বিষদাত, ফিরিয়ে দিতে ওদের কালো থাবা।

এত অত্যাচার ও নির্যাতনের পরও ফিলিস্তিনীরা দমেনি। এরা দমে না। দমবে না। যত কষ্টই দাও, যত অত্যাচারই কর, আমাদের ঈমান, আমাদের বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারবে না। যত গুলি আছে, করো; যত বোমা আছে, মারো; সত্যের ওপর আমাদের অটলতা, সত্যের ওপর আমাদের অবিচলতা কমবে না। বাড়বে; বাড়ছে।

আমরা জানি, সূর্যই হাসে শেষ হাসি; রাতের গভীরতাই দেয় দিনের আগমনী বার্তা। আমরা বিশ্বাস করি, এই অন্ধকার কাটবেই; এই অমানিশা দূর হবেই। ফিলিস্তিনের মায়েদের কান্নার অবসান হবেই। ফিলিস্তিনের মেয়েদের মুখে বিজয়ের হাসি ফুটবেই। অচিরেই আল্লাহ সাহায্য করবেন মর্দে মুমিন মুজাহিদদের। বিজয়ী করবেন তাদেরকে সুস্পষ্ট বিজয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

ফিলিস্তিন তার পূণ্যবান সন্তানদের হারিয়ে শোকাহত। তারা অতি তুচ্ছভাবে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর রাহে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এঁকে দিয়ে গেছেন ত্যাগ ও তিতিক্ষার চিত্র, লিখে দিয়ে গেছেন জিহাদের আহ্বান, দেখিয়ে দিয়ে গেছেন বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অপূর্ব নমুনা। তাদের এ আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল। প্রেরণা যোগাবে যুগের পর যুগ, শতান্দীর পর শতান্দী। দুর্বার এই বীর লড়াকুদের বীরত্বগাথা স্মৃতিময় হয়ে থাকবে জাতির কাছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম—কৃতজ্ঞতার সাথে, কৃতার্থতার সাথে।

উড়ে এসে জুড়ে বসা বুনোদলের অনধিকার অবরোধ, অহেতুক অশান্তির বিরুদ্ধে—তাদের নির্যাতন, নিপীড়ন, নিম্পেষণের বিরুদ্ধে— এদেশের মানুষ যে সংগ্রাম সাধনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তা অটল পর্বতের ন্যায় দুর্লঙ্ঘ। তারা যে জিহাদি ঝাগু উত্তোলন করেছেন, তা কখনো অবদমিত হবে না, হবার নয়।

হে শহীদ-বন্দীর মা জননী, হে শহীদ-বন্দীর জীবনসঙ্গিনী,

স্বয়ং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দান করুন। তোমাদের সান্তুনা জানাব কোন ভাষায়? পৃথিবীতে আছে কি কোনো ভাষা, যে ভাষায় তা সম্ভব? কিন্তু খাওলা, খানসা, সুমাইয়া, নাসিবা রাযিয়াল্লাহু আনহুনার গৌরবময় ত্যাগের মহিমা আজও যদি পুনরাবৃত্ত হতে পারে, সেই অনুপম কাহিনী আজও যদি মুসলিম ইতিহাসকে নতুন আবেগে আন্দোলিত করতে পারে, তবে তা—আল্লাহর কসম—তোমাদেরই মতো নারীদের কল্যাণে।

৮. চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ وَانْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبُ الْفَلا تَعْقِلُونَ

অর্থ : তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের আদেশ দাও, আর নিজেদেরই ভূলে থাক; অথচ কিতাবও তেলাওয়াত কর? তোমাদের কি আকল নেই? –সুরা বাকারা : 88

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوالِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, কেন তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না? তোমরা এমন কিছু বলবে যা তোমরা কর না—এটা আল্লাহর কাছে খুবই কঠিন শান্তিযোগ্য অপরাধ। –সূরা সফ : ২-৩

দাঈয়াকে অবশ্যই উত্তম ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হতে হবে। আমল আখলাকে ধর্মীয় অনুশাসনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন থাকতে হবে। নামায রোযা হজ যাকাত ইত্যাদি ফরজ ওয়াজিব ও নফলেরও পাবন্দি করতে হবে। পর্দার ব্যাপারে হতে হবে সচেতন। শরঈ শর্ত সমেত পালন করতে হবে পূর্ণাঙ্গ পর্দা। বেপর্দা চলবে না। মাহরাম ছাড়া কারও সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।

আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক নারীকে দেখা যায়, যারা জিলবাব হিজাব ইত্যাদি পর্দার পোশাকগুলো ব্যবহার করেন ঠিকই; কিন্তু হাত মুখ চোখে কৃত্রিম সজ্জা গ্রহণ করে পরপুরুষের সামনে যান। আবার পর্দা করারও দাবি করেন। অথচ মেকআপ, ভ্রুপ্লাক, লিপস্টিক কিছুই বাদ রাখেন না। এভাবে ইসলামের নামে ইসলামের ক্ষতিসাধন হয়। বরং ইসলামের অবমাননা হয়। শুধু অন্যরা নয়, অনেক মুসলিম মেয়েও বিভ্রান্তির শিকার হয়।

যিনি সত্যিকারের দাঈয়া হবেন, অন্যের প্রতি তার আচরণ হবে অমায়িক। আচরণে উচ্চারণে কাউকে কষ্ট দেবেন না। সরবতা হবে তাসবীহ, নীরবতা হবে তাফাককুর ও হিকমাহ। মুখের ভাষা, শরীরের ভাষা হবে আল্লাহর হামদ ও ছানায় নুরানী।

এই মূল্যবোধগুলো যখন একজন দাঈয়ার মনে প্রাণে গেঁপে যাবে, তখনই তার দাওয়াত সার্থকতা পাবে। অটলতা ও অবিচলতা লাভ করবে। কেননা, তখন তার অবস্থা এমন হবে যে, তিনি যা করতে বলেন তা নিজেও করেন; এবং যা ছাড়তে বলেন তা নিজেও ছাড়েন।

কবি বলেন,

لَا تَنْهَ عَنْ حَلْقِ وَتَأْتِيْ مِثْلَهُ عارٌ عَلَيْكَ إذا فَعَلْتَ عَظِيْمٌ

তুমি এমন কিছু ছাড়তে বোলো না, যা নিজেই কর; এমনটা যদি কর, তো এ বড় লজ্জাজনক ব্যাপার। শায়খ আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রাহ, বলতেন,

مَا بَلَغَ الحَسَنُ البصريُّ إِلَى مَا بِلَغَ إِلا لِكَوْنِهِ إِذَا أَمرَ الناسَ بشيءٍ يَكُونُ أَسْبَقَهُمْ إِلِيهِ وإذا نَهَاهُمْ عنْ شيءٍ يكون أَبْعَدَهُم عنه

অর্থ : হাসান বসরী যে এত উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছিলেন এই একটাই কারণ ছিল—তিনি যখন কোনো কিছু করার উপদেশ দিতেন তখন নিজেই সবার আগে তা পালন করতেন। আবার যখন কোনো কিছু ছাড়ার উপদেশ দিতেন, তখনো নিজেই সবার আগে তা ছেড়ে দিতেন।

সুতরাং আপনি যদি আপনার দাওয়াতে মানুষকে প্রভাবিত করতে চান, যদি চান আপনার দাওয়াত ক্রিয়াশীল হোক, সার্থকতা লাভ করুক; তা হলে হৃদয়াত্মার পবিত্রতা অর্জন করুন, তাকওয়া তাহারাতের গুণে গুণান্বিত হোন, চিন্তা চেতনাকে স্বচ্ছ সুনির্মল করুন। দাওয়াতের প্রেরণা অনির্বাণ শিখা হয়ে জ্বলে উঠবে আপনার অন্তরে। মানুষ আপনার দাওয়াত কবুল করবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের প্রেরণায় সম্মোহিত হয়ে। আপনার একনিষ্ঠতায় প্রতিটি হৃদয়ে জেগে উঠবে পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি।

দেখুন না, একটি সুন্দর কথার কত সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আপনার আমার আল্লাহ পবিত্র কুরআনে,

الَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي التَّالَ

تُؤْتِنَ أَكُلُهَاكُلُّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ويضرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ

অর্থ : তুমি কি দেখনি, আল্লাহ কেমন উদাহরণ দেন একটি ভালো কথার! যেন তা একটি ভালো গাছ। যার শেকর জমিনে গাড়া। আর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত আসমানব্যাপী। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফল দান করে প্রতিনিয়ত। আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণ দেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। –সূরা ইবরাহীম: ২৪-২৫

আত্মসমালোচনার যোগ্যতা অর্জন করুন। নিজেই নিজের পরীক্ষা নিন প্রতিনিয়ত—ঈমানের পরীক্ষা, ইখলাসের পরীক্ষা। নিজেই নিজেকে যাচাই করুন সব সময়—দোষ-গুণ, ভালো মন্দ। মনে রাখবেন, আল্লাহ যখন কোনো মুমিনের কল্যাণ চান, তখনই তাকে নিজের দোষ ক্রটি উপলব্ধি করার সক্ষমতা দান করেন। তাই আত্মপ্রশান্তিতে ভোগা মুমিনের কাজ নয়।

এ বিষয়টি হ্বদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন যে, আপনি মুসলিম নারীসমাজের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি। তা ছাড়া, অনেকেই আপনাকে অনুসরণ করবে। তাই নিজের ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে উদাসীন হবেন না। আপনার ওপর আল্লাহপ্রদত্ত বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কবি বলেন

> قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن تقعد مع الهمل

একটু বুঝতে চেষ্টা করো, তোমার ওপর অর্পিত হয়েছে বিরাট দায়িত্ব । তাই বসে ব.স অশ্রুবিসর্জন দিয়ে সময় ফুরিয়ো না। প্রিয় বোন,

নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করুন যেন সম্ভাব্য সবকিছুতে আপনার আদর্শ সমুজ্জল হয়ে থাকে আপনার চারপাশের নারীসমাজের জন্য। আপনি যদি কারও জীবনসঙ্গিনী হয়ে থাকেন, তা হলে একজন সত্যিকারের সম্পূর্ণা মুসলিম রমণীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। নিজেকে এমন একজন স্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন করুন যিনি সতীসাধ্বী। যিনি জীবনসঙ্গীর প্রতি কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ; একনিষ্ঠ, আন্তরিক; একজন বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহযোগী; সুখে দুখে সাথে থাকেন; দায়িত্ব কর্তব্যে পাশে থাকেন; জীবন ও জগতের টানাপোড়েনে স্বামীর প্রশান্তি; দাওয়াত ও তাবলীগের মশালবহনে স্বামীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।

আপনি যদি কোনো সন্তানের জননী হয়ে থাকেন, তা হলে আপনিও হতে পারেন একজন সচেতন দায়িত্বশীল গৃহিণী। আপনার মন্তকেও শোভা পেতে পারে সত্যিকারের রত্নগর্ভার তাজ। আপনার ঘর হোক ইলম ও আলোর মিনার। আপনার ছেলেমেয়ে হোক তাকওয়া পরহেজগারির অনন্য উদাহরণ। ইলমের অন্বেষণে তাদের মেহনত মোজাহাদা হোক প্রশংসনীয়। তাদের জ্ঞান ঈমান হোক আগামী প্রজন্মের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অর্জনের প্রেরণা। তাদের সাধনা আরাধনা ফিরিয়ে আনুক ইসলামের হারানো গৌরব। ইসলাম ও মুসলমানকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করুক আপন মহিমায়।

ভাগ্য যদি আপনাকে শিক্ষিকার আসনে সমাসীন করে, আপনি যদি হন মানুষ গড়ার কারিগর, তা হলে স্বরূপ তুলে ধরুন প্রকৃত মুমিনার। আপনার সুগভীর একনিষ্ঠতা, নিরন্তর কর্মোদ্দীপনা, সম্রদ্ধ নিয়মানুবর্তিতা, সৃক্ষ সময়সচেতনতা, অগাধ কর্তব্যপরায়ণতা যেন সদাসর্বদা শুদ্র সমুজ্জ্বল হয়ে থাগে আপনার প্রতিটি বিদ্যার্থিনীর মনে প্রাণে।

আপনি আপনার ছাত্রীদের ধর্নীয়ে জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করুন। ধর্মের প্রতি তাদের মনে গভীর ভক্তি ও শ্রন্ধাবোধ সৃষ্টি করুন। আপনি যদি ধর্মশিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত নাও হন, তবু একজন দাঈয়া হিসেবে তাদের ধর্মীয় চেতনাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। বিশেষত আজকের আধুনিক পৃথিবীতে নিত্যনতুন বিষয়় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্চিতে এবং কর্মস্চিতে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর মূল্যায়ন, এগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ এবং শিক্ষার্থীদের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের দায়িত্ব সর্ব দিক থেকে আপনারও ওপর বর্তায়।

আজকাল বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্চি এবং কর্মস্চিতে এমন অনেক বিষয় ঢোকানো হচ্ছে, যেগুলো স্পষ্টত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কেউ তো এমন হবেন, যিনি এগুলোর প্রতিবাদ জানাবেন, এসব বিষয়ে সোচ্চার হবেন। অন্তত মুসলিম মেয়েদের চিন্তা চেতনাকে এসব বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে মনোযোগী হবেন।

সমাজসেবা, সামাজিক সচেতনতামূলক প্রচারণা, সাংস্কৃতিক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপাতমধুর শ্লোগানে, দৃষ্টিনন্দন ব্যানারে মেয়েদেরও মাঠে নামানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী মূল্যবোধ হয় উপেক্ষিত। এমনকি, এসবে ছেলেদের অনুপ্রবেশ ও উচ্চ্ভ্রুলতাও লজ্জাজনকভাবে পায় আশকারা।

আবার মেয়েরা সামাজিকভাবে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে সেগুলোর সমাধান দেওয়া হয় উদ্ভট সব চিন্তার আলোকে। মনে হয়, এসব নিয়ে তারাই প্রথম ভাবতে বসেছেন। ধর্মে এ নিয়ে কোনো কথা নেই। প্রায়ই নারীসম্পর্কিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা ও সমাধান আসছে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাদ দিয়ে। মেয়েরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে ধর্ম ও জীবনের মাঝে সমন্বয় খুঁজে পেতে। ধার্মিক মেয়েরা হচ্ছে হীনম্মন্যতার শিকার।

প্রসঙ্গত, আজকাল শরীরচর্চার অনেক শিক্ষিকাই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। মেয়েদের পর্দাব্যবস্থা নিয়ে ভাবেন না। অনেক সময় শিক্ষিকা অযথাই ছাত্রীদের জিলবাব খুলতে বাধ্য করেন। পরিবেশ পরিস্থিতির তোয়াক্কা করেন না। এমনকি, নাম্বার কাটারও হুমকি দেন। এই যদি হয় আরববিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা তা হলে অন্যদের সম্পর্কে কী বলা যায়?

এরকম আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলোতে সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন একজন নিঃস্বার্থ নির্ভীক দাঈয়ার। যিনি অকপটে এগুলোর গঠনমূলক সমালোচনা করবেন। মুসলিম মেয়েদের ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবধারার ওপর অটল অবিচল থাকতে প্রেরণা ও প্রণোদনা যোগাবেন। যারা মুসলিম মেয়েদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে চায়, মেধা দিয়ে শ্রম দিয়ে তাদের সক্ষম মোকাবেলা করবেন।

এভাবে আল্লাহ যদি আপনাকে চিকিৎসা-সেবার যোগ্যতা দান করেন, তা হলে মানবতার এ মহান পেশায় হালাল হারামের বিধান মেনে চলুন। আন্তরিকভাবে রোগীদের সেবা-শুশ্রুষা দিন। মেয়েলি বিষয়গুলোতে বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। কেননা, মহিলা-ডাক্তার তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। মুসলিম নারীসমাজ আপনার দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন বেশি। এভাবে চিকিৎসা-সেবায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকেও প্রাধান্য দিন। উদাহরণত:

- হাদয়ের গভীর থেকে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করুন এবং রোগীকেও বিশ্বাস করান যে, আরোগ্য আল্লাহর হাতে। অষুধপথ্য বাহ্যিক উপকরণমাত্র।
- ২. দায়িতৃপালনে ব্রতী হোন। গভীরভাবে উপলব্ধি করুন যে, আল্লাহ আপনাকে মুসলিমসমাজের সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত রেখেছেন সুতরাং মেধা শক্তি সর্বস্ব ব্যয় করে মুসলিম সমাজের শরীরসন্তাকে এবং হৃদয়সন্তাকে সংক্রামক ব্যাধি এবং সংহারক জীবাণুর ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হোন
- ৩. রোগীদের সাথে অমায়িক ব্যবহার করুন। দয়াপরবশ হোন। সাধ্যমত চেষ্টা করুন তাদের অন্তরে আশার আলো জ্বালাতে। তাদেরকে আল্লাহমুখী হতেও সহায়তা করতে পারেন আপনি।
- আমানতদারিতার পরিচয় দিন। তথু কর্তব্যে নয়। রোগীদের গোপনীয়তার বিষয়েও। অনেকেই এখানে অসচেতনতার শিকার। ফলে রোগীদের অসম্মান হয়। নিজের ব্যক্তিত্বও হয় প্রশ্নবিদ্ধ।
- ৫. নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উত্তর-উত্তর উন্নতিসাধনে সচেষ্ট
 হোন। ধর্মীয় ব্যাপারেও। চিকিৎসার ব্যাপারেও। এভাবে মূলে পৌছার

চেষ্টা করুন। বিধর্মীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানভাগুরেও হাত দিতে পারেন। কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ।

৯. হালের কথা জানুন

দাঈয়াকে অবশ্যই সমসাময়িক আলোচিত সমালোচিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। পত্রপত্রিকাগুলোতে এখন ইসলাম-বিরোধী অনেক লেখালেখি চলছে। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ইসলাম-বিদ্বেষ অনেক লেখক ও পত্রিকারই অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অনেক চিন্তাকর্ষক নিরীহ শব্দের ছ্মাবরণে এসব লেখালেখি চলে। তাদের ভুলভাল ব্যাখ্যা, মনগড়া বিশ্লেষণ, স্পষ্ট মিখ্যাচার ও প্রকাশ্য ধর্মবিদ্বেষ সরলপ্রাণ মুসলমানের ঈমান ও আকীদার জন্য একেকটা মরণফাঁদ রচনা করছে।

ইসলাম সম্পর্কে যাদের তেমন ধারণা নেই, বা ধর্মীয় ব্যাপারে অনাগ্রহী, তারা প্রায়ই এসব দৃষিত চিন্তা-চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। দাঈয়া যদি এসব বিষয়ে উদাসীন থাকেন তা হলে দাওয়াতি কার্যক্রম সফলতা লাভ করা কঠিন। বিশেষত শিক্ষিতমহলে, শিক্ষাঙ্গন-পরিবেশে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বিভিন্ন মাদরাসা, জামিয়া, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় দাওয়াতের মেহনত চালু রাখতে হবে। মুসলিম মেয়েদের ঈমান আকীদার হেফাজতের জন্য দাঈয়াদের অবিরাম সাধনার প্রয়োজন। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো, কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শিক চেতনাগুলো সব সময় তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এটাকে কোনো মৌসুমি কাজ বানানো যাবে না। এটা সব সময়ের কাজ। নির্দিষ্ট কোনো সময়ে দাওয়াতের কাজ হলো, অন্য সময় বন্ধ থাকল এমনটা হলে চলবে না। সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ সব সময় সবখানে থাকতে হবে।

বিভিন্ন মুসলিম ও আরব দেশে দেখা যায়, শুধু নির্বাচনী সময় ও এলাকাগুলোতে দাওয়াতি কাজ হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দাওয়াত সরগরম হয়ে ওঠে। কিন্তু এরপর থেমে যায়। যেন দাওয়াত শুধু ওই সময় ও ওই এলাকার সাথেই সীমাবদ্ধ। দাওয়াতের জন্য সার্বক্ষণিক তৎপরতা চাই। সাময়িক তৎপরতার সুফলও সাময়িক। আপনি যদি দাওয়াতের মেহনতে সফল হতে চান, তা হলে অবশ্যই আপনার পূর্ববর্তী দাঈয়াদের সাথে কথা বলুন, সময় দিন। তাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই আপনার উপকারে আসবে। বিশেষত উলামামহল ও ধর্মীয় ক্ষলারদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিক-নির্দেশনা অবশ্যই কাম্য। সরাসরি তাদের দ্বারা পরিচালিত কোনো উদ্যোগ থাকলে তো খুবই ভালো। তা না হলে, অন্তত তাদের লিখিত দাওয়াত ও তাবলীগের উস্ল ও আদাব সম্পর্কিত লেখাগুলোকে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করুন।

আপনি যেসব ছাত্রীদের ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেবেন, তাদের প্রত্যেকের অন্তরে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা মুসলিম উম্মাহর সফলতার অপরিহার্য উপাদান। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

অর্থ : হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো—সত্যিকারের ভয় করা। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না। তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরো সকলে। তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহের কথা, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শক্র, তখন তিনিই তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করলেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই। তোমরা ছিলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলি ব্যক্ত করেন। হয়তো তোমরা দিশা পাবে। তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল যেন এমন থাকে যারা সং

কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজের নিষেধ করে। আর তারাই সফলকাম। –সুরা আলে ইমরান : ১০২-১০৪

তাহলে প্রথমে অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন করতে হবে।
তারপর আল্লাহর সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তারপর
মুমিনদের মধ্যে ঈমানের বন্ধন গড়ে তুলতে হবে। এই তিনটি কাজ পূর্ণ
হলে ন্যায় ও সত্যের ওপর একে অপরের সহযোগিতার ভিত্তিতে ঈমানী
ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে।

মুমিন মুমিনের জন্য মজবুত দুর্গের মতো। একে অপরকে শক্তি যোগাবে। এ বন্ধন অটুট থাকবে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পরও। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আল্লাহর জন্য, যারা একে অপরকে ভালোবাসে তাদের অন্তরকে প্রাণবন্ত রাখে। তাদের জন্য সময় ও স্থানের দূরত্ব কোনো বাধা হতে পারে না। হযরত উমর ইবনুল খাতাব রাথি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنَّ مِنْ عِبَادِ الله أنَاسًا مَا هُمْ بأنبياءَ ولاشُهداءَ يَغْبِطُهُمُ الأُنْبِيَاءُ والشُهداءُ لِمَكَانَتِهِمْ عندَ الله تعالى. قيل : أخيرْنَا يا رسول الله مَنْ هُمْ ؟ ومَا أَعْمَالُهُمْ ؟ فَلَعَلَنَا نُحِبُّهُمْ . قال : أولئك قومٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ عَلى غَيْرِ أَرْحَامٍ تَرْبُطُهُمْ، ولا أَمْوَالٌ يَتَعَاطُونَهَا، فوالله إنحُمْ لَعَلَى نُورٍ وإنحُمْ لا يَخَافُونَ إذا حَافَ الناسُ ولا يَحْزَنُونَ إذا حَزِنَ الناسُ الله يَوْرُونَ إذا حَزِنَ الناسُ

إَهُمْ لَعَلَى نَوْرٍ وَإِهُمْ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَخْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ثَمْ تَلَى قُولُهُ تَعَالَى : أَلَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللهِ لَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ অৰ্থ: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নবীও নয় শহীদও নয়; কিন্তু নবী ও শহীদগণও তাদের মর্যাদার প্রতি ঈর্ষাবোধ করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের বলুন, তারা কারা? আমরা যদি তাদেরকে ভালোবাসতে পারি। তিনি বললেন, এরা এমন কিছু মানুষ যারা একে অপরকে ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্য। না আত্মীয়তার বন্ধন তাদের আবদ্ধ রাখে, না তাদের মধ্যে কখনো আর্থিক

লেনদেন হয়। আল্লাহর কসম, এরা আলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন মানুষ ভয়ে ভীত থাকবে তখনো এরা ভীত হবে না। যখন মানুষ দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকবে তখনো এরা চিন্তিত হবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

الاّ إِنَّ أَوْلِيَآ ءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থ : শোনো, আল্লাহর বন্ধুদের না কোনো ভয় থাকবে, আর না তারা চিন্তিত হবে। –সূরা ইউনুস : ৬২।

১০. চাই প্রিয় নেতৃত্ব

দাঈয়াকে হতে হবে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। সাধারণ নারীদের চাইতে আলাদা গুণে বিশিষ্ট। পরিচালনা, উদ্যম, সার্বক্ষণিক পরিশ্রম, কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান, জাগতিক বিষয়ে সৃক্ষ অন্তর্দৃষ্টি, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।

একজন সফল দাঈয়াকে ক্ষুদ্রতার উর্ধের্ব উঠতে হবে। যথাযথ কথোপকথন ও প্রয়োজনে শালীন বিতর্কে পারদর্শিনী হতে হবে। দান খয়রাত ও সাহায্য সহযোগিতার হাত হতে হবে প্রসারিত। তিনি হবেন সহনশীলতা, ক্ষমা-মার্জনা ও মহত্বের প্রতিবিদ্ব।

দাঈয়ার চিন্তা চেতনা ও কাজ কর্ম হবে ভারসাম্যপূর্ণ। পর্যায়ক্রমতা ও গুরুত্বপূর্ণতা অনুসারে। সুতরাং তার কর্তব্যের সূচিপত্রে প্রথমেই আসবে স্বামীর আনুগত্য ও দাস্পত্যজীবনের অধিকার আদায়ের বিষয়টি। তারপর আসবে সন্তান-লালনপালন ও পরিবারজীবনের দায়িত্বপালনের বিষয়টি। এরপর আসবে দাওয়াতি কাজ।

সফল দাঈয়া অনুসরণ করবেন একটি যৌক্তিক, সমন্বিত কর্মবন্টননীতি। এজন্য তিনি তার মূল্যবান সময়গুলোকে ভাগ করে নেবেন। যাতে একজন স্ত্রী হিসেবে, একজন মা হিসেবে, একজন গৃহিণী হিসেবে তার ওপর যে মৌলিক দায়িতুগুলো বর্তায় সেগুলোর মাঝে এবং

১. তিরমিয়ী (হাসান, সহীহ)।

দাওয়াতি কাজের মাঝে সুন্দর সমন্বয়সাধন হয় সম্ভবপর। তা না হলে, নারীর যে কোনো কাজই—চাই সেটা দাওয়াতের মতো মহৎ কর্মই হোক বা আজকালকার টুকিটাকি চাকরিবাকরিই হোক—পরিবারজীবন ও দাম্পত্যজীবনের মূল ভিত্তিকে ভীষণভাবে আঘাত করবে। যার অনিবার্য ফল হবে সন্তানদের অধিকার লঙ্খন। এমন চাকরিবাকরি তো দূরে থাক, এমন দাওয়াতি কর্মও কোনোভাবেই প্রশংসিত হতে পারে না।

যাই হোক, কথা বলছিলাম দাঈয়ার নেতৃত্বের গুণ প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ এবং পরবর্তী মুসলিম নারীগণের জীবনাদর্শে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করছি হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন সাকান রাযি.-এর নাম। তাঁকে বলা হতো নারী বক্তা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশুদ্ধভাষিণী। আল্লাহর রাস্তার এক গর্বিত মুজাহিদা। ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নয়জন রোমসৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নারী সাহাবীদের মধ্যে পালন করতেন অগ্রদূতের ভূমিকা। তিনি নারীদের মতামত নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাাল্লামের দরবারে যেতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাাল্লাম তার বক্তব্য উপস্থাপনে মুগ্ধতা প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমন্তার অধিকারিণী।

বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীদের মধ্যে বসা ছিলেন। হযরত আসমা রাযি, বললেন,

'আপনার প্রতি আমার মা বাবা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার নারী সাহাবীদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। আমি এই মুহূর্তে আমার পেছনে থাকা মুসলিম নারীদের প্রেরিত দূত। আমি যা বলছি, প্রত্যেকে তা-ই বলছে। আমার যা মত, প্রত্যেকেরই তা-ই মত। আল্লাহ আপনাকে নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনাকে অনুসরণ করেছি। আমরা নারীরা অন্তঃপুরবাসিনী, পর্দানশীন; গৃহিণী। স্বামীসেবা আমাদের কাজ, সন্তান-লালনপালন আমাদের কর্তব্য। পক্ষান্তরে পুরুষরা আমাদের থেকে এগিয়ে। তারা দলবদ্ধ হয়ে কাজ

করে। জামাতে নামায পড়ে। রোগীদের দেখাশোনা করে। জানাযায় অংশগ্রহণ করে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তারা যখন জিহাদে বের হয়, তখন আমরা শুধু তাদের ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করি। কাপড় বুনি, ধুই। ছেলেমেয়ে মানুষ করি। হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি পুরুষদের সমান আজর ও সওয়াব অর্জন করতে পারব?'

রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগ্ধ হয়ে সাহাবা কেরামের দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন:

'আমার সাহাবীরা, এর আগে তোমরা কি কোনো নারীর মুখে ধর্মীয় বিষয়ে এরচেয়ে সুন্দর প্রশ্ন শুনেছ?'

সাহাবীগণ আরজ করলেন:

'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমরা তো ভাবতেও পারিনি যে, কোনো নারী এভাবে ভাবতে পারে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আসমাকে লক্ষ্য করে বললেন্

'আসমা, তুমি ফিরে যাও, তোমার পেছনে থাকা আমার নারী সাহাবীদের জানিয়ে দাও, জীবনসঙ্গীর হক আদায় করা, তার মন রক্ষা করে চলা এবং তার আনুগত্য করা—এ পর্যন্ত পুরুষদের যত মর্যাদার কথা তুমি বললে সবগুলো থেকে—(আজর, সওয়াব ও কল্যাণের দিক থেকে) কোনো অংশে কম নয়।'

১. বানাতুস সাহাবা : ৭৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নারী এবং দাওয়াহ: আধুনিক অঙ্গন

রিসালাত যুগের সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সর্ব যুগেই পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করেছে। দাওয়াতি তৎপরতায় নারীদের সরব উপস্থিতি ছিল ধর্মীয় নীতিমালা এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনের ভিত্তিতে। তাদের কার্যকর অর্থবহ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজ-জীবনের ধারাপ্রবাহে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, উম্মে সালিম, উম্মে শারিকের মতো অগণিত নারী সাহাবীর দাওয়াতি তৎপরতায় কারও ভাই, কারও স্বামী, এমনকি, কারও পুরো সম্প্রদায়ই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু মুসলমানদের পতন এবং ইসলামী খেলাফতের অবসানের ফলে মানুষ অনেক কাল ন্যায় ও সাম্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মনগড়া ধর্মহীন জীবনব্যবস্থা মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঠেসে ফেলেছে। মানবজীবনে নেমে এসেছে অস্থিরতা, অশান্তি। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী কাফেরসম্প্রদায় যত কূটকৌশলই করুক, ষড়যন্ত্রের যত জালই বুনুক, শেষ অবধি আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় এবং হয়েছে। যুগে যুগে মহান আল্লাহ এমন কিছু মানুষ প্রদা করেছেন, যারা সত্যিকারের ঈমানের বলে বলীয়ান, যাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বে জাতি দিশা পায়। পথ পায় ঈমানের, ইসলামের।

তাদের জীবন্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিবেদিতপ্রাণ চির-তরুণের এগিয়ে এসেছে—আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার সুগভীর আবেগ আর অফুরন্ত উদ্দীপনা নিয়ে। ঈমানি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রজ্জলিত করেছে আলোর মশাল, আকাশের বুকে উঁচু করে তুলে ধরেছে হেলালি ঝাণ্ডা; যেন ঘোর অমানিশায় পথহারা মানুষ পায় পথের সন্ধান, ফিরে আসে সহজ সরল পথে—ইসলামে।

চির-সুন্দর শাশ্বত আলোর কাফেলায় নারীদেরও ছিল অংশগ্রহণ।
নারী-সমাজেও জ্বলে উঠেছিল 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল
মুনকার'-এর অনুপম চর্চা। বিশ শতকের অনভিপ্রেত ইসলামী বিপ্রব
সফলতার মুখ দেখেছিল। নেপথ্যে ছিল ইসলামী পুনর্জাগরণের
প্রেরণাদানকারী সুদুরপ্রসারী কিছু কর্মশালা ও পাঠপরিক্রমা।

কার্যক্রমের সর্বপ্রধান মূলনীতি ছিল পর্যায়ক্রমতা ও ধারাবিন্যাস। এটা একটু একটু করে পরিবারজীবনে এবং সমাজ-জীবনে এনেছিল বিপ্রব। প্রথমে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস, বৈধাবৈধ বিষয়বস্তু, উত্তম চরিত্রমাধুরী ছিল দাওয়াতের মূল কথা যা মুসলিম নারীকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করে, ধর্মীয় চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিকে শাণিত করে।

আলোচ্য পর্যায়টি অতিক্রম করার অব্যবহিত পরেই মুসলিম দাঈয়াগণ পরবর্তী পদক্ষেপটি গ্রহণ করলেন। তারা ধর্মবিশ্বাসের প্রতিস্থাপনের পর ধর্মের দাবির বাস্তবায়নে ব্রতী হলেন। কর্মভিত্তিক নারী-উপাদানগুলো নির্দিষ্ট করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মাচারের সমন্বয়ে মনোযোগী হলেন। ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিনিষেধকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করতে ব্যাবহারিক ও বাস্তব অনুশীলনের আহ্বান জানালেন। ফরজ ওয়াজিবের পাশাপাশি সাধ্যমতো নফলে উদ্বৃদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। যেমন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল রোযা রাখা, দান-সদকা ও খায়রাত করা, চাশত-তাহাজ্জুদ নামায পড়া ইত্যাদি। এভাবে মুসলিমসমাজের অবক্ষয় অবনতি, ধর্ম থেকে বিচ্যুতি, ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধ্বস—ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা; সমাধান ও প্রতিকারের জন্য বিরাজমান পরিস্থিতি রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে ভালোমন্দ পর্যালোচনা করা এবং করণীয়গুলো নির্ধারণ করে মাঠে

নামা। এ ধরনের আরও অনেক সুদূরপ্রসারী বিষয় ছিল সেই সব কর্মশালা ও পাঠপরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত।

আঞ্জাম পেলে ফলপ্রসূতা অনিবার্য। দাঈদের শ্রম পার্থিব অপার্থিব উভয় বিচারেই সার্থক। কেননা, এর ফলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হিতাকাজ্ফার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিস্বার্থ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও প্রবৃত্তির অনুগমন দূর হয়।

বাস্তবেও একনিষ্ঠতার সাথে প্রাজ্ঞ পরিকল্পনামাফিক দাওয়াতি কর্মকাণ্ড

সাহ হয়। ব্যাক্তরাব, আত্মবেশস্থাবিত অধ্যক্তর অনুসমন দূর হয়। আনুগত্যের যোগ্যতা তৈরি হয় প্রথমে আল্লাহ ও রাস্লের আনুগত্য, এরপর মুসলমানদের দায়িতুশীলদের আনুগত্য। এটা নারী এবং পুরুষ

উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

ওই সময় ইসলামের পুনর্জাগরণে এক ও অভিন্ন সর্বজনীন দাওয়াত-

ব্যবস্থাই ছিল প্রত্যাশিত। নারীদের দাওয়াতি কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হতো একই উৎস থেকে। তাই জরাগ্রস্ত সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে ইসলামের বিপ্রবসাধনে মুসলিম নারীসমাজের ছিল গৌরবময় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ। যার আরও একটি গৌণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ সুফল ছিল মুসলিমসমাজের নারীদের প্রতি অপরাপর জাতি ও সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিত পরিবর্তন। তাদের ই্শ হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম নারীর জীবন কতটা সফল সার্থক; তারা কতটা স্বকীয়, স্বাধীন, স্বনির্ভর; সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে তাদের ভূমিকা কতটা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী; মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত ধর্মের মৌল অনুশাসনের ছায়য় তারা আদৌ সচল না অচল।

বর্তমানেও ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণে অনেক কাজ হচ্ছে। বিভিন্ন কল্যাণমূলক, কর্মসংস্থানমূলক, উপদেশ ও পথনির্দেশমূলক অনেক সংস্থা ও সংগঠন তৈরি হচ্ছে। সভা-সেমিনার ও বিতর্কের আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু এগুলোর কর্ম ও পদ্ধতিগত ভিন্নতার সাথে সাথে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত এবং চেতনা ও আদর্শগত প্রভেদ সফলতার ক্রমধারাকে ব্যাহত করছে

কোথাও জীবন ও কর্মমুখী বিভিন্ন কাজ যেমন সেলাই, বুনন, ফুল-তোলা, অ্যামব্রয়ডারি; সিরামিক, আর্ট, নার্সিং, রান্না ইত্যাদি শেখানো

পদে পদে।

ফিরে এসো নীড়ে

তোলা, অ্যামব্রয়ডারি; সিরামিক, আর্ট, নার্সিং, রান্না ইত্যাদি শেখানো হচ্ছে। এমন অনেক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে যা জীবন ও জীবিকার সাথে

199

সরাসরি সম্পর্কিত। উদ্দেশ্য হলো, এভাবে সর্ব মহলের নারীদের ওঠাবসা হবে এবং ভিতরে ভিতরে ইসলামী দাওয়াত প্রসার লাভ করবে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নারীদের মনে প্রাণে সত্যই কতটুকু

ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবধারা বাস্তবায়িত হয়, অন্তত দাওয়াতি

তৎপরতায় তারা কতটুকু প্রভাবিত হন, তা আমলে নেওয়া হয় না। আদৌ কি ব্যক্তি ও পরিবারজীবনে ধর্মের আলো পড়ে? সত্যই কি দৈনন্দিন জীবন ইসলামী অনুশাসনে সমুজ্জল হয়? এই বিষয়গুলো নিয়ে

লোকান জাবন হসলামা অনুশাসনে সমুজ্বল হয়? এই বিষয়বলো বিজ ভাবা হয় না। আমাদের লক্ষ্য—যেন উপলক্ষ্যে পর্যবসিত হচ্ছে।

অনেক দাওয়াহ-প্রতিষ্ঠান মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষাঙ্গন পরিবেশকে দাওয়াতের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেন। বাস্তবেও এটা ইসলামের অনুকূলে কাজ করার একটি উর্বর ক্ষেত্র। বিভিন্ন ছাত্রী-সংগঠন দাওয়াহর পক্ষে খুবই কার্যকর মাধ্যম। কিন্তু অনেক দাঈয়া শিক্ষাঙ্গন পরিবেশে শুধু কিছু ধার্মিক মেয়ের সাথেই সম্পর্ক রাখেন এবং তার দাওয়াতি তৎপরতাই বলি, আর নিছক সম্পর্কই বলি, এই গুটিকয়েক মেয়ে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে যে মেয়েদের মনে ধর্মের কোনো জায়গা নেই, যারা বেপর্দা চলাফেরা, অবাধ মেলামেশা এবং অবৈধ প্রণয়ের মতো ভয়ানক ধ্বংসাবর্তে পতিত তাদের প্রতি কোনো দায়িত্ব বোধ করেন না। এটাকে কী বলা যায়ং সংকীর্ণতাং হীনম্মন্যতাং দায়িত্বহীনতাং যাই বলি, কোনোটাই সঙ্গত নয়।

অনেক সাময়িক—যেমন মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ইত্যাদি ওয়াজ-মাহফিল ও সভা-সেমিনারের আয়োজন হয়। বিভিন্ন নামে শিরোনামে আরও অনেক দাওয়াহ-ব্যবস্থার অন্তিত্ব আছে। কিন্তু প্রায়ই চিন্তাধারা ও কর্মধারা এমন দেখা যায় যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা এবং দল ভারী করাই হয় মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ধর্মের প্রকৃত মর্মবাণী হৃদয়ের গভীরে পৌছে দেওয়া, ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রেমাবেগ জাগ্রত করা গৌণ বিষয়। এমনকি, যেই ধর্মের জন্যই এত কিছু, কখনো সেই ধর্মীয় মূল্যবোধকেই জলাঞ্জলি দিতে বাধে না।

এক কথায়, আমরা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য অনেক কিছুই করছি; কিন্তু ফল যা পাচ্ছি—স্থূল, ভাসাভাসা, অগভীর, সাময়িক। প্রভাব নেই,

প্রতিক্রিয়া নেই। যত কিছুই করছি, দিন দিন পিছিয়েই পড়ছি। তা হলে সমস্যা কোথায়? দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতিটা কী? কীভাবেই বা দাওয়াত সফল হবে, সুফল দেবে?

সমস্যাটা মূলে, দাওয়াতের একদম ভিত্তিমূলে, দাঈর অনুসৃত পথ ও পন্থার একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপে। যিনি ধাপে ধাপে দাওয়াতের সিঁড়ি বেয়ে আগে বাড়েন, তিনি সরল সঠিক পথে এগুতে থাকেন; ধীরে ধীরে পৌছে যান উচ্চ শিখরে। তিনি প্রতিষ্ঠিত হন একটি মজবুত ভিত্তিমূলের ওপর। পক্ষান্তরে যিনি প্রস্তুতিহীনভাবে পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ শুরু করেন এবং হ-য-ব-র-ল কাজ করতে থাকেন, তিনি—আল্লাহ মাফ করুন—সাধারণত পদশ্বলনের শিকার হন। আল্লাহ আমাদের স্বাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—ইসলামী কর্মকাণ্ডে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত এবং চেতনা ও আদর্শগত ভিন্নমুখিতা প্রায়ই ইতিবাচক ফল দিতে ব্যর্থ হয়। কেননা, এতে শাখাপ্রশাখাগত—এমনকি, মৌলিক ক্ষেত্রেও—অনেক মতভেদ সৃষ্টি হয় যা জন্ম দেয় বিভেদের। ভেঙে যায় ঐক্য। দাওয়াতি শক্তি ছিটকে পড়ে খণ্ড খণ্ড টুকরায়। প্রতিটি টুকরাই দাবি করে সেই শ্রেষ্ঠ, সেই সর্বোত্তম।

নারীদের দাওয়াতি কর্মকাণ্ডেও বিষয়টি ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু যারা এ অঙ্গনে বিভিন্নমুখিতা ও আলাদা আলাদা হয়ে কাজ করার দাবি করেন, তারা অনেক রকম যুক্তিও দাঁড় করান। আধুনিকতার দাবি অনুসারে দাওয়াতি অঙ্গনে নিত্যনতুন শৈলী অবলম্বন, বিভিন্ন অঙ্গনে বিভিন্ন আঙ্গিকে দাওয়াতি তৎপরতার সফল বাস্তবায়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বিপরীতে এগুলো নিতান্তই খোঁড়া যুক্তি। বাস্তবতাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, শতধাবিভক্ত দাওয়াতি শক্তি কোনোটাই কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না। কারও সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসছে না। বরং যা হচ্ছে, তাতে কাজের কাজ কমই হচ্ছে; শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, সময় নষ্ট হচ্ছে, অর্থের অপচয় হচ্ছে।

এক ও অভিন্ন চিন্তাধারা ও চেতনায় উজ্জীবিত, এক ও অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উদ্দীপ্ত, ঈমানী বলে বলীয়ান, ইলমী গুণে ভাশ্বর একই নেতৃত্বের মঞ্চ থেকে দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম না পেলে এবং যে যার বৃদ্ধি মতো কাজ করতে থাকলে জাতি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এখানে কয়েকটি সাধারণ কথা তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি:

- ১. ময়দানে এমন অনেক ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটে যারা কার্যত বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিতই নন। অনেক দাওয়াতি সংস্থা ও কেন্দ্রের নারীদের দেখা যায়, যারা দাওয়াতের প্রাথমিক বিষয়গুলোও জানতে আগ্রহী নন; কিন্তু কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন অবলীলায়।
- ২. আলাদাভাবে নিজে নিজে দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে মানবপ্রবৃত্তি প্রায়ই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়। অনেক নারীই এভাবে দাওয়াতি কাজে মনোযোগী হন। কিছু নারীকে জড়ো করেন। এবং ওয়াজ-নসীহত শুরু করেন। যেহেতু ইলমী পাথেয় নেই, সেহেতু শয়তানের সহজ শিকারে পরিণত হন। নিজেও ভ্রান্তিতে পড়েন। অন্যকেও ভ্রান্তিতে ফেলেন। শয়তান এমন চাল চালে যে, সংশোধনও কঠিন হয়ে পডে।

অথচ ইসলামের দিক-নির্দেশনা ছিল যে, তিনি কাজ শুরু করার আগে কাজের প্রস্তুতি নেবেন। অর্থাৎ তাফাক্কুহ ফিদ দীন তথা দীনের জ্ঞান ও বুঝ অর্জন করবেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْنِدُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَا اِلنِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থ : তাদের প্রত্যেকটি অংশ থেকে একটি করে দল বের হতে হবে দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য। যাতে ফিরে এসে কওমকে সতর্ক করতে পারে। হয়তো তারা সতর্ক হবে। –সূরা তাওবা : ১২২। ৩. বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঈমানি তরবিয়ত ব্যাহত হয়। যেমন: ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করা, আত্মপ্রকাশের মানসিকতা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে একমাত্র আল্লাহর সম্ভুষ্টির জন্য কাজ করা, গোপনে প্রকাশ্যে আল্লার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখে এমন তাকওয়া অর্জন করা, বিনয়, ব্যক্তিস্বার্থের ওপর জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া, মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করা, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তাসাধনের জন্য কাজ করা, পার্থিব ভোগবিলাস থেকে আত্মরক্ষা করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الِقَاءَرَبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ أَحَدًا

অর্থ : সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন আমলে সালেহ করে এবং রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। –সূরা কাহফ : ১১০।

- 8. সদস্যদের মধ্যে যে দ্বীনি সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা খুবই স্থল সীমাবদ্ধ সময়াবদ্ধ। এই সম্পর্কের উপলব্ধি স্থানিক দূরত্বকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তাই তো দেখা যায়, শুধু সময় ও স্থানের ব্যবধানেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেননা, দ্বীনি ভাতৃত্বের প্রকৃত ধর্ম ও মর্ম তারা উপলব্ধি করে না। আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ঘৃণা করার মহান ব্রতকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না। অথচ দ্বীনি দাওয়াতের একেবারে প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো উখুওয়্যাহ ফিল্লাহ তথা আল্লাহর তরে ভাতৃত্ব। আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার পত্তন ও প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিলেন, তখন সর্বপ্রথম এই নীতিটিকেই অনুসরণ করেছিলেন। তিনি আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের এমন এক অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন যা রক্তের বন্ধনকেও হার মানায়। এভাবেই মূলত মুসলিমসমাজের প্রতিটি সদস্যের অন্তরে ঈমানী উপাদানগুলো সুদৃঢ় হয়।
- ৫. দাওয়াতি কাজের একটি মূলনীতি হলো দায়িত্বশীলদের আনুগত্য।
 কিন্তু প্রত্যেকের এ ধরনের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন দাওয়াতি তৎপরতায় কর্মীদের

মাঝে এ গুণটি অর্জিত হয় না। তাদের প্রত্যেকেরই থাকে আলাদা আলাদা জীবনবাধ। প্রত্যেকেই নিজেকে অন্য সবকিছুর মতো দাওয়াতি তৎপরতার ক্ষেত্রেও সয়ংসম্পন্ন ভাবে। নিজের মতকেই চূড়ান্ত ও সঠিক বলে মনে করে। কখনো সেটাকে চাপা দিয়ে রাখলেও সময়মত অবচেতন মনে ঠিকই নিজের মত অনুযায়ীই কাজ করে। এটা যে কারও পক্ষে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা, এভাবেই প্রবৃত্তির অনুসরণের পথ তৈরি হয়। তখন আর অন্যের মত গ্রহণ করার সক্ষমতা থাকে না। ফলে ইসলামের জন্য কাজ করলেও ইসলামী মূল্যবোধ এখানে উপেক্ষিত হয়। পারস্পরিক আন্তরিকতার সুফল ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমীয় বাণীটি অনেকেই ভুলে থাকেন,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُواْ عَلَى سَفِيْنَةٍ, فأصابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الذِيْنَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا الماءَ مَرُّوا على مَنْ فَوْقَهُمْ, فقالوا: لَوْ أَنا حَرَقْنَا فِي نَصِيْبِنَا حَرُقًا، ولم نُؤذِ مَنْ فَوْقَنَا، فإنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُواْ هَلَكُواْ جَمِيْعًا، وإن أَحَدُوا عَلَى أَيْدِيْهِم بَحَوْا وَنَحَوْا جَمِيْعًا

অর্থ: যারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলে আর যারা তা লঙ্গন করে তাদের দৃষ্টান্ত যেন কিছু লোক একটি জাহাজ ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এক পক্ষ ওপরের অংশ এবং অন্য পক্ষ নিচের অংশ পেয়েছে। যারা নিচে আছে, তাদের পানি নেওয়ার জন্য ওপরে যেতে হয়। তাই তারা বলল, আমরা যদি আমাদের অংশে ছিদ্র করি তা হলে ওপরে যারা আছে তাদের আর কষ্ট দিতে হবে না। এমতাবস্থায় ওপরের লোকেরা যদি নিচের লোকদের তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করতে দেয় তা হলে সবাই মারা পড়বে। পক্ষান্তরে যদি বাধা দেয়, তা হলে সবাই বেচে যাবে—ওপরের লোকেরাও, নিচের লোকেরাও।

১. সহীহ বুখারী।

৬. জীবনে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাস্তবায়নও কম হয়। যারা এসব ইসলামী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হন, তারা শুধু এখানে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনকেই বিশাল কর্ম মনে করেন। জীবনে ইসলামের আদর্শের বাস্তবায়ন তাদের কাছে গৌণ। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে ইসলামের আলোকে সাজানো, ঈমানের রঙে রাঙানো—এসব দূর কী বাত। তারা উদাসীন নিজের ব্যাপারেও, ঘরের ব্যাপারেও, সন্তানের ব্যাপারেও।

৭. অনেক সংস্থা ও সংগঠন সময় ও সমাজের বান্তবতা থেকে উদাসীন থাকে। নানামুখী সমস্যায় কোনো রকম ভ্রুক্তেপ করে না। অথচ কে না জানে যে, দিন দিন কত সমস্যা দেখা দিছেে। কত সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। কত পরিবারে বিচ্ছেদ ঘটছে। দাম্পত্যজীবনে কত অনাস্থা নেমে আসছে। কত পরিবারে ওধু বিচ্ছেদই বাকি আছে; আর কিছু বাকি নেই। কত ঘরে পরিবারে দুর্ভাগ্য আর বঞ্চনা নিত্যসঙ্গী। কত সন্তান বখে গেছে। কত স্বামী চলে গেছে অধঃপাতে। কত পিতা হারিয়ে গেছে সময়ের শ্রোতে। সবকিছুতে হাপর ফুঁকছে বেহায়াপনা, বেপর্দেগি; মায়ায় ডেকে যাছে প্রবৃত্তির ডাহুক। অবলা মেয়ের ঈমান-সম্মান হরণের জন্য এবং অন্যের ঈমান-সম্মান হরণে তাকে ব্যবহারের জন্য কত ফাঁস, কত ফাঁদ; চিকচিকে বালুকাবেলায় কত ভয়ানক চোরাবালি। তার সাথে যা হচ্ছে, তাকে দিয়ে যা করানো হচ্ছে, তা কতটুকু ধর্মসম্মত, কতটুকু নীতিসম্মত, চারিত্রিক মূল্যায়নে কতটুকু ন্যায়, আভিজাত্য ও আধুনিকতার বিচারেই কতটুকু যৌক্তিক?

আমি কিছু কিছু অনৈসলামিক সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে জানি। এগুলো বাহ্যত ধর্মের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখে না। আমি দেখেছি, এরা দাম্পত্যজীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানে অনেক গুরুত্বারোপ করে। নারীরাই তাদের মূল লক্ষ্য। পরিবারের পুরুষদের দায়িত্বহীনতা বা অন্যায় আচরণের জন্য যেসব নারী ও শিশু কষ্টে আছে, তাদের প্রতি এরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। অর্থ সামর্থ সর্ব দিক দিয়ে। মা ও শিশু সম্পর্কে এদের কার্যক্রম এবং তৎপরতা দেখলে অবাক হতে হয়। নারী বিষয়টিকে তারা এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, শুধু নারীবিষয়কই টিভি-চ্যানেল,

রেডিও বেতার, সাময়িকীসহ পূর্ণাঙ্গ প্রচারমাধ্যমও প্রস্তুত করে ফেলেছে। বড় হৃদয়্রগ্রাহী ও চিন্তাকর্ষক ভাষা ও আবেদনে তারা নারীদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, আত্মনির্ভরশীল হতে, অধিকারসচেতন ও প্রতিবাদী হতে। আমি বেশ কয়েকবার তাদের কনফারেসে ইসলামের আলোকে মা ও শিশু-বিষয়ক বক্তৃতা করেছি। আমি কাছে গিয়ে বৃঝতে পেরেছি, তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করছে এবং এ পর্যন্ত করেছে, তা ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে দূরেই নয়, ধর্ম ও বিশ্বাসের জন্য বিপজ্জনকও বটে। আমি উপলব্ধি করেছি, তারা মূলত মুসলিম নারীদের টার্গেট করেই কাজ করছে। মুসলিম নারীর সেবা ও সহযোগিতার নামে উপনিবেশিক গোষ্ঠীর পথ সুগম করছে। তারা এমনভাবে নারীকে প্রস্তুত করছে যেন এই নারীই সংস্থার হাতিয়ার হয় এবং প্রকারান্তরে পশ্চিমাদের পথ খোলাসা করার কাজে লাগে। পশ্চিমারা এই সংস্থাগুলোকে সাহায্যও করে। কিন্তু সে সাহায্য মুসলিম নারীর উপকারার্থে নয়, বরং নিজেদের শ্বার্থের অনুকূলে।

তা হলে, আমরা মুসলিম নারীরা কেন এমন কিছু করতে পারি ন আমরা কেন মুসলিম নারীকে সামাজিক নিরাপত্তা, পারিবারিক সুখ-শান্তি ধর্মীয় নিশ্চয়তা দেওয়ার কাজ করতে পারি না? আমাদের দাওয়াতি তৎপরতা কেন এমন হয় না, যা সর্বমহলের নারীদের জন্য উপকারী, উপযোগী?

মনে হতে পারে, এই সংস্থাগুলো বহিঃরাষ্ট্র থেকে অনেক বড় বড় সহযোগিতা পায়। কাজেই তারা নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে পারে। কিন্তু আমরা যখন ইসলামের আলোকে এসব করতে যাব তখন আমাদের জন্য অত সহযোগিতা আসবে কোখেকে? আমরা তো অত সহজে কাজ করতে পারব না।

কথাটি স্থূল দৃষ্টিতে ঠিকই আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কাজ চলবে না। বরং আমাদের দেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইসলামী দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সকলে যদি এক হতে পারি, এবং এক ও অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং চেতনা ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারি, তা হলে অন্যদের সহযোগিতা ছাড়াই হাজার বাধাবিপত্তির মুখেও অনেক কিছু করতে পারব। আমরা একসাথে একযোগে কাজ করলে পারিবারিক সামাজিক সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অনায়াসে। আমরা যা একাকী নড়বড়েভাবে করতাম, তাই করব একসাথে জোরেশোরে। সহজেই আমরা সমাজের সকল অনুষঙ্গে দৃষ্টি দিতে পারব। আমাদে কাজ হবে ইসলাম ও শ্পলমানের কল্যাণে। ভাবুন তো, শক্রদের সর্বমুখী চক্রান্তকে নস্যাৎ করার জন্য এখন এটা কত জরুরি? শক্ররা কত সহজে ইসলামী সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূল ইসলামী পরিবারব্যবস্থার মূল প্রস্তর মুসলিম নারীদের শিকার করছে। কেমন ছলেবলে-কৌশলে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার পথ খোলাসা করছে।

আলোচ্য বিষয়ে ইতিবাচক একটি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। উপসাগরীয় একটি দেশের একটি নারীসংস্থা সম্পর্কে জানি। তাদের কাজ শুধু পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান। তারা কোনো রকম প্রশাসনিক ও আদালতের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার সমাধান করে থাকে। তারা তাদের বার্ষিক সমীক্ষায় প্রকাশ করেছে যে, তাদের কার্যক্রম দিন দিন উন্নতি লাভ করছে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রথম বছরই প্রায় তিনশো পরিবার তাদের শরণাপন্ন হয়। এদের অবস্থা বিবাহবিচ্ছেদের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু সংস্থার সংশোধনী তৎপরতায় এদের প্রত্যেকেই সুখী দাম্পত্যজীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। তারা দাবি করেছে, তাদের কাছে প্রতিবছর প্রায় কয়েক হাজার বিবদমান পরিবার সমাধান ও সংশোধনের জন্য এদে থাকে।

সূতরাং সমাজ-সংশোধনের জন্য অনেক বেশি সংস্থার প্রয়োজন নেই।
কেননা, সংখ্যাধিক্যে কাজ হয় না। কাজ হয় আন্তরিক প্রচেষ্টায়,
পরিকল্পনামাফিক পদক্ষেপে। আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরে সময় ও
সমাজের প্রয়োজন অনুসারে একসাথে একযোগে কাজ করতে হবে। তা
হলেই আধুনিক জীবনের নানামুখী সমস্যার সমাধান সম্ভব।

প্রিয় বোন,

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বিরাট দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এই দায়িত্বটি সুন্দরভাবে পালন করতে আমাদের কর্ম ও পদ্ধতিগত ঐক্য ও অভিন্নতা অপরিহার্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّلْوَتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُوْمًا جَهُولًا

অর্থ : আমি প্রথমে এই আমানত আসমানসমূহ, জমিন এবং পর্বতমালার কাছে উপস্থাপন করেছিলাম; কিন্তু তারা একে বহন করতে ভীতি ও অপারগতা প্রকাশ করেছে। কিন্তু মানুষ এই দায়ভার কাঁথে তুলে নিয়েছে। নিশ্বয় মানুষ জালেম এবং জাহেল। –সূরা আহ্যাব : ৭২

প্রিয় বোন,

চেয়ে দেখুন, সারা পৃথিবীর সকল তাগুতি শক্তি কেমন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও মুসলমানকে কোণঠাসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা সাধারণ থেকে সাধারণ ইসলামী কর্মকাণ্ডও মেনে নিতে পারে না। সেটাকে ধূলিসাৎ করার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক হয়ে কথা বলে, কাজ করে। কেননা, তারা উপলব্ধি করেছে যে, যে কোনো ছোট থেকে ছোট ইসলামী তৎপরতাও অদূর ভবিষ্যতে তাদের অন্তিত্বের জন্য হুমকিম্বরূপ। সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে একুশ শতকের প্রথম যুদ্ধটি দেখেছে। একটি নিরপরাধ জাতিকে ধ্বংস করে দিতে কীভাবে তাগুতি সৈন্যরা ধেয়ে এল এবং অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে ধেই ধেই করে পুরো মুসলিম বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ঘুরে গেল। এ জাতির অপরাধ কী ছিল? অপরাধ শুধু এই ছিল যে, তারা তাদের দেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা এবং কুরআনিক সংবিধান চালু করেছিল।

তাহলে আমাদের কী হলো? আমরা কেন এক হতে পারব না? আমরা কেন একে অপরকে ভালোবাসতে পারব না? আমরা কেন পরস্পরের হিতাকাঙ্কী হতে পারব না? এত দ্বন্দ্ব কীসের? এত বিবাদ-বিসম্বাদ কীসের? আমরা কবে শক্রদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারব? আমরা কবে শক্রদের চক্রান্তের মোকাবেলা করতে পারব? প্রিয় বোন,

তাগুতি শক্তির মোকাবেলা করতে হলে অবশ্যই অতি সৃক্ষ ও প্রাজ্ঞ নীতি অনুসারে সুবিন্যস্ত সুপরিকল্পিত ইসলামিক তৎপরতার প্রয়োজন। কেউ বলতে পারেন, ইসলামিক মূল্যবোধ ও ভাবধারায় এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ঐশী বিধান মোতাবেক মানবহৃদয়কে প্রস্তুত করা; মানবহৃদয়ে ইসলামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। অথচ বর্তমান পৃথিবী খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এরই মধ্যে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অপরাপর জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করা কী করে সম্প্রবং

কিন্তু এ চিন্তাধারা সঠিক নয়। সঠিক চিন্তাধারা হলো ধৈর্য ধরা। ধীরে ধীরে কল্যাণের বীজ বৃদ্ধি পাবে। তা থেকে মাহাত্ম্যের চারা গজাবে। একটু একটু করে আসমান জমিনে শাখা ও শেকড় বিস্তারকারী সুবৃহৎ শক্তিশালী বৃক্ষে পরিণত হবে। একসময় ফল হবে। ফল পাকবে। ফল পাড়ার সময় হবে।

সত্যি বলতে কী, আমরা যদি গভীরভাবে নিজেদের ঈমানি তরবিয়ত করতে পারি এবং দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের মধ্যেই ঈমান ও ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে পারি তা হলে শীঘ্রই আজকের সমাজেই নতুন করে ইসলামী জীবনযাপনের বাস্তবতা মূর্ত হয়ে দেখা দেবে। এভাবে ধীরে ধীরে পরিকল্পনামাফিক কাজ করা—লক্ষ্যহীন ও পরিকল্পনাহীনভাবে বিবেচনাহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, প্রবৃত্তির অনুগামী, নিজ ঝোঁক ও প্রবণতায় পরিচালিত হাজার হাজার নারীকে দাওয়াতি তৎপরতার জন্য মাঠে নামানোর চাইতে অনেক ভালো। কেননা, এতে শক্তির ক্ষয়, অর্থের অপচয় ও সময় নষ্ট করা ছাড়া আর মাঝ পথে ফিরে আসা ছাড়া কিছুই হয় না।

প্রিয় বোন,

ভূলে যাবেন না যে, দাওয়াতি কাজে অভিন্নতা শরীআতের পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ هٰنِهَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ اَنَارَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ

অর্থ : এই হলো তোমাদের জাতিসন্তা—এক ও অভিন্ন জাতিসন্তা।
আর একমাত্র আমিই তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমারই
ইবাদত করো। –সুরা আমবিয়া : ৯২

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম মুখলিস দাঈয়ার কর্তব্য হবে পূর্ণ আত্মপ্রত্যায়ী হওয়া, আত্মপ্রতারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা, নিজের হিসাব গ্রহণ করা, নিজের দুর্বলতা ও সবলতার পর্য করা; এরপর সংস্কার ও সংশোধনের কাজে মনোনিবেশ করা। তা হলেই নারীর দাওয়াতি তৎপরতা সত্যিকার অর্থেই ইসলামসম্মত হবে, একটি মজবুত ভিত্তি লাভ করবে, সফল ও কার্যকর হবে, সংশোধনে সক্ষম হবে।

এমনকি, এভাবে মুসলিম নারীসংস্থাই বিশ্বজনীন নারীসংস্থার মর্যাদা লাভ করতে পারে। মুসলিম নারীরাই সারা পৃথিবীর নারীসমাজের নেতৃত্ব দিতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ নারী সমস্যার সমাধান হতে পারে ইসলামী আইনে।

আজ যে পশ্চিমারা মুসলিম দেশে এসে মুসলিম পরিবারে ঢুকে মুসলিম নারীদের 'নাচাচ্ছে', অচিরেই—ইনশাআল্লাহ—তাদের এই সাহস থাকবে না যে, তারা মুসলিমসমাজ ও মুসলিমপরিবারে দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তাকাবে।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, বড় বড় দেশগুলো হাজার ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করে, কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে দেশে দেশে যেসব সংস্থা পরিচালনা করছে, সেগুলোর সিংহভাগেরই টার্গেট হলো মুসলিমপরিবার; আরও স্পষ্ট করে—মুসলিম নারী। যেন আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সূচিত বিশ্বগ্রাম ধারণা ও বিশ্বায়নের হাত ধরে পুরো পৃথিবীই তাদের কর্তৃত্বলয়ে প্রদক্ষিণ করে। এ চেতনা থেকেই বিশ্ববাণিজ্য-সংস্থা গঠিত হয়। গ্রুপ অব এইট সংঘবদ্ধ হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো বিভিন্ন নাম ও শিরোনামধারী সংস্থা। প্রত্যেকেই চায়, অধীনস্থ দেশগুলো অন্তত একটি নীতিতে হলেও তাদের অধীনে থাকুক। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, নারী অধিকারের মতো আপাতমধুর অনেক গ্রোগানই তারা

কাজে লাগায়। কিন্তু সব শ্রোগানেরই বাস্তবায়ন হয় তাদের স্বার্থের অনুকূলে।

আমরা মুসলিমজাতি। আমাদের আছে আলাদা বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। সুতরাং বিশ্বায়ন কী, এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য কী, সেগুলো আমাদের জানতে হবে। এর উদ্দেশ্য যদি হয় সারা পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করা, তা হলে সুস্পষ্ট যে, এর চলা লেগেই সারা পৃথিবীর সকল ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধও ঘুরপাক খাবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রত্যাখ্যাত। কেননা, আমাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক মূল্যবোধকে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে দেওয়া যাবে না। এও মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম নারী মুসলিমসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো মুসলিমসমাজ ও মুসলিমরাষ্ট্রকে সবসময়ই গণনায় প্রথম সারিতে রাখে। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে কিছু সুদ্রপ্রসারী পরিকল্পনা। আওতায় থাকে ফাঁদপাতা কিছু চিন্তাচেতনা ও ভাবধারা। তাদের তৎপরতা হয় এসব চেতনা ও ভাবধারা মুসলিমসমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এই পথ ধরেই তারা বশীভূত করছে ইসলাম ও আহলে ইসলামকে।

এটাই সত্য। এটাই বাস্তবতা। আজন্ম শক্রতা দুই জাতি ও দুই আদর্শের মধ্যে। মুমিনরা ভাই ভাই। পুরো কৃফরি শক্তি এক ও অভিন্ন। তাদের মূল টার্গেটি ইসলাম ও মুসলমান। ভাবতেও অবাক লাগে। যত কিছু হয় সবই পাশ্চাত্য থেকে। দেখুন না, প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী পর্দাব্যবস্থায় আঘাত করল কারা? খ্রিস্টান মিশনারিই নয় কি? তাদের দালালরাই তো শিক্ষামিশন, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি নামের অন্তরালে মুসলিম নারীদের হিজাব হরণ করল। কাসিম আমীন, লুতফি সাইয়িদ, আমিনা সাঈদ, হুদা শারাভি প্রমুখের প্রোপাগাভায় সাড়া দিয়ে কত দেশে কত নির্বোধ নারী নিজের ঈমান ও সম্মান জলাঞ্জলি দিল।

মুসলিম নারী যেন যেখানে সেখানে ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়, সেজন্য আমাদেরই কাজ করতে হবে। আমাদের ধর্মবোধ, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মৌলিকত্বকে আঁকড়ে থাকতে হবে। আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের সাথে সামগুস্য রেখে সুদূরপ্রসারী কর্মশালা ও সুপরিকল্পিত পাঠপরিক্রমা চালু করতে হবে।

কোনো নারীই যেন নিজের অজান্তে পশ্চিমাদের পাতানো ফাঁদে পা না দেয়, তাদের স্বার্থের বলি না হয় সেজন্য প্রত্যেককেই ভাবতে হবে। গভীর বোধ ও সৃক্ষ দৃষ্টি দিয়ে ভাবতে হবে। পশ্চিমা ও তাদের সহযোগীরা 'নাট্যমঞ্চে' দাঁড়িয়ে যেসব গ্রোগান দিচ্ছে, যেসব ভাষা-পরিভাষার প্রচলন ঘটাচ্ছে সেসবের প্রকৃত মর্ম ও বাণী অনুধাবন করতে হবে।

তা না করে যদি তাদের কথায় উঠি, তাদের কথায় বসি, তাদের পদান্ধ অনুসরণ করি, তা হলে অচিরেই প্রাচ্যের দেশগুলোর নারীদেরও সেই পরিণতি হবে, যেই পরিণতি হয়েছে পশ্চিমা নারীদের। একটু ভাবুন, যেই পাশ্চাত্য থেকে এত এত ভালো কথা আমদানি হচ্ছে, সেই পাশ্চাত্যেই কেমন অগ্নিঝরা সমাজ গড়ে উঠেছে! যারা প্রাচ্যে এসে নারীদের অধিকারের বুলি ছড়াচ্ছে, তাদের ওখানেই নারীদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে!

৫ জুন ২০০০ তারিখে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীবিষয়ক অধিবেশনে বক্তাদের উক্তি থেকেও বিষয়টি অনুমেয়। অধিবেশনে জাতিসন্থের (সাবেক) মহাসচিব কফি আনান বলেন,

"এই গ্রহের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে নারীদের দ্বারা। নিঃসন্দেহে নারী নির্যাতন সারা পৃথিবীতেই আইনবহির্ভূত বিষয়। তবে নারীর সম্মানহানির দায়ে কারও মুত্যুদণ্ড হওয়া লজ্জাজনক ব্যাপার। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে। যেন সেও বিশ্ববাণিজ্যে অবদান রাখতে পারে।"

অধিবেশনে হিলারি ক্লিনটন দাবি জানান:

"নতুন শতককে অবশ্যই ধর্ষণ ও বলাৎকারমুক্ত করতে হবে। নারীদের দাসীর মতো বিক্রি করা বর্জন করতে হবে। নারীকে দৈহিক নির্যাতন ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করতে হবে।"

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররষ্ট্রেমন্ত্রী মাদলিন অলব্রাইট বলেন,

ফিরে এসো নীডে

"নারীকে বিবেচনায় না আনলে অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব।" তিনি 'সাদা দাস বাণিজ্য' (নারী বিক্রয়) বন্ধের দাবি জানান।

অধিবেশনে একশো আশিটির মতো রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছিল। হাজার খানেক নারী-অধিকার-বিষয়ক-সংস্থারও ছিল সরব উপস্থিতি।

চিন্তা করুন, যেই দেশগুলোতে চারিত্রিক ও পাবিত্রিক মূল্যবোধ ও মূলনীতিগুলো লজ্ঞিত, সেই দেশগুলোতে এরকম হাজার হাজার অধিবেশনের পরও নারীদের জীবন কী দুর্বিষহ! তাদের সমাজব্যবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, নারী এত লাঞ্ছিত, অপমানিত; এত নির্যাতিত, নিম্পেষিত? কেন তারা বেনিয়াদের সেবাদাসীতে পরিণত হলো? কেন তাদের সম্মান ও সম্রুম, তাদের নারীত্ব ও সতীত্ব সমাহিত হচ্ছে ঘরে ঘরে প্রতিনিয়ত?

চিন্তা করুন, যেই সমাজের মানুষদের এখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে হচ্ছে, কেন চেঁচাতে হচ্ছে? আর এত চেঁচিয়েও লাভ হচ্ছে না কেন? তারা কোথায় আর আমরা কোথায়? তাদের সমাজব্যবস্থার সাথে আমাদের সমাজব্যবস্থার কি কোনো মিল আছে? বর্বর যুগের যেই সব পতিত রহিত বিষয়গুলোকে এখনো ঘেঁটে ঘেঁটে তারা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, তার গোড়া কেটে ধুয়ে মুছে সাফ করে স্বচ্ছ সুন্দর পবিত্র মুসলিম সমাজ গড়ে গেছে ইসলাম আরও চৌদ্দশ বছরে আগে। তা হলে তাদের সাথে সুর মিলিয়ে আমাদের সুন্দর সমাজটাকে কি আমরাই নষ্ট করছি না?

মুসলিম নারী যদি সমকালীন জীবনে অবদান রাখতে চায়, তা হলে আমাদের চিরসমুজ্জল চিরভাশ্বর শরীআতের বিধিনিষেধের সঠিক উপলব্ধি, মৌলিক জ্ঞান, ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা, সুস্থ রুচি ও ধার্মিকতা নিয়েই এগোতে হবে। তা হলেই সে নতুন প্রজন্মকে জ্ঞানগত, চেতনাগত উৎকর্ষের পথে ধাবিত করতে পারবে এবং তা স্বভাবধর্মের মানদণ্ডেও হবে উন্নীত।

তাকে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শরীক হতে হবে মুসলিম নারীর সংগ্রামসাধনায়। পুরো পৃথিবীকে দেখিয়ে দিতে হবে মুসলিম নারীর মাহাত্য্য। সুন্দর সমাজগঠনে পালন করতে হবে মুখ্য ভূমিকা। সে যে সম্মান প্রাপ্ত হয়েছে পৃথিবীর আকাশে ইসলামের সূর্যোদয়ে এবং মুহাম্মাদে আরাবীর কল্যাণে—তার স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে পুরো পৃথিবীর নারীসমাজকে।

দেশে দেশে মুসলিম-নারী-আন্দোলনকে সফল করতে যাবতীয় প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগাতে হবে। বইপুন্তক, পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, টিভি চ্যানেল, বেতার, ইন্টারনেট সর্ব উপায়ে ইসলামের বাণী প্রচার করতে হবে। অপরাপর জাতি ও সমাজের নারীদের অন্তরে ইসলামের মাহাত্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ্বদয়গ্রাহী ও আবেদনশীল ভাষায় আহ্বান জানাতে হবে। উদান্ত কণ্ঠে ঘ্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিতে হবে যে, মানবতা কখনোই স্থিতি লাভ করবে না, কখনোই শান্তি ও নিরাপন্তার শাদ পাবে না যতক্ষণ না ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। ইসলামই সমাধান। ইসলামই মুক্তি। ইসলামই জীবন ও জগতে সফলতার চাবিকাঠি। ইসলামই সেই শ্বভাবধর্ম যা আল্লাহপ্রদন্ত ফিতরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা প্রাণ ও বস্তর সমন্বয় করতে পারে। ইসলাম সর্বকালের সর্বখানের উপযোগী। ইসলাম মহাপ্রলয় পর্যন্ত মানবতার শুদ্ধির নিশ্চয়তা-বিধান করে।

মুসলিম নারী কবে বিশ্বজনীন দাওয়াত প্রচার করতে পারবে? কবে ইসলামে নারীর মর্যাদার প্রকৃত স্বরূপ পৃথিবীকে দেখাতে পারবে? কবে ইসলামের শান ও শওকতে পুরো পৃথিবীকে আশ্বস্ত করতে পারবে? কবে প্রকৃত মর্মে আধুনিক সভ্যতাকে পরাস্ত করতে পারবে? কবে? আশা করা যায়. অচিরেই।

চতুর্দশ অধ্যায় কয়েকটি বহুল আলোচিত বিষয়

নিঃসন্দেহে মুসলিম নারী সবচে সম্মানিত, মহিমান্বিত। কিন্তু কিছু ঠক-প্রতারক প্রায়ই ইসলামের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে অনর্থক আপত্তি উসকে দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকে। এরা আগেও ছিল। এখনো আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের প্রোপাগান্তা থেকে ঈমান আকীদা রক্ষার জন্য ইসলামের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

ইসলামের পর্দাব্যবস্থা কত নিখুঁত সুন্দর। এর নীতি কত প্রাজ্ঞ, ফল কত সুদ্রপ্রসারী। প্রকৃত প্রস্তাবে, মুসলিম জাতির অতীত অগ্রযাত্রার পেছনে যে বিষয়টি শক্তি হয়ে কাজ করেছিল এবং প্রহরা হয়ে অবক্ষয় ও অধঃপতনের হাত থেকে এ জাতিকে রক্ষা করেছিল, তা হলো তাদের আত্মার পরিশুদ্ধি, হৃদয়ের স্বচ্ছতা, চরিত্রের পবিত্রতা এবং চরিত্রমাধুরীর অনুপমতা। আর এই অমূল্য মহৎ গুণটিকে অক্ষত রাখার পেছনে যেই বিষয়টি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তা হলো পর্দাব্যবস্থা।

কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীদের অপতৎপরতা দেখুন, তারা মুসলিমজাতিকে অন্যান্য জাতির মতো ভঙ্গুর এবং মুসলিমসমাজকে অন্যান্য সমাজের মতো ঘুণেধরা বানাতে এই পর্দাব্যবস্থাকে উঠিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলো। তারা একে নারীর প্রতি অবিচার বলে ব্যক্ত করল। তারা মুসলিম নারীদের বোঝাতে লাগল, এটা তোমাদের অধিকার লঙ্খন। তোমাদের

ফিরে এসো নীড়ে

সৌন্দর্যপ্রদর্শনের অন্তরায়। পর্দাব্যবস্থার কারণে তোমাকে একজন পুরুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। পুরুষের সাথে মিশতে দেওয়া হয় না। তোমার স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়। তোমার শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার অবমৃল্যায়ন হয়।

আমার বোন,

পর্দা কী, পর্দা কেন, পর্দানশীনরা কি আদৌ পিছিয়ে থাকে, ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তারপরও বলি—আল্লাহ আপনাকে চোখ দান করুন, বিবেকের সাথে কথা বলুন, বিবেকের পরামর্শ গ্রহণ করুন, আশা করি, এসব প্রোপাগাভার চতুরতা ও বীভৎস রূপ আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে বচ্ছ ধারণা অর্জন করুন। নির্মোহ দৃষ্টিতে ভাবুন। এর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করুন। দেখবেন, আপনার মনের ভিতরের মানুষটি আপনাকে জানিয়ে দেবে, এটাই সুন্দর, এটাই অনুপম।

একাধিক স্ত্রী-গ্রহণ

ইসলামের প্রাজ্ঞ বিধি অনুসারে একজন মুসলিম পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। তবে শর্ত হলো, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হবে এবং প্রত্যেকের ভরণপোষণের সক্ষমতা থাকতে হবে। যদি কেউ স্ত্রীদের হক আদায় করার সাহস না করে এবং তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিতে না পারে এবং প্রত্যেকের ভরণপোষণের সক্ষমতা না রাখে তা হলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি ইসলাম তাকে দেয়নি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন.

وَ إِنْ خِفْتُمْ الَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبِعَ ۚ قَالِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ﴿ ذٰلِكَ اَدْنَى الَّا تَعُوْلُوْا

অর্থ : তোমরা যদি এই ইয়াতিম শিশুকন্যাদের প্রতি ন্যায় করতে না পার (তবে এদের বিবাহ কোরো না); কেননা, তোমরা ইচ্ছেমতো দুটি, তিনটি, চারটি করে নারী বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে সাম্য রক্ষা করতে না পার, তবে একটি নারীকেই বিবাহ করতে পারবে। কিংবা কোনো অধিকারভুক্ত দাসী। এটাই তোমাদের অন্যায় না করার নিকটতর। –সূরা নিসা: ০৩

ইসলামবিদ্বেষীরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়ায় ইসলামের ওপর আপত্তি করে। তারা বলে, এতে নারীকে ছোট করা হয়েছে, তার আবেগ অনুভূতির কোনো মূল্য দেওয়া হয়নি। তারা শুধু একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির কথা বলে। কিন্তু এজন্য ইসলাম যেসব শর্ত আরোপ করেছে, সেগুলোর কথা বলে না। এ কি জ্ঞানপাপ নয়?

আন্দর্যের বিষয় এই যে, স্ত্রীর যাবতীয় হক আদায়, আমৃত্যু ভরণপোষণ এবং প্রত্যেকের মাঝে সমতাবিধানের শর্তে ইসলাম কর্তৃক একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিকে—নারীকে ছোট করা, নারীর আবেগ অনুভূতি নিয়ে খেলা করা ইত্যাদি স্পর্শকাতর শব্দে বিশেষায়িত করা হচ্ছে। অপর পক্ষে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দান করা ছাড়াই পথে ঘাটে বাজারে শপিংমলে নারীকে ভোগ এবং উপভোগ করা, অথবা নামকাওয়াস্তে ঘরের বউ ঘরে রেখে হালি হালি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আমোদপ্রমোদ, আহারবিহার করা; অথবা পার্টিতে বন্ধুদের সাথে স্ত্রীবিনিময়ের উন্মাদনাকে কিছুই মনে করা হয় না। কিংবা মনে করা হলেও সেগুলো নিয়ে কথা বলা হয় না, বা কথা বলা যায় না। কেননা, পশ্চিমাগুরুদের আধুনিক ব্যাখ্যায় এগুলো স্বাধীনতা, উদারতা। যাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি এতটাই বিকল, তাদের উদ্দেশে কিছু বলাই বিফল।

কিন্তু যারা দাম্পত্যজীবনকে একটি চিরন্তন বন্ধন মনে করেন, যাদের কাছে চারিত্রিক ও পাবিত্রিক মূল্যবোধ বলতে কিছু আছে, তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, একাধিক স্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, ইসলামে নারীকে খাটো করে দেখা হয়েছে বা তার আবেগ অনুভূতিকে মূল্য দেওয়া হয়নি। বরং বাস্তবেই এমন কিছু ক্ষেত্র আসে, যখন অন্য স্ত্রী-গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ কারণেই মূলত একাধিক স্ত্রী-গ্রহণের পথকে একবারে রুদ্ধ করা হয়নি। কেননা, ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম। এতে না অতি বাড়াবাড়ি আছে, না অতি ছাড়াছাড়ি আছে। কিছু

কিছু অনিবার্যতাবশতই মূলত একাধিক স্ত্রী-গ্রহণের পথ ইসলামে খোলা রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করছি:

- অসুস্থতা : অনেক সময় স্ত্রী এমন রোগে আক্রান্ত হয় য়ে তার আরোগ্য দুরাশামাত্র। তখন অন্য স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- ২. বন্ধ্যাত্ব: অনেক সময় বছরের পর বছর চিকিৎসা করেও সন্তান আসে না। কিন্তু স্বামী সংসারে সন্তানের প্রয়োজন বোধ করে। পিতৃত্বের পিপাসা দূর করার জন্য তাকে অন্য স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।
- ৩. অবাধ্যতা : স্ত্রী অনেক সময় অবাধ্য ও গোঁয়ার প্রকৃতির হয়।
 চালচলন ভালো হয় না। স্বামীর শরীআতসম্মত হক আদায় করে না।
 এবং তার সংশোধনও অসম্ভব প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় একটি
 স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য অন্য স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি অন্যায় নয়।
- 8. নারীর সংখ্যাধিক্য: ইসলামী সমাজে যখন (যুদ্ধের মতো) কোনো ব্যাপক দুর্যোগ দেখা দেয় তখন দেখা যায়, নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। একারণেও পুরুষের একাধিক স্ত্রী-গ্রহণের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

ভাববার বিষয়, ইসলাম যে একাধিক ন্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে, তাও ঢালাওভাবে নয়। অনেক বিধিনিষেধও আরোপ করেছে যেগুলোর যথার্থ বাস্তবায়নে বিষয়টি জীবনমুখী ও বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠে। সেই সাথে মোটা মোটা দুইটি শর্ত আরোপ করেছে : ভরণপোষণের সামর্থ এবং সমতাবিধানের নিশ্চয়তা।

উত্তরাধিকার

ইসলামের উত্তরাধিকার বন্টননীতিতে দুজন কন্যাসন্তানের সমপরিমাণ অংশ পাবে একজন পুরুষসন্তান। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِنَ اَوْلَادِكُمْ * لِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَك ... অর্থ : আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন একজন পুরুষসন্তান দুজন নারীসন্তানের সমান অংশ পাবে। তবে যদি নারী দুয়ের অধিক হয়, তবে তাদের প্রাপ্য অংশ হলো দুই তৃতীয়াংশ... –সূরা নিসা : ১১

এই বন্টননীতি অনুসারে পুরুষসন্তান তার প্রাপ্য অংশটুকু পাবে এবং তার ওপর তার পরিবারের, মায়ের এবং বোনের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে মেয়ে তার প্রাপ্য অংশটুকু পাবে। কিন্তু তার ওপর কারও ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে না। এমনকি, তার নিজের ভরণপোষণও তার নিজের দায়িত্ব নয়; বরং তার পিতা, ভাই, স্বামী, সন্তান এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মাহরাম পুরুষদের দায়িত্ব। তারা এ দায়িত্বে অবহেলা করলে ইসলামের বিধি অনুসারে দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। নারী তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারবে। প্রশাসন তাদেরকে তার ভরণপোষণে বাধ্য করবে।

তাহলে প্রাপ্য সম্পদ নারী কী করবে? হাঁ, এই সম্পদ সে নিজের জন্য সংরক্ষণ করবে। শরীআতের বিধান মোতাবেক ইচ্ছেমতো খরচ করবে। দান সদকা করবে। হাদিয়া তোহফা দেবে। এই সম্পদে কারও কোনো কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকবে না। এখন স্বয়ং বিচার করুন, আদৌ কি ইসলাম নারীর প্রতি অবিচার করল?

এখন আপনি যদি কাফের-বেঈমানের সাথে সুর মিলিয়ে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে তুলে দেন, এবং সে কারণে আপনার ওপর আপনার এবং অন্যদের ভরণপোষণের দায়িত্ব এসে পড়ে, এবং আপনার দায়িত্বশীল পুরুষরাও সেই সুযোগে আপনার দায় মাথা থেকে নামিয়ে ফেলে এবং আপনার থেকে যা নেবার, নেয়; এবং যা দেবার, না দেয়; এবং তাদেরকে বাধ্য করার জন্য দেশে ইসলামী আইনে: কার্যকরিতা না থাকে, তা হলে এটা কার দোষ? ইসলামের না আপনার?

এভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও আদর্শিক চেতনায় অন্যান্য আদর্শকে গুলিয়ে ফেলে অথবা ইসলামকে পুরোপুরি তুলে দিয়ে যে জগাখিচুরিসমাজ গড়ে উঠবে, তাতে প্রত্যেকে যার যার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির কথা ভাববে সেটাই স্বাভাবিক। ক্ষতি প্রত্যেকেরই হলেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে নারী। সুতরাং নারীজাতির নিরাপন্তা নির্ভেজাল ইসলামেই নিহিত। এই অনুভূতি যত দিন না আসবে, নারীজাতির অবনতি এবং অসহায়ত্ব ততদিন বাড়তেই থাকবে। নাট্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে যত চিল্লাচিল্লিই করুন, আন্দোলন আর সংগঠনের যত স্তুপই জমা করুন, ফল কী হচ্ছে, বান্তবতা তা চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছে। মূল থেকে সরে গিয়ে অমূলে অজায়গায় যতই হাতড়ান, পাবেন না। সূত্রে ভূল করলে পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা ফুরিয়ে ফেলুন, অঙ্ক মিলবে না।

যাই হোক, ইসলামের শক্ররা এটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং মুসলিম পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়েও নাক গলাতে শুরু করেছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিতর্কের অবতারণা হচ্ছে। নতুন নতুন প্রশ্ন ও সংশায় উসকে দেওয়া হচ্ছে। বাল্যবিবাহ ও আত্মীয়বিবাহ থেকে শুরু করে খুলআ, তালাক এবং জন্মনিয়ত্রণ ইত্যাদি অনেক কিছু এখনকার প্রতিদিনের প্রতিজনের মুখে মুখে। উদ্দেশ্য—এভাবে মুসলিম-পরিবারের অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া এবং মুসলিম নারীদের মনমন্তিক্ষে দখল প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে ধীরে ধীরে মুসলিম নারীদের মন মনন তাদের অনুকূলে কাজ করবে এবং তাদের উপনিবেশিক পথ খোলাসা হবে।

মুসলিম দাঈয়ার কর্তব্য হবে এই সব বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা।
যাতে তিনি যথার্থ উত্তর প্রদান করে মুসলিম নারীদের আশ্বস্ত করতে
পারেন। এবং যারা এজেন্ট হয়ে এইসব প্রোপাগান্ডার প্রসার ঘটাচ্ছে
তাদেরকে লাজওয়াব করতে পারেন। এটাও দাওয়াতের অঙ্গনে ব্যাপক
ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে করি।

বাল্যবিবাহ

বর্তমানে বিবাহের বয়স নিয়েও ধুমুজালের সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিভিন্ন সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছে। অনেক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে পুঁজি করে ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়সকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা মনে করি, এই দাবিটি অনর্থক। এবং ফলাফলও সার্বিক বিচারে ভালো নয়।

ফিরে এসো নীড়ে

বাল্যবিবাহ দাস্পত্যজীবনের ব্যর্থতার কারণ নয়। যেমনটি অনেকে দাবি করেন। আমাদের আগের যুগের মানুষেরা অতি অল্প বয়সেই বিবাহ করেছেন। আগের যুগের বলতে একশো বছর আগের কথা বলছি না, ত্রিশ বছর আগের কথাই বলছি। তাদের প্রত্যেকেরই দাস্পত্যজীবন যে ব্যর্থ হয়েছে, তা তো নয়। আর যাদের ব্যর্থ হয়েছে, তা যে শুধু বাল্যবিবাহরে কারণেই হয়েছে, তাও তো নয়। বরং তাদের অধিকাংশের দাস্পত্যজীবনই ছিল সফল, এবং তাদের ছেলেমেরেরাই আজকের বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, বীর সৈনিক ইত্যাদি। প্রত্যেকেই বাল্যকাল থেকে ঘরসংসার করা নারীদেরই সন্তান। তা হলে সমস্যাটা কোথায়ং

সমস্যা মূলত আমাদের মাথায়। আমরা বিবাহ, তালাক, সন্তান্লালন ইত্যাদি সামাজিক রীতিনীতিতে ধর্মীয় বিধি-বিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। ইসলামী শরীআত বিবাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বয়স বেঁধে দেয়নি। বরং প্রাক্ত বিবেক-বৃদ্ধি ও সুস্থ রুচি-প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। যেন ছেলেমেয়ে উভয়ের পক্ষেই বিবাহের কল্যাণ ও ইতিবাচকতা সার্থকতা লাভ করে।

আজকে নানা প্রোপাগান্তায় মানুষের মগজ ধোলাই করা হচছে। ঘোষকরা বলে বেড়াচ্ছে, তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার কারণে শিশু-অধিকার লজ্মিত হচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে শিশুত্বের পরিধি আঠারো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। ছেলেমেয়েরা যখন এরই আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তারা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়; মা বাবার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়; ফলে তাদের শারীরিক ও বৃদ্ধিবৃত্তিক পকৃতা আসে না, অল্প বয়সেই তাদের ওপর নানাবিধ দায়িত্ব চেপে যায়; পরিবার-পরিচালনা, সন্তান-লালনপালন, স্বামী-স্ত্রীর দায়ত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি দায় তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আশ্চর্যের বিষয়, অনেকের মানসিক যাস্ত্রিকতা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, সতেরো বছর এগারো মাস উনত্রিশতম দিনে সন্তানকে শিশু হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং তার সাথে শিশুসুলভ আচরণ করে; কিন্তু পরের দিন থেকেই সে আর শিশু নয়—এখন তার সাথে আচরণ হবে ভিন্ন আঙ্গিকে।

কিন্তু এসব অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কিছু গালগল্প ছাড়া কিছু নয়।
শরীআতে এসব কথার গ্রহণযোগ্যতা নেই। আল্লাহই আমাদের শ্রষ্টা।
তিনিই আমাদের সামর্থ ও ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সবচে ভালো জানেন।
তিনিই যখন প্রাপ্তবয়ক্ষতাকে শরীআতের বিধিনিষেধের আরোপযোগ্যতা
বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তখন এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাপ্তবয়ক্ষতার
পর মানুষ শরীআতের বিধিনিষেধ বুঝতে সক্ষম হয়, আল্লাহর সম্বোধনের
ধারণ ও অনুধাবনের যোগ্য হয়। বিবাহসম্পর্কিত বিষয়াদি এবং
দায়িত্বকর্তব্যও এর বাইরে নয়। প্রাপ্তবয়ক্ষ হওয়ার পর মানুষ পরিবারপরিচালনা, সন্তান-লালনপালন ইত্যাদি কাজের সক্ষমতা অর্জন করে
ফেলে। এগুলো মূলত নির্ভর করে পরিবারের পরিবেশ ও পরিস্থিতির
ওপর। মা বাবা যদি সচেতন হন, তা হলে ছেলেমেয়েদের যথাসম্বব
দায়িত্বসচেতন করে গড়ে তোলা সহজ। এভাবে শিন্তরা আত্রবিশ্বাসী ও
আত্রনির্ভরশীল হয়ে বেড়ে ওঠার যথার্থ সুযোগ পায়।

ইসলামের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা দেখি, ষোলো-সতেরো বছর বয়সের যুবকরা বিশাল বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন। উসামা বিন যায়েদ রায়ি. মাত্র ষোলো বছর বয়সে সেনাপ্রধান হয়েছিলেন। ওই যুদ্ধে অনেক বড় বড় সাহাবী তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন। মুহাম্মাদ বিন কাসিম মাত্র সতেরো বছর বয়সে সিদ্ধু বিজয় করেছিলেন। এ বিষয়গুলো আর যাই প্রকাশ করুক, এটা তো অবশ্যই প্রকাশ করছে যে, মানুষ যে পরিবেশে বড় হয় সে অনুযায়ীই নিজের ওপর নির্ভর করতে শেখে। নিজের বিষয়াদি পরিচালনা করতে শেখে।

দুঃখ এখানেই যে, আমাদের শক্ররা প্রতিনিয়ত আমাদের মাঝে চারিত্রিক রোগজীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর আমরা পাল্লা দিয়ে সেগুলো হাতে-পায়ে, মাথা-গায়ে মেখে নিচ্ছি; চোখে-মুখে, নাকে-বুকে চুষে নিচ্ছি, শুষে নিচ্ছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়ক্ষ হলেও বিবাহের উপযুক্ত হচ্ছে না; কিন্তু তারও আগেই রান্তাঘাটে বিশ্রী প্রেমলীলা, বেহায়াপনা-বেলেল্লাপনা, ছিনতাই-ধর্ষণ ও নেশাগ্রহণে পশ্চিমাদের সাথেও পাল্লা দিতে প্রস্তুত। বলি, সবকিছুর সাথে সাথে আমাদের চিন্তাশক্তিও যদি এমন বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে কী করে এ জাতি রেহাই পাবে?

থাকল শিক্ষার বিষয়। এটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ মেধা ও যোগ্যতা দান করেছেন। অনেক মেয়ে লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহী হয় না; কিন্তু বিভিন্ন শিল্পকর্মে আগ্রহী হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রেও একই কথা। অনেক ছেলেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভালোবাসে। তাই সে পাঠশালা ছেড়ে দেয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং এ জাতীয় বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত হয় এবং অর্থ উপার্জন করতে চায়। একসময় আত্মিক প্রশান্তির জন্য বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু যখন আমাদের চিন্তানৈতিক বন্ধ্যাত্মের কারণে সে কোনো রকম সমর্থন পায় না, তখন হতাশ হয়ে পড়ে। অর্থের অপব্যয়, সময়ের অপব্যয় এবং শরীআতের লঙ্খন হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়। জীবন হয়ে পড়ে লক্ষ্যহীন, অর্থহীন, ছন্নছাড়া। সুতরাং ব্যাপকভাবে বিবাহবিলম্বের ডাক দেওয়া কত্যুকু ইতিবাচক ফল দেবে? বরং আমরা মনে করি, এর নেতিবাচকতা ও মন্দ পরিণতির দিকটাই ভারী বেশি। প্রসঙ্গত সেরকম কয়েকটি মোটা মোটা বিষয়ে ইঙ্গিত করছি:

- ১. এর পরিণতিতে তরুণ-তরুণীর বিচ্যুতির পথই লাঘব হয়। সমাজে অনাচার ছড়িয়ে পড়ে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে চারিত্রিক মূল্যবোধের ওপর।
- ২. ধীরে ধীরে বিবাহ বিষয়টি অনেকের কাছেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বিবাহ করে অযথা ঝামেলায় জড়াতে চায় না। স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন থেকে দূরে সরে যায়। সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সমাজে কোনো কার্যকর অবদান রাখার মানসিকতা থাকে না।
- ৩. বিলম্বে বিবাহ মেয়েদের প্রজননক্ষমতা হ্রাস করে। বিবাহ যতই বিলম্বিত হয়, গর্ভাশয়ে ততই দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। তখন আর সুস্থ, সুঠাম সন্তান প্রসব করে না।

বিষয়টির নেতিবাচকতা অনুধাবনে জন্য আমেরিকান পত্রিকা টাইমের একটি সংবাদই যথেষ্ট। ওই সংবাদের সারকথা এই যে, এ পর্যন্ত দুই মিলিয়ন জারজ শিশুর জন্ম হয়েছে। তাদের জন্মদাত্রীরা প্রত্যেকেই টিনেজ—তেরো থেকে উনিশ বছরের অবিবাহিত 'শিশুকন্যা'। যারা আমাদের সমাজে এসে পশ্চিমাদের দালালি করছেন, তারা এই খবরটা কি জানেন? এর পরও কি ছোট বড় সর্ব বিষয়ে পশ্চিমাদের অনুকরণ করতে হবে? মহান আল্লাহর এই ধমক কি তাদের জন্যই নয়,

افَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًّا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

অর্থ: তারা কি সেই বর্বর নিয়মনীতিকেই চাইছে? অথচ ইয়াকীনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চাইতে সুন্দর বিধানদাতা আর কে আছে? –সুরা মাইদাহ: ৫০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বানীর প্রতিফলন কি তাদের ওপরই হচ্ছে না,

لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبلكُم شِبْرًا بِشِبْرٍ وذِراعًا بذِراعٍ حتى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبُّ حَرِبٍ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ قلنا يا رسول الله : اليَهُوْدَ والنصارَى ؟ قال : فمنْ غَيْرُهُمْ؟

অর্থ : অচিরেই তোমরা তোমাদের আগের লোকদের অনুসরণ করা শুরু করবে—একদম বিঘতে বিঘতে, গজে গজে; এমনকি, তারা যদি 'গুইসাপের গর্তে ঢোকে', তবে তোমরা তাতেও তাদের অনুসরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ রাসূল, আপনি কি ইহুদি নাসারাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন, তো আর কাদের কথা?

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, ঐশী বিধানে অনধিকার চর্চা করবেন না। আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন, তাতেই সমাজের শান্তি ও নিরাপন্তা নিহিত। তাতেই শিশুর অধিকার এবং প্রতিষ্ঠা নিহ্নিত। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলছি, যে সভ্যতা ব্যক্তিশ্বাধীনতার নামে ব্যাভিচারের বৈধতার সনদ দেয়, সেই সভ্যতা আমরা মানি না, মানব না। যেই সভ্যতা শ্বভাবধর্মের দাবি ও চাহিদার সাথে এবং সরলপ্রাণ মুসলমানের রুচি ও প্রকৃতির সাথে স্পষ্টত সাংঘর্ষিক, সেই সভ্যতা আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।

১. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ফিরে এসো নীড়ে

পশ্চিমা সভ্যতায় যে ধ্বস নেমেছে, আমরা তার স্বরূপ দেখেছি। আমরা আমাদের নিদ্ধলন্ধ পবিত্র সমাজে নর্দমার নোংরামিগুলো তুলে আনতে চাই না। আমরা জানি, তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে যত কথাই বলুক, জীবনের বাস্তব সমাধান তাদের কাছে নেই। তারাই সমস্যার জন্ম দেয়। তারপর সেই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরও জটিলতার সৃষ্টি করে। আমরা তাদের অনুকরণপ্রিয় তোতাপাখি কেন হব? আমরা তো জানি যে, আল্লাহ জানেন, মানুষ জানে না। আমরা তো মানি যে, আল্লাহর জ্ঞান সর্বব্যাপী, মানুষের জ্ঞান সীমিত।

পশ্চিমাদের দালালরা জেনে রাখুক, প্রতিটি সমাজের আছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি সমাজ আলাদা আচারে, আলাদা অভ্যাসে, আলাদা চরিত্রে, আলাদা মূল্যবোধে বিশ্বাসী। তারা কী এমন পেল যে, নিজ দেশের নিজ জাতির আলাদা বৈশিষ্ট্যকে এভাবে জলাঞ্জলি দিতে হবে? তারা যেন আর নিজ দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতি ও সভ্যতার দালালি ও গোলামি না করে। তারা যেন আর অন্তত কোনো মুসলিমসমাজে বিলম্ব-বিবাহের দাবি না তোলে।

অবৈধ-শিশু-সমস্যার সমাধানের উপায় কী হবে, সে নিয়ে শত শত সভা সেমিনার করার চাইতে আমাদের ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সে বিবাহ করবে; বৈধ দাম্পত্যজীবনের আওতায়, পরিবার-প্রতিষ্ঠানের পবিত্র ছায়ায় কিছু বৈধ সন্তান জন্ম দেবে এবং মায়া-মমতা-ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধনের ওপর বেড়ে ওঠবে এটাই আমাদের কাছে অনেক ভালো।

আত্মীয় বিবাহ

বর্তমানে আমাদের সমাজে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ-শাদির বিষয়ে রব উঠেছে। দাবি করা হচ্ছে, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ-শাদির দারা সুস্থ ও মেধাবী সন্তান জন্ম দেওয়ার সুযোগ কমে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, এ বিষয়ে পূর্ব থেকেই মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। কেউ এ ব্যাপারে উদ্বন্ধ

এখানে আগ্রীয়-নিকটাগ্রীয় বলতে মাহরাম ছাড়া সাধারণ আগ্রীয় ও বংশীয় ছেলেমেয়ের কথা বলা
হচ্ছে। কেননা মাহরাম ছেলেমেয়ের বিবাহশাদি ইসলামে সুস্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

করেন, কেউ করেন অনুৎসাহিত। যারা উদুদ্ধ করেন, তাদের কিছু যুক্তি হলো,

- ২. আত্মীয় ছেলে-মেয়ে পারস্পরিক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা এবং সাংসারিক অসচ্ছলতা ও অপ্রশস্ততায় তুলনামূলকভাবে বেশি ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে পারে।
- ৩. নিজেদের স্থাবর, অস্থাবর অর্থসম্পদের হেফাজত হয়।
 অনাকাঞ্জ্যিতভাবে অন্যদের হাতে চলে যায় না।
- ৪. আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ-শাদি বংশীয় সমকক্ষতা নিশ্চিত করে। পরিবারের ছেলেমেয়ের বিবাহ-শাদির বিষয়টি সহজ হয়। ছেলেমেয়ের আইবুড়ো থাকার পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়।

পক্ষান্তরে, যারা নিজেদের মধ্যে বিবাহ-শাদির বিষয়ে অনুৎসাহিত করেন, তাদের চিন্তাধারা হলো আত্মীয়দের বাইরে বিবাহ-শাদিই ভালো। কেননা—

- ১. এতে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ইতিবাচক।
 কেননা, অনেক জায়গা দেখে মনমতো ভালো ছেলেমেয়ে নির্বাচন করা সম্ভব হয়।
 - ৩. গোত্রীয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি থাকে না।
 - ৪. বংশে নতুন ধারার সংযোজন হয়।
 - ৫. নতুন প্রজন্ম হয় মেধাবী, শক্তসমর্থ, সুস্থ, সুঠাম।
- ধর্মীয় জ্ঞানে আমরা যা পাই, তাতে আত্মীয় বিবাহ নিষিদ্ধও নয়, নির্দিষ্টও নয়। সুতরাং ঢালাওভাবে আত্মীয় বিবাহের উৎসাহ কিংবা অনুৎসাহ কোনোটাই ভারসাম্যপূর্ণ নয়। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ-পুনর্বিবাহ বংশধারাকে

দুর্বল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে

لَا تُنْكِحُوا القَرَابَة القَرِيْبَةَ فإنَّ الوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا

অর্থ : তোমরা নিকটাত্মীদের মধ্যে বিবাহশাদি দিয়ো না। এভাবে সন্তান দুর্বল হয়।

হ্যরত উমর রায়ি. থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বনু সায়েব বংশের ছেলেমেয়েদের দুর্বলতা দেখে বললেন,

مَا لِيْ أَرَاكُمْ يَا بَنِي السَّائِبِ قَدْ ضَوَيْتُمْ؟ غَرِّبُوا الِّنكَاحَ لا تَضْوُوْا

অর্থ : কী ব্যাপার, বনু সায়েবের লোকেরা, তোমরা দেখি দুর্বল হয়ে পড়ছ? তোমরা নিজ বংশের বাইরেও বিবাহশাদি কোরো, তা হলে দুর্বল হবে না।

ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. লিখেছেন,

التَّحْرِبَةُ أَنَّ الوَلدَ بيْنَ القَرِيّبَيْنِ يَكُوْنُ أَحْمَقُ

অর্থ : অভিজ্ঞতা বলে, আত্মীয় দম্পতির ছেলেমেয়ে সাধারণত নির্বোধ হয়।^২

মুসলমানদের এ দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বিধান নয়। এটা সাধারণ অভিজ্ঞতার আলোকে সাধারণ উৎসাহ-অনুৎসাহের ব্যাপার। যদি চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো আত্মীয়যুগলের মধ্যে বিবাহশাদির দ্বারা বংশধারায় কোনো দুর্বলতা আসবে না, তা হলে অনুৎসাহের বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। তারা বিবাহশাদি করতে পারে। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষা যদি জানান দেয় যে, তাদের বংশধারায় কোনো কুপ্রভাব পড়তে পারে, তা হলে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাহশাদি না করাই কাম্য।

১. ইবনে হিব্বান (সনদ : যয়ীফ)।

২. ফাতহুল বারী শরহে বুখারী।

তালাক

যদি কখনো এমন হয় যে, দাম্পত্যজীবনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা অসম্ভব, কোনো প্রকারেই সমাধান হচ্ছে না, সমঝোতার সকল প্রয়াস ব্যর্থ; এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাক তথা মুক্তি ও বিচ্ছেদের বিধান দিয়েছেন। তবে কিছু কিছু কারণে নারীকে নয়, তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। কারণগুলো এই:

- ১. পুরুষই বিবাহে প্রস্তাবকারী। সেই প্রার্থী। নারী প্রার্থিত। পুরুষকেই মোহর পরিশোধ করতে হয়। স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ করতে হয়। এই বিষয়গুলো পুরুষকে একটু ভাবাবে। হুট করেই তালাক প্রদান করা থেকে বিরত রাখবে। সে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের বিষয়ে যৌক্তিক ছাড় দিতে পারলে, হতে পারে শেষে তালাকের মতো গুরুতর পরিস্থিতি কেটে যাবে।
- ২. তালাক নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর বিষয়। এতে অনেক ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন আছে। আবেগ-অনুভূতির স্পর্শকাতরতা এবং প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণের প্রবণতায় নারীর চাইতে পুরুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বেশি। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি তাকে একটুতেই রাগান্বিত ও নিরাশ করে। সে হালকা ধাক্কাতেই ভেঙে পড়ে। মনোমালিন্যের বিষয়ে স্বামীকে ছাড় দিতে ততটা উদারতা দেখাতে পারে না, যতটা পুরুষ পারে। সুতরাং নারীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিলে তালাক বেড়ে যাবে।

বাস্তবতাই এর প্রমাণ। আজকাল অনৈসলামিক আইনের আওতায় নারীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার ফলে তালাক অনেক বেড়ে গেছে। একের পর এক ঘর ভাঙছে। হাজার হাজার শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরিবারের ছায়া না থাকার কারণে অপরাধ প্রবণতাও বেড়ে যাচ্ছে।

তবে পুরুষকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে যাচ্ছেতাইভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করবে। কোনো রকম শরঈ ও যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তালাক প্রদান করার নৈতিক অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بِالْمَعْرُونِ فَإِنْ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ

فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

ফিরে এসো নীড়ে

অর্থ: তোমরা তাদের সাথে উত্তমভাবে বসবাস করো। যদি তাদের অপছন্দ হয়, তবে হতে পারে, তোমরা কিছু অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে তোমাদের জন্য রেখেছেন প্রভৃত কল্যাণ। –সূরা নিসা: ১৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقِ

অর্থ : আল্লাহর নিকট সবচে অপছন্দনীয় বৈধ বিষয় হলো তালাক।

লক্ষ করুন, মাসিকের সময় তালাক প্রদান করতে ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইসলামের বিধান অনুসারে তালাক প্রদান করতে হবে পবিত্র অবস্থায়। এ সময় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পূর্ণ আকর্ষণ থাকবে। কিন্তু তালাক প্রদান করতে চাইলে এরকম সময়েই তালাক করতে হবে এবং দূরে থাকতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি, মাসিকের সময় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন:

'সে যখন পবিত্র হবে, তখন যেন তালাক দেয়।'

ইসলাম পুরুষকে এই অধিকার দেয়নি যে, সে নারীকে যত খুশি তালাক দিতেই থাকবে আর ইচ্ছে মতো ঘোরাতেই থাকবে। যেমনটি জাহেলি যুগের বর্বর জাতিদের মাঝে ছিল। আবার এত বেশি সংকীর্ণতাও করেনি যে, আত্মসংশোধন ও প্রত্যাবর্তনের সুযোগই থাকবে না। ইসলাম বিপরীতমুখী দুই প্রান্তিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে অবলম্বন করেছে মধ্যমপস্থা। ইসলাম তালাকসংখ্যা নির্ধারণ করেছে তিনটি। যেন মধ্যবর্তী সময়গুলো দম্পতিযুগলের আত্মসংশোধন ও পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে নতুন করে পূর্বদাম্পত্যজীবনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকে। আবার নারীকে তামাশার পুতুল বানিয়ে আমৃত্যু ঝুলিয়ে রাখার পথও রুদ্ধ হয়।

একটি হলো তালাকে রজঈ। ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সুযোগ থাকে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার। কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর এটি তালাকে বাইনে সুগরায় রূপ লাভ করে। এখানেও নতুন চুক্তি এবং নতুন

১. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ।

মোহর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার সুযোগ রেখেছে। কিন্তু এর ওপর যেই তালাকটি হবে, সেটি তালাকে বাইনে কুবরা বা মুগাল্লাযা। এভাবে পরপর তিন তালাক পূর্ণ হলে বিবাহের গিঠ সম্পূর্ণরূপে খুলে যায়। এরপর আর এই স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার কোনো অধিকার স্বামীর থাকে না। তবে যদি স্ত্রীর অন্য কোথাও বিয়ে হয়, নতুন স্বামীর সাথে ঘরসংসার-সহবাস হয়, তারপর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, তা হলেই কেবল পূর্ববর্তী-তিন-তালাকপ্রদানকারী-স্বামীর জন্য নতুন করে তাকে বিবাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

اَلطَّلاَقُ مَرَّتْنِ "فَامْسَاكُ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ * وَلَا يَجِلُ لَكُمْ أَنُ تَالُونِ مَنَ اللهِ مَنَا اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللهِ ثَالُونُ خِفْتُمْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَا اللهِ فَلَا عُنُودَ اللهِ فَلَا حُدُودَ اللهِ فَلَا حُدُودُ اللهِ فَلَا عُنَا الْفَتَدُتُ بِهِ * تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا * وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا * وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَلَا عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْفَتَدَتُ بِهِ * تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا * وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللهِ فَأُولِكَ هُمُ الظّيرُونَ

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ أَنْ يَتَوَاجَعَا ۗ إِنْ طَنَا ۖ أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ ۚ وَتِلُكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

অর্থ: তালাক দুবার (মুখে উচ্চারণ করা যেতে পারে); এরপর হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অথবা সহ্বদয়তার সাথে তাকে চলে যেতে দিতে হবে। তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, যা কিছু তোমরা নারীদের দিয়েছ তা তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবে।

তবে স্বামী-স্ত্রী যদি আশঙ্কা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না এবং তোমরাও আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তা হলে স্ত্রী স্বামীকে যে বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ গ্রহণ করবে তাতে স্বামী-স্ত্রীর অপরাধ থাকবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্বারিত সীমারেখা। একে অতিক্রম কোরো না। যারা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে, তারা সুস্পষ্ট জালেম।

এরপর যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তা হলে এই স্ত্রী যতক্ষণ অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ না করবে ততক্ষণ সে আর (তিন তালাক প্রদানকারী) স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। তবে যদি (দ্বিতীয়) স্বামী নিয়মমাফিক তাকে তালাক দেয় এবং তারা (অর্থাৎ স্ত্রী এবং আগের তিন তালাক প্রদানকারী স্বামী) মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে তা হলে তারা পুনর্বিবাহ করতে অসুবিধে নেই। এটাই আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা। তিনি তা স্পষ্টাকারে ব্যক্ত করেন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। স্বা বাকারা: ২২৯-২৩০

নারীস্বাধীনতার নামে যারা আন্দোলন করছেন, তারা তালাক প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তা এই যে, তালাকের বিধান তো খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তালাক প্রদানের ক্ষমতা তো শুধু স্বামীরই থাকছে। এভাবে আর কতটুকু স্ত্রীর অধিকার রক্ষা হয়। স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা না দেওয়াটা তো অন্যায়। কেননা, এতে সে অনেক জটিলতার মুখে পড়ে। অনেক সময় স্ত্রী না স্ত্রীর মর্যাদা পায়, না অত্যাচারী স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। যেমন, স্বামী স্বেছ্হাচারিতা করে, নির্যাতন ও সীমালজ্বন করে; কিন্তু স্ত্রীকে ছাড়ে না। অনেক স্বামী নপুংশক। অনেক স্বামী ভরণপোষণে অক্ষম। অনেক স্বামী বিভিন্ন অজুহাতে বছরের পর বছর থাকে বাইরে। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রীর জন্য মুক্তির কোনো পথ না থাকে, তা হলে ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া তার তো কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং স্বামীর সাথে সাথে স্ত্রীকেও তালাক প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া উচিত। যাতে তার সাথে সত্যিকারের সাম্যটুকু করা হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, তালাকের বিধান দেওয়া হলেও তালাক ইসলামে কাম্য নয়। এ জন্যই তালাককে বলা হয়েছে, ইসলামের নিকৃষ্টতম বৈধ বিষয়। সুতরাং অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া তালাক যেন না হয়, অন্তত তালাকের সংখ্যা যেন কিছুটা হলেও লাগামবদ্ধ হয়, সেজন্যই নারীকে না দিয়ে তালাকপ্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুরুষকে। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আবার স্বামী যেন তালাকপ্রদানের ক্ষমতাকে যাচ্ছেতাইভাবে কাজে লাগাতে না পারে, সেই জন্য ইসলাম যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাও তুলে ধরেছি। কিন্তু ইসলামী শরীআতের প্রত্যাশা হলো, পারস্পরিক ভালোবাসা, মতৈক্য ও আন্তরিকতার ওপর

পরিবারের ভিত্তিস্থাপন। অন্যায়, অত্যাচার, সীমালজ্ঞ্যন ইসলাম বরদাশত করে না। সুতরাং নারীকে তালাকপ্রদানের ক্ষমতা না দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর মতো বিভিন্ন জটিলতার মুখেও নির্যাতিত, নিম্পেষিত, দুর্বিষহ, মানবেতর জীবন কাটাবে। বরং সে যদি অত্যাচারিত হয়, অথবা তার কোনো অধিকার লঙ্খিত হয় যার কারণে স্বামীর সাথে ঘরসংসার করা তার পক্ষে দুরুহ, তা হলে সে মামলা দায়ের করবে এবং প্রমাণ উপস্থাপন করবে। বিচারক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ইসলামী বিধান মোতাবেক রায় দেবেন। মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতে বলেছেন,

إِلَّا أَنْ يَخَافَا اللَّهُ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

অর্থ: তবে স্বামী স্ত্রী যদি আশস্কা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষ করতে পারবে না এবং তোমরাও আশস্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে পারবে না, তা হলে স্ত্রী স্বামীকে যে বিনিময় দিয়ে বিচ্ছেদ গ্রহণ করবে তাতে স্বামী স্ত্রীর অপরাধ থাকবে না। এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্বারিত সীমারেখা। একে অতিক্রম কেরো না। যারা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে, তারা সুস্পষ্ট জালেম। –স্রা বাকারা: ২২৯

ইমাম বুখারী রাহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। লক্ষ করুন, হাদীসটির বক্তব্য এই,

جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بِنِ قَيْسٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله إني مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِ ولا دِيْنٍ ولَكِنِي أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلَامِ فقال صلى الله عليه وسلم أترُدِيْنَ عليه حَدِيْقَتَهُ؟ قالت : نعم، فقال: إقبل اخْدِيْقَةَ وَطَلِّقُهَا تَطْلِيْقَةً.

অর্থ : সাবেত বিন কায়সের স্ত্রী রাস্বলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে (সাবেত সম্পর্কে) আরজ করলেন, হে আল্লাহর

রাসূল, আমি না তার স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে আপত্তি করছি, না তার ধার্মিকতার বিষয়ে। তবে আমি ইসলামের ছায়ায় থেকে কুফরি করতে

চাই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে (মোহর হিসেবে গৃহীত) বাগানটি ফেরত দিতে পারবে? তিনি বললেন, জি পারব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাবেতকে)

বললেন, বাগান গ্রহণ করো এবং তাকে একটি তালাক প্রদান করো। এই হলো স্বর্ণযুগের এমন একজন স্ত্রীর উদাহরণ যিনি স্বামীর হক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মোহর ফেরত দেওয়ার অনুমতি দিলেন; বিনিময়ে তার স্বামী তাকে তালাক প্রদান করলেন। ইসলামী শরীআতে একে বলা হয় খুলআ। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামে ব্যক্তিস্বাধীনতা অবশ্যই সম্মানের সাথে মূল্যায়িত। সূতরাং ইসলাম নারীর জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে তালাকের দাবি করার অধিকার দেয়।

আদায় করতে পারবেন না মর্মে অপারগতা প্রকাশ করলেন। রাসুল

তবে মনে রাখতে হবে, খুলআর বিধান দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ মনোমালিন্য বা ঠুনকো অজুহাতে কথায় কথায় স্ত্রী তালাকের দাবি করবে। ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নারী সাধারণ ছোটখাটো বিষয়ে ধৈর্য ধরবে। যাতে পরিবারের ভিত্তি না নড়ে। তবে যখন আপনাআপনি ব্যক্তিপর্যায়ে এগুলোর সংশোধন ও সমাধান সম্ভব হবে না, তখন মুব্তাকী পরহেজগার দায়িত্বশীলদের শরণাপন্ন হবে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَ إِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْرًا اَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَ ۚ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَقُوْا

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থ: যদি কোনো নারী স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা অবজ্ঞার আশঙ্কা করে তা হলে তারা নিজেদের মাঝে মীমাংসা করে নিতে পারে।

এতে সমস্যা নেই। মীমাংসাই উত্তম। মূলত প্রতিটি মানুষকেই নিজের

ফিরে এসো নীডে

স্বার্থের প্রতি আগ্রহ দান করা হয়েছে। তবে তোমরা যদি সদাচার কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তা হলে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই সম্যুক অবগত আছেন। –সূরা নিসা : ১২৮

সুতরাং একটুতেই তালাক সংঘটিত হওয়া ইসলামী শরীআতের প্রত্যাশার পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী শরীআত চায় পরিবার গড়তে; পরিবার ভাঙা অনিবার্যতাবশত। অথচ আজকালকার তথাকথিত উন্নত বিচারব্যবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, তনলে অবাক হতে হয়। প্রকাশ্যে ভরা মজলিসে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। একে অপরের কুৎসা বলতে থাকে। রায় কী আসে, কীভাবে আসে সে কথা বাদই দিলাম। কিন্তু এমন অশালীন অশোভন আচরণের পর মনের মিল কী করে সম্ভবং অথচ পবিত্র কুরআনের নির্দেশ,

وَلا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ

অর্থ : তোমরা কখনো একে অপরের প্রতি দয়া ও সহ্বদয়তা দেখাতে ভুলো না, কারণ তোমরা কে কী কর, আল্লাহ তার সবই পর্যবেক্ষণ করেন। –সূরা বাকারা : ২৩৭

ভেবে দেখুন, যেখানে ইসলামের দাবি হলো, বিচ্ছেদের পরও একে অপরের প্রতি দয়া ও সহ্বদয়তার কথা স্মরণ রাখা এবং একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা; সেখানে কী হচ্ছে? আজকে বিচ্ছেদ যেন বিরহ থাকে না, চরম বিদ্বেষে রূপ নেয়। এমনকি, মামলায় একে অপরকে পরাস্ত করতে দাস্পত্যজীবনের অন্তরঙ্গতা ও গোপনীয়তাও খুলে খুলে তুলে ধরে। আমাদের সমাজের কী হলো? কোন প্রাণসংহারক ব্যাধিতে পেয়ে বসল? কোথায় চলেছি আমরা?

দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে যখন শুনি, মুসলিম নারীরা বিচ্ছেদের পর স্বামীদের কাছে পাশ্চাত্য আইন অনুসারে এমন এমন দাবি করে ইসলামী শরীআতে যার কোনো ভিত্তি নেই। আমরা দেখি, অনেক মুসলিম নারী পশ্চিমা ভাবধারায় চলা অনৈসলামিক আদালতগুলোতে মামলা করে। উদ্দেশ্য থাকে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর অর্ধেক সম্পত্তি এবং বিচ্ছেদ ও ইদ্দতের পরও আমৃত্যু ভরণপোষণ। মুসলিম ভাই বোনেরা জেনে রাখুন, খোদাই বিধানের ওপর আর কোনো বিধান নেই। মানবপ্রবৃত্তি-গড়া আইন কখনোই সার্বিক বিচারে নির্ভুল হবে না। তাই মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে নান্তিক্যবাদীদের দ্বারস্থ হয়ে কখনোই দাম্পত্যজীবনের প্রকৃত সফলতা পাবেন না। যদি সফলতা পেতে চান, তা হলে ভাঙার নয়, গড়ার মানসিকতা অর্জন করুন। স্বচ্ছ পবিত্র হৃদয়ে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ চিত্তে রাগ অভিমান ভুলে নতুন করে দাম্পত্যজীবন শুরু করুন। উন্নাসিকতা, আত্ম-অহংকার বর্জন করুন। কখনোই একওঁয়ে ও একরোখা হবেন না। মনে রাখবেন—আপনার একট্ ধৈর্য, একট্ সহনশীলতা, একট্ ছাড় দেওয়ার মানসিকতা একটি পরিবারকে রক্ষা করতে পারে, যা প্রকারান্তরে রক্ষা করে একটি সমাজকে। সর্বোপরি, আপনার একট্ ত্যাগ, একট্ বিসর্জন আপনার সন্তানের পক্ষে কত সুখকর; বিপরীতে আপনাদের বিচ্ছেদ তার জন্য কতটা হানিকর, গ্রানিকর; হৃদয় দিয়ে ভাববেন।

নারীর কর্ম

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর কর্মজীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে মুসলিম গবেষকগণের চিন্তাধারা মোটামুটি দু-রকম। এক পক্ষ ঘরের বাইরে নারীর কাজ করাকে সমর্থন করেন; কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। অপর পক্ষ এটাকে প্রত্যাখ্যান করেন; কিন্তু অপারগতার অবস্থায় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করেন। উভয় পক্ষেরই যুক্তি আছে, প্রমাণ আছে।

তবে মুসলিম গবেষকগণ প্রত্যেকেই এখানে একমত যে, নারীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো স্বামী-সংসার, সন্তান-লালনপালন ও পরিবার দেখাশোনা। অর্থাৎ তার মূল কর্মক্ষেত্র ও অবস্থানক্ষেত্র তার ঘর। কেননা, নারীই পরিবারের মূল ভিত্তি। আর পরিবারই সমাজের ভিত্তি। আর সমাজই একটি দেশ ও জাতির ভিত্তি। সুতরাং নারীর ঘরে অবস্থান ও পারিবারিক দায়িত্বপালনকে সাধারণভাবে দেখার এবং তাকে সমাজের অচল অংশ বলার কোনো সুযোগ নেই। নারীজীবনের চরম ও পরম সার্থকতা এবং দেশ ও জাতির চূড়ান্ত সফলতা মূলত এখানেই নিহিত। পরিবারেই শিশু প্রকৃত স্নেহ, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে এবং

তার মাঝে মানবীয় গুণ ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং তার সার্বিক নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত হয়। পরিবারে নারীর যথাযোগ্য উপস্থিতি ও দায়িত্বপালন একদিকে যেমন বর্তমান সময় ও সমাজকে রক্ষা করে, অন্য দিকে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকেও যোগ্য করে গড়ে তোলে।

কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যখন নারীর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন কোনো বিধবা, কিংবা তালাকপ্রাপ্তা নারী যাদের ভরণপোষণ করার কেউ নেই। বিশেষত বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেহেত্ ইসলামী আইনের প্রয়োগ নেই, এবং ইসলামী মূল্যবোধও প্রায় অনুপস্থিত, সেহেতু যেসব দূরবর্তী মাহরামদের ওপর ভরণপোষণের আবশ্যকতা আছে তারা দায় এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। অথবা তারা দায়িত্ব পালন করলেও বিষয়টা খুব একটা সম্মানজনক হয় না। অনেক সময় নারী এমন পরিবারের সদস্য হয় যেখানে অভাব-অনটন অনেক বেশি। ছোট ভাই-বোনের খরচপাতি যোগাতে মা-বাবার পাশে দাঁডানো জরুরি হয়ে পডে। অনেক মেয়ের স্বামীর আয়-উপার্জন কম হয়। পরিবারের সব দায় মেটে না। মিটলেও খুবই টানাহেঁচড়া করে। স্বামীর কষ্ট লাঘব করার জন্য নারীরও কিছু একটা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ চাক্রিজীবীদের? 💢 নশা। আবার নারীর প্রতি সমাজেরও এব্যাজন পড়ে। যেমন চিকিৎসার কথাই ধরি। সমাজের নারীশ্রেণি অন্তত চিকিৎসায় মেয়ে ডাক্তারদের প্রতিই আশ্বস্ত বোধ করে। বিশেষত মেয়েলি বিষয়গুলোতে। যদিও ইসলাম প্রয়োজনের কারণে মেয়ে-ডাক্তার না থাকলে পুরুষ-ডাক্তার দেখানোর, এমনকি সতর খোলারও অনুমতি দিয়েছে।

আমি যেহেতু জীবনের শুরুতে একজন কর্মজীবী নারী ছিলাম, সেহেতু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, কোনো নারী যদি ঘরে একজন স্ত্রী ও মা হিসেবে তার প্রথম ও প্রধান মৌলিক দায়িত্বটি পালন করতে পারেন, পাশাপাশি ঘরের বাইরেও কাজ করতে পারেন, তা হলে মনে হয় না কেউ আপত্তি করবে।

কিন্তু এটা আদৌ সম্ভব কি না—বাইরে কাজ করেও কি নারী স্বামী-সন্তানকে যথাযথ সময় দিতে পারবে? কাজের সময় তার অনুপস্থিতিতে তার সন্তান দেখাশোনা ও লালনপালন কে করবে? বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই ভাবতে হবে। কেননা, এটাই নারীর প্রথম ও প্রধান মৌলিক দায়িত্ব। যেমন তেমন যুক্তি দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া অবশ্যই ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক।

তবে মা যদি এমন কোনো কোল পেয়ে যান যাতে শিশুর অযত্ন হবে না, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক সব দাবি ও অধিকারই রক্ষিত হবে, তা হলে তার ফিরে আসার সময়টুকু পর্যন্ত শিশুকে সেই কোলে অর্পণ করে যাওয়ায় কোনো বাধা থাকার কথা নয়। কেননা, আমি মনে করি, সন্তানকে কী পরিমাণ সময় দেওয়া হলো সেটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তারচে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো, সন্তানকে যেটুকু সময় দেওয়া হলো কীভাবে দেওয়া হলো এবং তাতে তার তালীম তরবিয়ত কতটুকু হলো। অনেক নারীই আছেন, যাদের এক মুহূর্তের জন্যও বাইরে যতে হয় না; অথচ সন্তানের তালীম তরবিয়তে এমন কিছু করেন না যা তার মানসিক বিকাশ, আচার-ব্যবহার ও ধর্মীয় বিচারে কোনো রকম প্রশংসাযোগ্য। আবার অনেক কর্মজীবী নারী আছেন, যাদের অনেক বাইরে যেতে হয়; কিন্তু সন্তানের তালীম তরবিয়তের ব্যাপারে তিনি এমন কিছু করতে পারেন যা তাকে প্রশংসিত করে। তা হলে মূল বিষয়টি হলো মায়ের সচেতনতা এবং সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল ভূমিকা। বিচক্ষণ নারী তার প্রতিটি মুহূর্তকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করবেন। এক একটি মিনিট হিসেব করে কাজ করবেন। খুচরা সময়গুলোকেও কাজে লাগাবেন। এভাবে তিনি যদি জীবনটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেন, এবং সুপরিকল্পিত সময়স্চি অনুযায়ী নিয়মিত পরিচালিত করেন, তা হলে ইনশাআল্লাহ পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে পারবেন। সেই সাথে সময়সূচি অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে নিয়মিত কাজ করার অভ্যাস গঠন করার মাধ্যমে চাইলে পরিবারের কাজের পাশাপাশি বাইরের কাজও করতে পারবেন।

কিন্তু এটা খুবই কঠিন। একজন নারী এভাবে দ্বিমুখী দায়িত্বপালন করতে গিয়ে জীবন বড় ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। অনেকেই লাভের চেয়ে ক্ষতির শিকার হন। তাই ভেবে চিন্তে কাজ করা উচিত। তবে এটাও ঠিক যে, প্রকৃত সংকল্প থাকলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। শরীরের ক্লান্তি সে আর এমন কী! একটু বিশ্রামই কি যথেষ্ট নয় শরীরের অবসাদ দূর করার জন্য? কিন্তু অলস মনের অবকাশ—সে তো আরামে আরামে ঘুমিয়েও পূর্ণ হয় না।

যাই হোক, আমরা নারীকে কর্মের ময়দানে নামতে উৎসাহিত করছি না। কিন্তু ভাগ্য যাদের কাজে নামিয়েছে বা নামানোর বন্দোবস্ত করে ফেলেছে, তাদেরকে তাদের মৌলিক দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেন সময় ও সমাজের দায় মেটাতে গিয়ে নিজের মৌলিক দায়িত্বের কথা ভুলে না বসেন; বরং প্রয়োজনে মূলকেই প্রাধান্য দিয়ে সুস্থ ও সঠিক জীবনে ফিরে আসায় উৎসাহী হন।

মনে রাখতে হবে, নারীর কর্মজীবন ও ধর্মজীবন যেন পরস্পরবিরোধী না হয়। কর্মজীবন অবশ্যই ধর্মজীবনের অনুগত হবে। ধর্মজীবন কখনোই কর্মজীবনের অনুগত হবে না। এই মূলনীতিকে সামনে রেখে আমরা নারীর কর্ম ও কর্মক্ষেত্রসম্পর্কিত কিছু শর্তবিধি উপস্থাপন করছি। আশা করি, আমার মুসলিম ভগ্নিগণ তাদের কর্মজীবনে এই শর্তবিধি অনুসরণ করে মুসলিম নারীসমাজের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অক্ষত রাখবেন:

- ১. স্বামীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে কাজ করতে হবে। তাঁর অনুমতি ও সমর্থন ছাড়া কাজ করা যাবে না। কেননা, তিনি আপনার অভিভাবক। সাধ্যমতো আপনার ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁর।
- ২. অবশ্যই নারীকে নারীর প্রথম ও প্রধান মৌলিক দায়িত্ব (অর্থাৎ সন্তান লালনপালন, ঘর দেখাগুনা, স্বামীসেবা ইত্যাদি) এবং কর্মজীবনের দায়ের মধ্যে সমন্বয়, করার সক্ষমতা রাখতে হবে। তিনি যদি একজন আদর্শ মা হিসেবে সন্তান লালনপালন, একজন আদর্শ নারী হিসেবে পরিবার-পরিচালনা এবং একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে স্বামীর যাবতীয় হক আদায় করতে পারেন; এবং এ সবকিছু ঠিক রেখেও বাইরের কাজে সময় দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন, তা হলেই কেবল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি থাকবে। নয়তো ঘরে অবস্থান করে নারীর মৌলিক দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করাই হবে সুবুদ্ধির পরিচায়ক। বিশ্বাস করুন, আপনার দ্বারা দেশ ও জাতি এতেই অধিক উপকৃত হবে। আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্য অনিশ্বিত হবে না।

- ৩. নারী যে কাজটি করবেন, তা অবশ্যই শরীআহ-অনুমোদিত হতে হবে—যেমন : শিক্ষকতা, ডাক্তারি ইত্যাদি। যা শরীআহ-অনুমোদিত নয়, তাতে কিছুতেই কখনোই জড়ানো যাবে না—যেমন : অভিনয়, নৃত্য শরাব পান করানো ইত্যাদি।
- নারী যে কাজ করবেন, তা অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে ইসলামের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্দাব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটবে না।
- ৫. নারী অবশ্যই এমন কোনো কাজে নিজেকে জড়াবেন না যাতে পুরুষদের সাথে মিশতে হয়। কিংবা একান্তে পুরুষদের সাথে কাজ করতে বা কথা বলতে হয়।
- ৬. অবশ্যই পর্দার সাথে কাজে যেতে হবে, পর্দার সাথে কাজ করতে হবে। কখনোই নারীর সহজাত লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্যকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। মাথায় রাখতে হবে, যেন তার দ্বারা কিছুতেই তার প্রতি কোনো পুরুষের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ না হয়। নয়তো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে; সমাজে চারিত্রিক ফেতনা ও পাবিত্রিক ধ্বস নামিয়ে একটি
- যাদের শাস্তি হলো—'দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক আজাব'।

 ৭. কাজ অবশ্যই নারীপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

সমাজকে শারা নষ্ট করছে, সেই অপরাধীদের কাতারেই দাঁড়াতে হবে।

- উদাহরণস্বরূপ নির্মাণকাজে শ্রমিক হওয়া অবশ্যই নারীপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ৮. সাধ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী-সন্তানের প্রতি কার্পণ্য না করা। এ কথা
- না বলা যে, আমার টাকা আমি যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি খরচ করব। কেননা, স্বামী-সন্তানের সময়টুকু নিয়েই আপনি কাজ করছেন। তাদের প্রতি আপনার হিতাকাজ্ফা থাকতে হবে। যথাসম্ভব উপার্জন থেকে সংসারে অবদান রাখুন। সাধ্যমতো দানসদকা করুন। হয়তো এর উসিলায় আল্লাহ আপনার ক্রটিগুলোর মোচন ও মার্জনা করবেন।

দম্পতিযুগল পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে যদি স্ত্রীর কর্মজীবন বেছে নেয়, পরিবার ও সন্তানের দেখাশোনায় একে অপরের সহযোগিতার মানসিকতা পোষণ করে, তা হলে স্ত্রীর কর্ম—আশা করা যায়— পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সৌভাগ্যেরই কারণ হবে। দুঃখ, দুর্দশা ও ভাঙনের কারণ হবে না। যেমনটি শোনা যায় যে, অনেক পরিবারের দাস্পত্যকলহের একমাত্র কারণ হচ্ছে—নারীর কর্ম। যা একপর্যায়ে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে। কোনো পরিবারে যদি এমন আশঙ্কা থাকে, তা হলে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। যার যে বিষয়ের ধারণক্ষমতা নেই, তার সে বিষয়ে হাত দেওয়া মোটেই বিচক্ষণতার কথা নয়—নিরেট নির্বিদ্ধিতা।

জন্মনিয়ন্ত্রণ

আরব বিশ্বে অসংখ্য প্রচারমাধ্যম বরং অসংখ্য প্রোপাগান্তা উকি মারছে অনেক আগে থেকেই। বিশেষত জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারপ্রসার চলছে জোরেশােরে। বড় চিন্তাকর্ষক ভঙ্গিমায়, বাগাড়ম্বর ভাষায় চলছে অনবরত বক্তৃতা ও বিবৃতির ফুলঝুরি। দেখানাে হচ্ছে স্বামী স্ত্রী ও একটি সন্তান দ্বারা গঠিত ছােউ ছােউ পরিবারের নিখুঁত সুন্দর চিত্র। শ্রোগান দেওয়া হচ্ছে, সন্তান একটি হলে দুটি নয়, দুটি হলে আর নয়। বােঝানাে হচ্ছে, এরকম ছােউ ছিমছাম পরিবারে জীবন কত সহজ হয়, সুপের হয়। দাম্পত্যজীবন কত মধুময় লাগে, স্বপ্নময় লাগে। পক্ষান্তরে যদি সন্তানবেশি হয়, যদি পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায়, তা হলে জীবনে সেই স্বাচ্ছন্দ্য, সেই স্বপুময়তা ও মধুময়তা থাকে না। আর জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনকারিণী নারীদের সচিত্র স্বগতোক্তি তাে মাথা হেট করার মতাে। কিন্তু যত প্রোপাগান্ডাই হােক, চাইলেই তাে প্রকৃতিকে উন্টে দেওয়া যায় না। মা ও শিশুর ভালােবাসা যে প্রকৃতিগত বিষয়।

মূলত পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণেই এইসব প্রোপাগান্ডার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে বলা হয়, এভাবে যদি উদ্দাম গতিতে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, তা হলে অচিরেই এমন দিন আসবে, যেদিন ভূগর্ভ-ভূপৃষ্ঠ উভয়ই মানুষের প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হবে। অথচ তারা ভূলে যান যে, আল্লাহই এই পৃথিবীর শ্রষ্টা। তিনি যতদিন পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখবেন, ততদিন পৃথিবীর যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবেন। রিজিক একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ও ক্ষমতা কারও নেই। তিনিই ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান প্রতিটি জীবের রিজিকের দায়িতু গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَ فِي السَّمَاءِ رِزُقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ

فَوَرَتِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا آنَّكُمْ تَنْطِقُونَ

অর্থ : আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক, তোমাদের সাথে কৃত যাবতীয় প্রতিশ্রুতি। সুতরাং আসমান ও জমিনের রবের কসম, এই কুরআন বাস্তব সত্য—ঠিক যেমন তোমরা এখন কথা বলছ। –সূরা যারিয়াত, আয়াত : ২২-২৩

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِيْ كِتْبِ مُّبِيْنِ

অর্থ : পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই। তিনি (যেমন) তার আবাস সম্পর্কে অবগত, (তেমনি মৃত্যুর পর) তাকে যেখানে সোপর্দ করা হবে তাও তিনি জানেন। সবই লিপিবদ্ধ সুস্পষ্ট কিতাবে। –সূরা হুদ, আয়াত : ৬

কোনো মুসলিম রাষ্ট্রেই সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঢালাও জন্মনিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারি করা বা এর পক্ষে জনমত গঠনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে মোটেই সুখকর হবে না। বরং রাষ্ট্রের উচিত হবে, এমন যৌক্তিক নীতিমালা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাতে জনসংখ্যা জনসমস্যা নয়, বরং জনশক্তিতে পরিণত হয়। দেশের এক একটি সন্তান যেন অন্তত এক একটি অঙ্গনের এক একটি শূন্যতা দূর করতে পারে। আমরা মনে করি, জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশ ও জাতির শক্তি খর্ব করার চাইতে এদিকে মনোযোগী হওয়াই বেশি ভালো হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে অনেকে যুক্তি দেন, বেশি সন্তান হলে মা বাবার ওপর চাপ হয়ে যায়। তাদের সঠিক লালনপালন না হলে সামাজিকভাবেও ধ্বস নামে। সামাজিক অবক্ষয়, অধঃপতনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যে নারীর মৌলিক দায়িত্ব হলো ঘরে বসে সন্তান লালনপালন করা, সে নারীকে যদি নানা প্রোপাগান্তায় টেনে হেঁচড়ে রাস্তায় নামানো হয় এবং বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়ার নামে পরপুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করানোর ঢোল পেটানো হয়, তা হলে একটি বা দুটি সন্তানেরও এমন প্রতিপালন সম্ভব নয় যা সামাজিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষে ইতিবাচক। বরং এধরনের মা-বাবার জন্য দুটি কেন, একটি সন্তানও মানুষ করতে পারা কঠিন—তাই পোল্ট্রিফার্মের মতো কোনো শিশুপালন সংস্থারও সহায়তা নিতে হতে পারে।

তবে ইসলামের সরল সঠিক পথ সব সময়ই মধ্যমতা অবলম্বন করে। একদম বাড়াবাড়ি বা একেবারে ছাড়াছাড়ির মতো দুই প্রান্তিকতাকে ইসলাম কখনোই প্রশ্রয় দেয় না। সুতরাং মা যেন প্রতিটি শিশুকে যথাযথ আদর সোহাগ ও অধিকার দিতে পারে, সার্থকভাবে প্রত্যেকের লালনপালন করতে পারে, সেজন্য ইসলাম স্বামী-দ্রীকে প্রতি দুই গর্ভধারণের মাঝে যৌক্তিক ব্যবধান রাখার সুযোগ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ 'حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهُنٍ وَ فِطلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ شُكُولِيْ وَلِوَالِدَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ: আমি মানুষকে উপদেশ দিয়েছি পিতামাতার প্রতি সদাচারের কেননা, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছেন। তার দুধ ছাড়ানোর সময়কাল ছিল দুই বছর। আমি মানুষকে উপদেশ দিয়েছি এই মর্মে যে, তুমি আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। মনে রেখো, আমার কাছে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। –সূরা লুকমান: ১৪

অনুরূপভাবে যদি এমন হয় যে, মা পরপর প্রত্যেক সন্তানের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নন, যাতে তাদের দেখাশোনা ও লালনপালনে ঘাটতি দেখা দেয়, যা তাদের জীবনকে সুখময় শান্তিময় করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে তো একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ কাউকেই তার সামর্থের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না। তা ছাড়া, দায়িত্বপূর্ণ দেখাশোনা ও অর্থপূর্ণ লালনপালনই

ফিরে এসো নীড়ে

ইসলামে কাম্য। নিছক সন্তানের আধিক্য কখনোই ইসলামে কাম্য নয়। আবার এই কথাটাকে আইনের ফাঁকফোকর হিসেবে গ্রহণ করাও কোনো মুসলমানের সাজে না। কেননা, আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। তিনি গুপ্ত ব্যক্ত সবই অবগত। কোনো কিছুই তার কাছে গোপন থাকে না।

অনুরূপভাবে যদি এমন হয় যে, সন্তান নিতে গেলে নারীর জীবনের ঝুঁকি দেখা দেয়, তা হলেও তার জন্য সন্তানগ্রহণ থেকে বিরত থাকার বৈধতা ইসলামে আছে। কেননা, শরীআতের মানশা হলো মায়ের জীবন রক্ষা করা। মা-ই তো আসল। মা বেঁচে থাকলেই না সন্তান জনা নেবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ফিরে এসো নীড়ে

বিগত কয়েক শতাব্দী মুসলিম নারী আপন মহিমায় ছিল ভাস্বর। পর্দার আড়ালে সুরক্ষিত মণিমুজোর মতো দেদীপ্যমান। ঘরের সিংহাসনে সমাসীন মহিমাময়ী মালিকান। ঘরে বসে গড়ে মহামানব, মহাবীর, মহাজ্ঞানী। মুসলিম নারীর এই অবিচল অবস্থান নিশ্চিত করেছিল মুসলিম জাতির অপ্রতিহততা, অপ্রতিদ্বন্দিতা; নিশ্চিত করেছিল মুসলিম দুর্গের দুর্ভেদ্যতা, দুর্লজ্ঞতা।

তাই ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী ছিল হয়রান পেরেশান। তাদের নুনখাওয়া গুণগাওয়া পদলেহীরাও ছিল হতবাক হতবৃদ্ধি। মুসলিম দুর্গের দুর্ভেদ্যতার সামনে তাদের সকল শ্রম, সকল সাধনাই যেন পণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু যারা ইসলামের আজন্ম শক্রু, তাদের কি আর সহ্য হয়? তারা কি আর বরদাশত করতে পারে? মুসলিম উম্মাহর শক্তি, সামর্থ, সংহতি; আত্মিক বিপুল সমৃদ্ধি, জাগতিক বিশাল শান-শওকত তাদের কি হিংসার অনলে পোডায় না?

অবশেষে তারা মরণকামড় দিতে উদ্যত হলো। ষড়যন্ত্র ও শলাপরামর্শের মহড়া দিতে শুরু করল। তাদের একটাই লক্ষ্য—কী করে মুসলিমসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করা যায়? তারা সমগ্র শক্তি নিয়োগ করল শুধু একটি বিষয় উদ্ঘাটনে—যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী

ফিরে এসো নীডে

কী করে একটি জাতি এমন অপ্রতিহত এমন অপ্রতিন্দ্বন্দী থাকতে পারল? কী এমন আছে যা তাদেরকে বার্ধক্য, জরাজীর্ণতা, ঘুণে-ধরা ও পোকায় খাওয়া থেকে রক্ষা করছে এতটা কাল?

অবশেষে তারা সিদ্ধান্তে পৌছে গেল। মুসলিমজাতির শক্তির রহস্য উদ্যাটন করে ফেলল। তারা আবিষ্কার করল, মুসলিম জাতির শক্তির রহস্য—আর কিছু নয়, মুসলিম নারী—যে নারী বিরল কিছু গুণে গুণান্বিত, অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। যার মনোবল ইস্পাতকঠিন, অবিচলতা পর্বতপ্রমাণ। যিনি সত্যকথনে নির্ভয়, নির্মোহ। যিনি পারেন সত্যিকারের মুমিন মুন্তাকী একটি নতুন প্রজন্ম জাতিকে উপহার দিতে প্রতিটি যুগে, প্রতিটি শতান্দীতে; যারা আপন ঈমান ও আকীদার প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল, এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের মূলে কঠিনভাবে গ্রথিত। ...

তারা মুসলিম নারীকে টার্গেট করল। ছলে বলে কৌশলে তাকে নিজ ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে লাগল। টোপ হিসেবে ব্যবহার করল তথাকথিত প্রগতি নামের আপাতমধুর শ্লোগান।

গ্লাড স্টোন, ইংল্যান্ডের (তৎকালীন) প্রধানমন্ত্রী, বৃটেনের গণসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছিলেন,

"যতদিন মুসলিম নারীর হিজাব উঠিয়ে দেওয়া না যাবে এবং যতদিন মুসলমানদের কুরআন বন্ধ করা সম্ভব না হবে ততদিন প্রাচ্যের অবস্থা আমাদের অনুকূলে আসবে না।"

আলেক্স যুমার ১৯০৬ সালে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান মিশনারিতে নিয়োজিত কর্মী, পরামর্শক ও শুভানুধ্যায়ীদের মুসলিমবিশ্বে কীভাবে মিশনারি তৎপরতা চালাতে হবে তারই দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যে বড় ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন,

"আপনারা কাজ চালিয়ে যান। হতাশ হওয়ার কিছু নেই। বরং আমরা আশার আলোই দেখতে পাচ্ছি। কেননা, বাস্তবতা এই যে, মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য সভ্যতা, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নারী-স্বাধীনতার প্রতি ভীষণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে।"

১. আওদাতুল হিজাব : ১/৯৯।

আন মেলিজিয়ান, খ্রিস্টধর্মের জনৈকা নারী স্বেচ্ছাসেবক, খুব আনন্দের সাথে মন্তব্য করেছেন.

"আমরা কায়রোর মহিলা কলেজে একসাথে অনেক মেয়েকে আমাদের সারিতে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছি। এদের অধিকাংশের পিতৃপদবি হলো পাশা। সত্যিই খ্রিস্টান মিশনারিতে একসাথে এতগুলো মুসলিম মেয়ে পাওয়া দুষ্কর। এই বিদ্যালয় থেকে মুসলিম দুর্গে আঘাত হানার এটাই মোক্ষম সময়।"

মুসলিম নারী পর্যন্ত পৌছার জন্য শুরু হলো ইসলামবিদ্বেষীদের ছক আঁকা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। তারা প্রথমে মিশরের মেধাবী মুসলিম তরুণ-তরুণীকে শিকার করাই বলি আর হাত করাই বলি, করতে লাগল। তারপর নিজেদের উদ্যোগে পাশ্চাত্যের ফ্রান্স ইংল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলোতে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠাতে লাগল। আজকের রিফাআহ তাহতাবি, কাসিম আমিন, হুদা শারাভি কিন্তু এদেরই পরম্পরা।

এরা পশ্চিমা দেশগুলোতে থেকে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতা রপ্ত করে দেশে ফেরে। তারপর নিজের দেশের তরুণ-তরুণীর মাথা খাওয়া শুরু করে। বড় নির্লজ্জভাবে নিজ দেশের সভ্যতা সংস্কৃতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতে থাকে। সেই সাথে পশ্চিমা নোংরামিগুলোর গুণগানে থাকে পঞ্চমুখ। যেন বাপ-চাচা, মা-খালা সব কুয়ার ব্যঙ্গ তিনি এসেছেন সাগর ঘুরে।

এই যে রিফাআহ তাহতাবি! তিনি কী করলেন? একদম নির্বোধ নির্লজ্জের মতো প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, "খোলামেলা চলা আর ছেলেমেয়ে অবাধে মেলামেশা করা এতে খারাপ কী আছে? ইউরোপের রাস্তায় যদি নাচগান কর, তা হলে একে পাপ বলে না। একে বলে তারুণ্য, উচ্ছলতা।"

তারই ভাবশিষ্য কাসিম আমিন ফ্রান্স থেকে ফিরতে না ফিরতেই রাতারাতি মহামনীষী বনে গেলেন একটি বই লিখে—তাহরীরুল মারআহ (নারী-স্বাধীনতা)। বইটি যেন তাক লাগিয়ে দিল পুরো মিশরবাসীকে।

১. আওদাতৃল হিজাব : ২/২১।

ভাবতেও অবাক লাগে, তিনি যে নারী-স্বাধীনতার ডাক দিলেন, তার মূল উপজীব্য নাকি এই একটি বাক্য—'আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি,

যেদিন মিশরের মেয়েরাও ধর্মকথা ও পর্দাপ্রথার বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসবে এবং আমার 'ইউরোপিয়ান সিস্টার'দের মতো 'মুক্ত বিহঙ্গ' হয়ে উদার আকাশে উডাল দেবে।'

আরও আশ্চর্যের বিষয়, নারী-স্বাধীনতার নামে মিশরের মুসলিম নারীদের সাথে যারা ফ্রাড খেলা শুরু করেছিলেন, তাদের দলে যে শুধু পুরুষই আছেন তা নয়, নারীও আছেন।

পুরুষই আছেন তা নয়, নারাও আছেন।

হুদা শারাভি। সে-সময়ের নারী আন্দোলনের অদ্বিতীয় নাম। প্রাচ্যের
প্রতীচ্যের বিভিন্ন নারী সংস্থায় ছিল তার দৃপ্ত পদচারণা। ১৯২৩ সালে
ইটালির রাজধানী রোম নগরীতে প্রথম যে নারীবিষয়ক আন্তর্জাতিক
সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিনি সেই সেমিনারেও উপস্থিত

হয়েছিলেন। মিশরে ফিরতি পথে সফর করেছিলেন সমুদ্রে। জাহাজে উঠে মিশরের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে হাজার বছরের মুসলিম ঐতিহ্যকে লাথি মেরে মুসলিম জাতির গর্ব, অহংকার ভেঙে চুরমার করে নিজের মাহাত্য্য নিজের আভিজাত্যের প্রতীক, যা তাকে চির সম্মানে ভূষিত করে রেখেছিল এতটা কাল, সেই হিজাবটি খুলে ফেললেন এবং সামনে ছুটে চলা জাহাজ থেকে পেছনে ছুটে চলা সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন— অগণিত পরপুরুষের সামনে লক্ষ কোটি মুসলিম নারীকে অপমানিত করে, 'পর্দাপ্রথার শৃঙ্খল' ভেঙে বেরিয়ে পশ্চিমা 'মুক্ত বিহঙ্গ' হয়ে, চৌদ্দশো বছরের রক্তমাখা মুসলিম শহীদী কাফেলাকে পদদলিত করে। বিনিময়ে যা

পেলেন তা কিছু ফিরিঙ্গিপনা বাহবা ও করতালি, এবং কিছু নীরব নিস্তব্ধ ব্যথিত হৃদয়ের রক্তক্ষরণের দায়ভার। কিন্তু তার চোখে মুখে যা ছিল তা কোনো অজানা অ-বোঝা অহংকারের ক্ষূর্তি বৈ কী!
তিনি ফিরে এলেন কায়রোতে। বিশ্বজয়ের আনন্দ নিয়ে। তথাকথিত

নারী-আন্দোলনের মহানায়িকা হয়ে। ইটালির সেমিনার থেকে অর্জিত শিক্ষার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করলেন একটি সংস্থা—মিশরীয় নারী ঐক্য। সংস্থার মূল সুর যেন ইটালির সেমিনার থেকেই ভেসে আসে। নারীর অধিকার চাই। সমান অধিকার চাই। পুরুষের সাথে মিলেমিশে কাজ করলে ক্ষতি কী? কার সাথে মিশব না-মিশব, কখন মিশব, কীভাবে মিশব সেটা আমার ব্যাপার, এখানে বাধ্যবাধকতা কীসে? কীসের হিজাব, কীসের নেকাব? তালাকের অধিকার চাই। পুরুষের অভিভাবকত্ন মানি

না। পুরুষ যদি চারটে বউ রাখতে পারে তা হলে আমরা...? ইত্যাদি ইত্যাদি অকথ্য অশ্রাব্য আজগুবি সব কথাবার্তা। প্রবৃত্তির অনুগামী হলে যা

হয়। অনেকটা শেয়ালের হ্কাহ্যার মতো। বুঝে হোক না বুঝে হোক, প্রোপাগান্ডায় সুর মেলানোই আধুনিকতা। সুর না মেলালেই সেকেলে, কৃপমন্তুক, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইত্যাদি।

মিশরের এই নারী-আন্দোলনের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর ঔৎসুক্য ছিল তাক লাগানোর মতো। এক কথার তারা মুক্ত হস্তে দান করা শুরু করে দিল। উডোলুসি নিজে মিশর চলে এলেন মিশরে নারী-আন্দোলনের অগ্রগতি এবং কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য।

হুদা শারাভির আন্দোলনকে গতিশীল করতে এগিয়ে এলেন দুররিয়্যাহ শাফিক। প্রাচ্যের নিয়মনীতিকে তিনিই সবচে বেশি দুঃসাহসিকতার সাথে আঘাত করতে লাগলেন। পশ্চিমা নারীর অনুসরণই যেন তার কাছে জীবনে সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিলেন.

'যারা সত্যিই অনুসরণের যোগ্য, আমরা তাদেরই অনুসরণ করব। মিশরীয় নারীদের অনুসরণের যোগ্য একমাত্র পশ্চিমা নারীরাই। বিশেষত বৃটেনের মহারাণী।'

দুর্রিয়্যাহ শাফিকের দল ভারী করে আরও একজন মহামতির

আবির্ভাব হলো। আমিনা সাঈদ। তিনি নারীবিষয়ক একটি পত্রিকা বের করতে লাগলেন। নাম দিলেন হাওয়া (ইভ)। হাওয়া নামের 'হাওয়া' দিয়েই পশ্চিমা বিষ ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন মিশরীয় নারীদের মনে। তিনি স্বামী এবং অভিভাবকের সাথে অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও স্বেচ্ছারিতার উসকানি দিতে লাগলেন চিমটি কাটার মতো করে। অজহাত—পরুষের

উসকানি দিতে লাগলেন চিমটি কাটার মতো করে। অজুহাত—পুরুষের আধিপত্যকামিতা। দাবি—দাসত্ব থেকে মুক্তি, আর একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে, মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি। তার বিষোদ্যারের শিকার হলো ইসলামের মাহাত্ম্যপূর্ণ শৈলী—পর্দাব্যবস্থা। বিষোদ্যারের শিকার হলো মুসলিম নারীর সবচে বড় গুণ, সবচে বড় মাধুরী—সতীত্ব। তিনি পর্দাব্যবস্থা নিয়ে যে শ্লেষাত্মক উক্তিটি করেছেন, তা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেছেন:

"মেয়েরা পুরো শরীর ঢেকে ভুতের মতো হয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে এটাই কি ইসলাম? একটা জীবন্ত মেয়েকে না মরেই কফিনে পুরিয়ে দেওয়া কি ইসলাম ও মুসলামনের জন্য খুবই জরুরি?"

উপনিবেশিক গোষ্ঠীর ভাবশিষ্যরা নারী-স্বাধীনতা ও নারীমুক্তির জোর প্রচারণা চালাতে থাকলেন। তাদের নিরীহ নির্দোষ শব্দপ্রয়োগের ছ্মাবরণ, মনচাহি হাঁকডাকের চাকচিক্য অনেক মিশরীয় মেয়েকেই মোহাবিষ্ট করল। অনেক মেয়েই পর্দার বিষয়ে এখন স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী। তারা প্রথমে হাত ও মুখ খোলা শুরু করে। তারপর মাথা, তারপর পায়ের গোছা, তারপর রান। শালীনতার জন্য সাধারণ ওড়না ব্যবহারও বিদায় নেয় মাঝামাঝি কোনো পর্যায়ে। নামেমাত্র যা থাকে—শুধুই ফ্যাশন।

ধীরে ধীরে বিষয়টি গড়াল ধর্মীয় বিধিনিষেধ এবং সামাজিক রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পর্যন্ত। আজ রাস্তাঘাট দোকানপাট শপিংমল থেকে শুরু করে লেক পার্ক ধর্মালয় বিদ্যালয়—কোনো কিছুই অশ্লীলতামুক্ত নয়। আর বিনোদনের নামে অশ্লীলতার জন্যই যেসব জায়গার উৎপত্তি হয়েছে সেসব এখন রীতিমতো...। আল্লাহ মাফ করুন।

পর্দাবিরোধিতা, চরিত্রের বন্ধনহীনতা এক জাতীয় লাগামহীন পাগলা

ঘোড়ায় পরিণত হলো। কর্মমুখর ব্যস্ত সড়কে, ব্যস্ত শহরে, ব্যস্ত অফিসে পুরুষের ভিড়ে নারীরাও ঢুকে পড়ল। কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। কলকারখানার বড় বড় যন্ত্রপাতির বিকট আওয়াজে নারী-পুরুষ ঘুরপাক খেতে লাগল একসাখে। কিছুটা স্বনির্ভরতা, কিছুটা স্বাধীনতা, কিছুটা আনন্দ ভুলিয়ে দিল নিজের ঘরকে, নিজের সন্তানকে, নিজের স্বামীকে। ক্ষণিকের এই মায়ামোহ নারীকে দূরে সরিয়ে দিল তার প্রকৃতিপ্রদন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে। সে যে কারও মা, সে যে কারও মেয়ে, সে যে কারও স্ত্রী, সে যে কারও বোন; তার যে একটা ঘর আছে, সে যে কোনো ঘরের মালিকান, দূর থেকে দেখা মরীচিকা সবই বিশ্বত করল তাকে।

স্বামীর অবাধ্য হলো। আল্লাহর অবাধ্য হলো। ঘর ছাড়ল। সম্মানের আসন থেকে নেমে এল। ছুঁড়ে ফেলে দিল মাহাত্য্যের মুকুট। খুলে ফেলে দিল মাথার তাজ—হিজাব, নেকাব। মনে মনে মনকলা খাওয়ার মতো হয়ে গেল মুক্ত স্বাধীন। পুরুষ তার পেছনে ছোটে এই তার গর্ব। ছেলেরা তার জন্য জীবন দিতে চায় এই তার সফলতা। প্রবৃত্তিকামীরা চোখ বড় বড় করে। রোগামনেরা হাত বাড়ায়, লক্ষঝক্ষ করে। বোকা মেয়ে আনন্দে আত্মহারা। বিষময় চলাফেরায় মনে আনন্দ ধরে না। সুখময় মেলামেশায় যেন বিশ্ব জয় হয় ক্ষণে ক্ষণে। তাই এতেও হয় না; নাচে, গায়, অভিনয় করে, ফ্যাশন করে। আরও কত কী!

কিন্তু ফল কী হয়, বোন? যখন ঘোর কেটে যায়, যখন জীবন যৌবন সব শেষ হয়ে যায়, তখন নিজেকে আবিদ্ধার করে তিক্ত বাস্তবতায়, কোনো ঘন কালো অন্ধকারে। দেখে, সে কোনো স্বার্থের বলি, কারও লালসার বলি। খুব সন্তায় অন্যের হয়ে কাজ করেছে সে। কোনো অজানা ঘোরে খুইয়ে ফেলেছে সর্বস্থ। সে কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার, কোনো চক্রান্তের ক্রীড়নক। যে চক্রান্ত, যে ষড়যন্ত্র তারই বিরুদ্ধে, তারই জাতির বিরুদ্ধে, তারই দেশের বিরুদ্ধে। এ চক্রান্তের চাকা আবর্তিত হয়েছে মুসলিম পরিবারব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে, মুসলিম সমাজব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে দিতে। একটু ভুলের কারণে বড় চড়া মূল্য দিতে হলো তাকে। নিজের সম্মান, নিজের সম্রম, নিজের সবকিছুর সাথে সাথে নিজের দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ।

আর তার পৃষ্ঠপোষকরা, যারা বাহবা করতালি ও শিসধ্বনি দিয়ে উৎসাহ যুগিয়েছিল, অর্থ খ্যাতি ও সম্ভাবনার জগতে ডাহুক হয়ে ডাক ছেড়েছিল, কথার ফুলঝুড়িতে ষোড়ষী সপ্তদশী কুমারীদের মাতিয়ে রেখেছিল, তারাই প্রথম তাকে উপেক্ষা করে। তাদের কাছে তার কোনো মূল্যই থাকে না। সত্যিই, ওসব লোকের কাছে চামড়া-জড়া বুড়ির কী বা মূল্য থাকতে পারে?

ভাবা উচিত, এমন উদাহরণ কম নয় যে, অনেকে নারী-স্বাধীনতার জোর প্রবক্তা; চাতুর্যের সকল শৈলী প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলেন; অথচ ব্যক্তিজীবনে নিজেই নারী-স্বাধীনতা নামের তামাশা থেকে মুক্ত। এই যে কাসিম আমিন। তিনি মিশরে নারী স্বাধীনতার নামে পর্দাপ্রথার প্রতি কেমন বিষোদ্গার করেছেন। অথচ

নিজের স্ত্রীকে পর্দাপ্রথার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে দেননি। এমনকি, নিজের ছড়ানো প্রোপাগান্ডার ব্যাপারে নিজের ঘরানাদের রেখেছেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তাই তো তার স্ত্রী শরঈ পর্দার পূর্ণ পাবন্দি করেন। শুধু তাই

নয়, প্রায়ই তার পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি আসে যে, তার স্বামী, যেমনটা লোকে বলে যে তিনি সমাজে অনাচার ছড়াচ্ছেন, তেমন নন। তিনি কখনোই খোলামেলা চলা এবং অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নন। তিনি

শরঈ পর্দার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল। এসব লোকের মিখ্যাচার ও অপব্যাখ্যা।

জনাব আবদুল কুদ্দুস সাহেবের কথা তো বলাই বাহুল্য। তিনি এ পর্যন্ত কতগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার রচিত অনেক উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নও হয়েছে। তার অধিকাংশ উপন্যাসই ধর্মীয় মূল্যবোধকে আঘাত করে রচিত। নারীদের ধর্মবিদ্বেষে প্রলুব্ধ করে এমন লেখা তার কম নয়। অথচ কাণ্ড দেখুন, উপন্যাসিক আবদুল কুদ্দুস এবং বাস্তবজীবনের আবদুল কুদুসের মাঝে কেমন আকাশ পাতাল ফারাক। তিনি স্ত্রীকে বাইরে বের হতে দেন না। চাকুরি করতে দেন না। অথচ তার স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি আবদুল কুদ্দুস স্ত্রীর প্রতি খুবই কঠোর। পত্রপত্রিকায়, টেলিভিশনের পর্দায় আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও স্ত্রীকে আসতে দেননি; এমনকি, তার ছবিও প্রকাশ হতে দেননি।

প্রিয় বোন,

বলুন তো, এমনটা কেন হয়? ...কারণ তিনি ওপরে ওপরে যা-ই বলুন, ভেতরে ভেতরে ভালো করেই জানেন যে, একজন নারীর প্রথম ও প্রধান মৌলিক কর্তব্য হলো একজন মমতাময়ী মা হওয়া, একজন সতীসাধ্বী স্ত্রী হওয়া।

আমরা যেই আবদুল কুদ্দুসের কথা বলছি, কে না জানে, তিনি ছিলেন একজন কর্মজীবী নারীর সন্তান। তার মা বহুল প্রচারিত 'রোয ইউসুফ' পত্রিকাতে কাজ করতেন। কিন্তু পুত্র আবদুল কুদ্দুস মাকে আর কাজ করতে দেন না। তিনি চান, মা বাইরের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে অবসর যাপন করুন।

ফিরে এসো নীড়ে

তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। কিন্তু হুঁশ হওয়ার পর, ঠক-প্রতারকের মিথ্যা, প্রতারণা বুঝতে পারার পর, এখন আল্লাহর কাছে তওবা করে আবার ইসলামের সরল সঠিক পথে ফিরে এসেছেন। আবার নিজে নিজে ধরা দিয়েছেন পর্দাপ্রথার 'শৃঙ্খলে', বরণ করে নিয়েছেন 'চার

দেয়ালের বন্দিনীর দশা'।

আরববিশ্বে এমন অনেক মুসলিম নারী আছেন, যারা একসময়

একসময়ের দুনিয়া কাঁপানো মডেল সাহির বাবেলি। ছোট পর্দার ছিলেন হট কেক। আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেছেন। সর্বশেষ সাক্ষাতকারে আফসোসের সাথে বলেছেন, "আমি যখন অভিনয় করতাম, তখন কত চ্যানেল আমার পেছনে পড়ে ছিল। একেকটি সাক্ষাতকারের জন্য কত উপহার উপটৌকন জমে যেত। অথচ আজ আমিই যদি হিজাব পরে নারী-বিষয়ক ধর্ম ও সভ্যতার কথা বলতে চাই, তা হলে একটি

পরে নারী-বিষয়ক ধর্ম ও সভ্যতার কথা বলতে চাই, তা হলে একটি চ্যানেলেও আমাকে সুযোগ দিতে সম্মত হবে না।" প্রখ্যাত চলচিত্রশিল্পী শামস বারুদি বলেন, "যখন যশ খ্যতি অর্থ দি বৈভব সবই হাতের মুঠোয় ধরা দিল, তখন আমার মনে প্রায়ই একটি এ

জাগতে লাগল, এত কিছুর পরও আমি সুখী নই কেন?" শামস বারুদি

নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কারণ আমি বুঝতে পারতাম, আমি এমন একটি কর্ম বেছে নিয়েছি, যা আমার নারীত্বকে কুরে-কুরে খাচ্ছে প্রতিমুহূর্ত। এটা আমার প্রকৃতির সাথে বেমানান। এরপর থেকে আমি অনেক কাজ হেলায় ছেড়ে দিতে লাগলাম। এ আশায় যে, আমি আমার নারীত্ব, আমার হারানো সম্মান ফিরে পাব। আমি আল্লাহকে খুব ডাকতাম, যেন তিনি আমাকে এই জগত থেকে দূরে সরিয়ে নেন এবং সত্য ও সুন্দরের পথে পরিচালিত করেন।" তিনি বলেন, "আমি আমার অতীতের স্মৃতিচারণ করতে চাই না। আমি চাই, যদি ওসব আমার জীবন থেকে একদম মুছে যেত।"

শামস বারুদি ইসলামের শীতল ছায়ায় ফিরে এসেছেন। তিনি আল্লাহর পথকেই নিজের জীবনের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অনিষ্টকারীরা বসে থাকেনি। তারা প্রতিনিয়ত সত্যাশ্রয়ী নারীটিকে নিয়ে ধুশ্রজালের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যে আল্লাহর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেয়,

ফিরে এসো নীডে

আল্লাহ তার সহায় হন। আল্লাহ শামস বারুদির মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তিনি নিজে খরচ করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও টিভি চ্যানেলে নিজের অবস্থানের কথা সুস্পষ্ট করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি তওবা করেছেন। তিনি ওই জগত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি প্রতিটি মুসলিম তরুণীকে, প্রতিটি মুসলিম নারীকে উদান্ত আহ্বান জানান ইসলামের পর্দার পাবন্দি করার, ইসলামের বিধিনিষেধকে আঁকডে ধরার।

এমন উদাহরণ পশ্চিমা নারীদের মধ্যেও আছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত অভিনেত্রী ব্রিজেত বারদো। পুরো জীবন কার্টিয়ে দিয়েছেন হৈ হুল্লোড় আর আমোদ ফুর্তিতে। শরীর আর সৌন্দর্যই ছিল জীবনের সবকিছু। কিন্তু জীবনের পড়ন্ত বিকেলে এসে তার আক্ষেপ শুনুন—

"জীবন থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা এই যে, হাজার হাজার আবেগ-উচ্ছুসিত প্রণোদনামূলক চিঠি, বিমুগ্ধ বিমোহিত কোটি কোটি দর্শকচিত্তের করতালি জীবনের বাস্তবতায় একজনমাত্র বিশ্বাসী পুরুষের একটি বাহুর সমান হতে পারে না, যা আমাকে জড়িয়ে রাখে ভালোবাসায়; যা আমার অন্তরে স্বস্তি আনে, অভয় দেয়। আমার বিপুল বৈভব ছিল। যশ খ্যাতি ছিল। অনেক অর্জন ছিল। কিন্তু জীবনের চরম বাস্তবতায় আমি ব্যর্থ। আমার প্রাপ্তির খাতা শৃন্য। আমি তাই মানুষ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাকি জীবনটা নীরবে কাটিয়ে দিতে চাই। মিডিয়া থেকে অনেক দূরে।"

তিনি আরও বলেন,

"আমাকে চেনে এমন মানুষ অনেক। কিন্তু আমার বন্ধু বলতে যারা আছে, হাতে গোনার মতো। আমার ছেলের কথাই বলি। সে যখন ছোট ছিল, তখন আমি তাকে গুরুত্ব দিইনি; সুতরাং আমি যখন বৃদ্ধা হয়েছি, তখন সে আমাকে গুরুত্ব দেবে এমনটা আমি আশা করতে পারি না।"

বণিকমহল নারীস্বাধীনতার বিষয়টিকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাণিজ্যিক প্রচারণায় তাদের কাছে সবচে কার্যকরী মাধ্যম হলো

১. কিতাবুম মিন আ'লামিশ তহরাহ ইলা রিহাবিল ঈমান : ৩৫-৩৬।

২. রিসালাতুন ইলা হাওয়া : ৩/২৪-২৫।

নারী। পণ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিবসনা, স্বল্প-বসনা নারী এবং নারীর উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ ছবির কোনো জুড়ি নেই। বৃটিশ নারী-স্বাধীনতা সংস্থাগুলো এভাবেই নারী-স্বাধীনতার নামে নারী-অবমাননার পাঁয়তারা

করেছে। বামপন্থী টনিবনও এব্যাপারে জার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কেননা, তিনিও মনে করেন, এটা কার্যত নারীর অবমাননা।

বড় বড় বস্ত্রালয়গুলোতে নারীদেহকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, তা রীতিমতো উপহাস। ফবইয়ান নাম্নী ফ্রান্সের জনৈকা ফ্যাশনগার্ল 'আল মুসলিমুন' পত্রিকার একটি একান্ত সাক্ষাতকারে বলেন,

খুব অল্পতেই খ্যাতির স্বাদ পাই। উপঢৌকনে আমার ঘর ভরে যায়। আমি এত সহজে এত কিছু পাব, স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু আমাকে যে মূল্য দিতে হয়েছে, তা অনেক চড়া। ...

"এ পথে আসা সহজ ছিল। কিংবা আমার কাছে সহজ মনে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে এখানে সফলতার পথ একটাই—আবেগ অনুভূতি বিসর্জন দিতে হবে, লজ্জা শরম ঝেড়ে ফেলতে হবে, বোধশক্তিকে নিদ্রিয় করে দিতে হবে, আত্মসম্মানকে গলা টিপে হত্যা করতে হবে; বেশি বোঝা যাবে না. বেশি ভাবা যাবে না।

তোমার দীপ্তিময় ভরা যৌবন; দেহের শৈল্পিক সঞ্চালন ও গানের সুর
মূর্ছনা। আকর্ষণ ধরে রাখতে জগতের সব সুস্বাদু খাবার বর্জন করা,
পাশাপাশি নিয়মিত বলবর্ধক ও উত্তেজক দ্রাগ ও মেডিসিন গ্রহণ করার

তোমাকে যা ধরে রাখতে হবে—তোমার দেহ, তোমার রূপ-লাবণ্য,

পাশাপাশি নিয়মিত বলবর্ধক ও উত্তেজক দ্রাগ ও মেডিসিন গ্রহণ করার কথা বাদই দিলাম। তারা আমাকে একটা জীবন্ত মূর্তি বানিয়ে রেখেছিল। আমার কাজ

ছিল ক্রেতাদের মন মস্তিষ্ক নিয়ে খেলা করা। আমি যেন কোনো জড়পদার্থ ছিলাম, যে নির্দিষ্ট ছকে অঙ্গসঞ্চালন করতে জানে, নির্দিষ্ট চঙে মিটিমিটি হাসতে জানে; কিন্তু সে নিষ্প্রাণ, নির্জীব; তার কোনো অনুভূতি নেই।

সেখানে প্রতিদিন বস্ত্রালয়ের বস্ত্র শরীরে ধারণ করতে হয়; তার আগে দেহ থেকে নারীত্ব ও মনুষ্যত্বের বস্ত্র খুলে ফেলতে হয়। নয়তো এই

নিষ্ঠুর পৃথিবী তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তুমি যদি কোনো স্টেপে ভুল

কর, তা হলে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে, যা একই সাথে মানসিক ও শারীরিক।...

একজন ফ্যাশনগার্ল হিসেবে পৃথিবীতে বিচরণ করেছি। ফ্যাশনের যোলকলা প্রয়োগ করে, নিজের নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছি, কিন্তু তারা আমার কেউ নয়, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই; আমার কষ্ট হতো, যখন দেখতাম, তাদের কাছে আমার ব্যক্তিসন্তার কোনো মূল্য নেই। যত মূল্য—আমার গড়নের, আমার পরনের পোশাকের।"

এককালের স্থনামধন্য ফ্যাশনগার্ল ফবইয়ান এভাবেই নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ তাকে তওফিক দান করেছেন, তিনি সেই অভিশপ্ত জীবনের নরকভোগ থেকে পালিয়ে ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

প্রিয় বোন,

একটু তো ভাবুন, পৃথিবীতে বঞ্চনার আর কোনো উদাহরণ আছে কি, যা একজন নারীর নারীতৃকে বিসর্জন দেওয়ার চাইতেও নির্মম; যাকে জীবন্ত দাসী বানিয়ে রাখা হয় তার সম্মান ও সম্রুম নিয়ে খেলা করার জন্য, তার নারীতৃকে পদদলিত ও নিম্পেষিত করার জন্য, তার লজ্জাকে লালসার বেদিতে বলি দেওয়ার জন্য?

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে কী ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। ইউরোপিয়ান সামাজিক নিরীক্ষণ সংস্থার একটি জরিপ শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। তাদের গবেষণায় বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী আশি ভাগ বৃটিশ নারী একা একা লন্ডনের রাস্তায় চলতে ভয় পান। কারণ ধর্ষণ ও অপহরণের ভয় প্রতিমুহূর্ত তাদেরকে তটস্থ করে রাখে। প্রকাশ থাকে যে, এ বয়সের প্রতি চারজনে একজন নারী রাজধানীর রাস্তায় বের হলে ব্যাগের মধ্যে চাক বা পিস্তল রাখেনই।

১. মিন আ'লামিশ ওহরাহ ইলা রিহাবিল ঈমান : ১২-১৩।

২. সুরাখুল ফিতরাহ : ২৪।

কানাডার তথ্যমন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তা মাসহাকুমি প্রকাশ করেছেন যে, কানাডায় বসবাসরত বেশি অর্থেক নারীই যৌন হয়রানি ও দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। একটি প্রতিবেদনে এসেছে, গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যৌননির্যাতন করে অভ্যন্ত। তারা এটাকে কোনো অপরাধ মনে করে না। বরং এটা তাদের দৃষ্টিতে একটি সাজামাত্র। নারীকে ভয় দেখানোর, শান্তিপ্রদানের বা তার সংশোধনের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। আন্চর্যের বিষয়, নারীর প্রতি এরকম জঘন্য অপমানকর কর্মকাণ্ডের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও ওসব দেশের বিচারব্যবস্থায় নারী উত্ত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানি বা ধর্ষণ বিশেষ কোনো শান্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত নয়। কারণ এগুলো সেখানে নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার।

জনৈকা আমেরিকান নারী সাংবাদিক হেলসান স্টানসাব্রি ভ্রমণের উদ্দেশে কায়রো আসেন। প্রায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অবস্থান করেন। তিনি কায়রোর বিভিন্ন মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান; নারী, পুরুষ ও শিশু-সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা ইত্যার্ণ পরিদর্শন করেন। তার রিসার্চের মূল বিষয় ছিল পরিবার, সমাজ ও না পুরুষের বিভিন্নমুখী সমস্যা, উৎপত্তি ও উত্তরণ। ভ্রমণশেষে দেশে ফেরা সময় নিজে একজন খাঁটি পশ্চিমা হয়েও নারী হিসেবে নারী জাতির প্রতি মমত্বের সাক্ষর রেখে গেছেন একটি সরল সত্যকে অকপটে স্বীকার করার মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন,

সমাজের পক্ষে এটাই কল্যাণকর হবে যে, তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকবে। এখানে নারী পুরুষের মাঝে যে যৌজিক ব্যবধান ও সীমারেখা রাখা হয়েছে তা কোনোভাবেই মন্দ নয়। এই কয়দিনে এই সমাজের প্রতি আমার অন্তরে যে মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকেই একজন নিঃস্বার্থ হিতাকাজ্জী হিসেবে বলছি, আপনারা আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করুন। আপনারা অবাধ মেলামেশা থেকে বিরত থাকুন।

"মুসলিম আরবসমাজ নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ সমাজ। এই

১. সুরাখুল ফিতরাহ : ৬৩।

মিথ্যে স্বাধীনতার নামে মেয়েদের বাধা বন্ধনহীন ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের দিকে ঠেলে দেবেন না। সত্যি বলতে কি, আপনারা আপনাদের সেই পর্দাপ্রথাকেই ফিরিয়ে আনুন। ইউরোপ আমেরিকার উদারবাদ, বাধা বন্ধনহীনতা ও আধুনিকতা থেকে এটা শত গুণে ভালো। আপনারা অবাধ মেলামেশাকে প্রতিহত করুন। এটা আমেরিকার জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। আমেরিকান সমাজ এখন একটা জড় সমাজ। সেখানে লাম্পট্য ইতরতা ছেয়ে গেছে। সেখানে শুধু অবাধ মেলামেশা ও মিথ্যে স্বাধীনতার বলি হয়ে অসংখ্য সম্ভাবনা ঝরে যায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত।"

কুয়েতের 'জারিদাতৃস সিয়াসিয়্যাতিল কুয়েতিয়্যাহ' পত্রিকার উদ্যোগে জনৈকা জার্মান নারীর একটি সাক্ষাতকার প্রচার করা হয়। সন্দেহ-নিরসনের জন্য বলছি, ওই নারী একজন অমুসলিম। সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছেন:

'আপনার দৃষ্টিতে নারীর সুন্দরতম অবস্থানক্ষেত্র কী হতে পারে?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'ঘর।'

একজন পশ্চিমা নারীর মুখে এমন উত্তর শুনে মুসলিম নারী সাংবাদিক কিছুটা হতচকিত হন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন:

'আপনি কি মনে করেন, সব সময়ই ঘর নারীর জন্য আদর্শ জায়গা?'

তিনি এবার আরও দৃঢ়তার সাথে বললেন:

'হাঁ, আমি মনে করি, সব সময়ই ঘর নারীর জন্য আদর্শ জায়গা।'

এবার সাংবাদিক জানতে চাইলেন:

'ঘরের বাইরে কর্মরত হওয়ার ব্যাপারে কী বলেন?'

অতিথিনী এবার বললেন:

'মৌলিকভাবে নারীর সৃষ্টি এজন্য নয়।'

সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন:

'তাহলে সমাজগঠনে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে কী করে?'

১. রিসালাতুন ইলা হাওয়া : ৪/১২০।

অতিথিনী বললেন:

'সমাজগঠনে নারী পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য, আমি মনে করি না, বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজন আছে। অন্যভাবেও সেটা হতে পারে। নারী পুরুষকে একটি সুখময় শান্তিময় পরিবার উপহার দেবেন। ঘরের বিষয়ে তাকে নিশ্চিন্ত রাখবেন। সুখে দুখে পাশে থাকবেন। অর্জনে উপার্জনে সাহস ও প্রেরণা যোগাবেন। ছেলেমেয়েকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবেন। নারী বাইরে গিয়ে কাজ করে সামাজিকভাবে যে উন্নতি সাধিত হবে, এভাবে তারচে অনেক অনেক গুণ বেশি হবে। আমি এ কথাটি আবেগে তাড়িত হয়ে বলছি না। জীবনের তিক্ত বাস্তবতা থেকে বলছি। মূলত নারী বাইরে গিয়ে কাজ করে হয়তো আর্থিকভাবে কিছুটা স্বনির্ভরতা পাবেন; কিন্তু পুরো সমাজ এবং সার্বিকভাবে পুরো নারী জাতি নিঃসন্দেহে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা আমরা হাডে হাডে টের পাচ্ছি।'

বিখ্যাত বৃটিশ লেখিকা লেডি ব্লাওন্ট তার বিখ্যাত 'আসলুল জিনস ওয়া তৃবিআতৃহ' গ্রন্থে লিখেছেন,

'পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই জীবনে সবল। আগেও ছিল। এখনো আছে। পরেও থাকবে। আমরা যতই চেষ্টা করি, এই প্রকৃতিকে বদলাতে পারব না। প্রথাবদলের ডাক দিয়ে বা সভা-সেমিনারের মহড়া করে কোনো লাভ নেই। পুরুষ সবল। সবলই থাকবে। নারী দুর্বল। দুর্বলই থাকবে।'

বিখ্যাত ইংরেজ নারী গল্পকার ও ঔপন্যাসিক উজাসা ক্রিস্টি বলেন,

'সত্যি বলতে কি, এখনকার নারীই বোকা। শ্রম অধিকার ও সম-অধিকার পাওয়ার জন্য সে কত খাঁটুনিই না খাটল। কিন্তু ফল কী হলো? আমাদের স্বীকার করতেই হলো, পুরুষের তুলনায় আমরা দুর্বল। সাথে সাথে পুরুষের সাথে কাজ করতে হচ্ছে, ঘাম ঝরাতে হচ্ছে। অথচ এতটা কাল এটা ছিল শুধু পুরুষের কর্তব্য। ...

আমাদের পূর্ববর্তী নারীরাই চালাক ছিল। তখন নারী পুরুষকে আশ্বস্ত রেখেছিল যে, সে দুর্বল; সে সব সময় পুরুষের স্লেহ ও ভালোবাসার পাত্রী; সে সবসময় পুরুষের আদর চায়, আহ্রাদ চায়। ...

১. সুরাখুল ফিতরাহ : ১৩।

তখন পুরুষই ছিল পরিবারের মাথা। পুরো পরিবারের সুখের জন্য মৌলিকভাবে দায়িত্বশীল ছিল পুরুষই। কিন্তু আজ কী হচ্ছে? নারী স্বাধীনতা চায়। পুরুষের অভিভাবকত্বকে আধিপত্য বলে লক্ষঝক্ষ করে, অভিভাবকত্ব মানে না। আন্দোলন করে—দুর্বার আন্দোলন। কিন্তু পুরুষের অভিভাবকত্বকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে স্বাধীনতা পায়; সে আর-এক ভাগ্যবিভূম্বনা।...

নারী বাধ্য হয় সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে। এখন তাকে সবখানে নামতে হয়। যা তার নামার মতো, তাতেও। যা তার নামার মতো নয়, তাতেও। ফল কী হয়? জীবন থেকে সুখ বিদায় নেয়, নারী নারীতু খোয়ায়।...

অথচ আগের জীবনধারায় পুরুষ ছিল নারীর সুখ ও সম্মানের অতন্ত্র প্রহরী।

জীবনের তিক্ততা পশ্চিমা নারীদের ঘোর কাটিয়েছে। তাদের টনক

প্রিয় বোন,

নড়েছে। তারা এখন প্রকৃতির কোলে ফিরে আসতে চান। কিন্তু পারেন না। তারা এখন অকপটে নারী ও নারীপ্রকৃতিকে স্বীকার করছেন। সেই সাথে পশ্চিমা সভ্যতার নারীস্বাধীনতার স্বরূপও উন্মোচন করছেন। তারা চিৎকার করে বলছেন, তারা একজন পুরুষের কর্তৃত্ব (অভিভাবকত্ব ও তত্ত্ববধান) থেকে বাঁচতে গিয়ে—হোন তিনি স্বামী, পিতা কিংবা ভাই— অনেক পুরুষের সেবা ও যৌনদাসীতে পরিণত হয়েছেন।

সুতরাং নারীস্বাধীনতার প্রবক্তাদের বলি, মুসলিম নারী তো আপনাদের কাছে গিয়ে কখনো পরাধীনতার অভিযোগ করেনি, কখনো কোনো কষ্টের অনুযোগও করেনি, তা হলে এই উপযাচকতা কেন? এত দয়া আপনাদের? তা হলে শুনুন, মুসলিম নারীর কোনো কষ্ট নেই শুধু আপনাদের উড়ে এসে জুড়ে বসা ছাড়া; দয়া করে আমাদের জীবনটাকে আর সংকীর্ণ করে তুলবেন না; আপনাদের জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি; আপনাদের কারণে যেখানে সেখানে পর্দানশীন নারীকে মুখ

ফিরে এসো নীড়ে

খুলতে হয় আপনাদের পশুপ্রবৃত্তির প্রশমনের জন্য। মুসলিম নারীর যদি কোনো অভিযোগ থেকে থাকে, তো এটাই তাদের অভিযোগ। দয়া করে আপনাদের সাহায্যের হাতটা গুটিয়ে নিন। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাদের সরল মেয়েদের মাথা খাওয়া বন্ধ করুন। ছলচাতুরি ছেড়ে দিন। নারী-স্বাধীনতার নামে নারীকে জীবন্ত দাসী বানানোর যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকুন। ইসলামের পর্দাপ্রথা থেকে আমরা মুক্তি চাই না। আপনাদের ফ্রাড খেলা থেকে মুক্তি চাই।

প্রাচ্যের নারীদের বলি, তোমরা ঘরে ফিরে এসো। আবার সেই পরিবার রচনা করো। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের চলা লেগে পশ্চিমা পদলেহীরা মুখ থুবড়ে পড়ুক। নারী-সংস্থা, নারী-সংগঠন ও নারী-আন্দোলনের নেতানেত্রীদের বলি, তোমরা আওয়াজ তোলো; উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ তোলো—মুসলিম নারী যেন ঘরে ফিরে আসে। আবার যেন ঘরের মালিকান হয়ে সম্মানের তাজ মস্তকে ধারণ করে। মুসলিম নারী আবারও স্বামীকে সুখী করাকেই জীবনের ব্রত বানিয়ে নিক। আনুগত্য ও ভালোবাসায় স্বামীর মনের সুখ ও চোখের শীতলতা হয়ে থাকুক। নারী তার সহজাত শ্রেহ, মমতা ও ভালোবাসা আবার ফিরে পাক—যা মিথ্যে প্রচারণার অপহরণে নিখোঁজ হয়ে গেছে। যার আশায় বুক বেঁধে আছে নিম্পাপ সন্তানেরা। যার প্রেরণায় একজন মা সন্তানের সুখে যাপন করেন বিনিদ্র রজনী। অফুরন্ত ভালোবাসায় সিক্ত করেন সন্তানের জীবনকে।

শ্বাধীনতার শ্বাদ আশ্বাদন করতে গিয়ে পশ্চিমা নারীদের যে করুণ পরিণতি হয়েছে, মুসলিম নারীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। নয়তো ওই দিন বেশি দূরে নয়, যেদিন এখানেও ওই একই অবস্থা বিরাজ করবে। ভাগ্যবান তো সে, যে অন্যের দেখেই শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু দুর্ভাগা সে, যে নিজে পতিত হওয়া ছাড়া সতর্ক হয় না।

প্রিয় বোন,

আল্লাহ আপনাকে চোখ দিয়েছেন দেখার জন্য। দয়া করে দেখুন। চর্মচোখে দেখুন, মর্মচোখে দেখুন, ইসলামী শরীআতের সুমহান জীবনদর্শন দেখুন। এ কোনো মানবরচিত জীবনবিধান নয়; এ স্রষ্টাপ্রদন্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এ সর্বময়, সর্বজনীন, সর্বকালীন। এ নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কর্ম ও কীর্তিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জানেন। আমরা জানি না।

ফিরে এসো নীড়ে

প্রিয় বোন,

এই বিশ্বাস ও মূল্যবোধ হৃদয়ে ধারণ করুন। কথাগুলো যখন বুঝে আসবে, এবং অবশ্যই বুঝে আসবে, তখনই এই ধর্মের, আপনার এই ধর্মের মাহাত্যা, আপনা-আপনি অনুধাবন করবেন অনায়াসে। অচিরেই

আপনার হৃদয়ে অনুরণিত হবে কবির এই কথাগুলো.

مَهْلًا فَمَا هَذَا الذِيْ
قد غَرُكُم إِلَّا سَرَابًا
أَوْلَا تروْنَ الغرْبَ كيف
غدَا الرحالُ به ذِئَابًا
ألَّا تَرونَ عُرَى
الأَخْلَاقِ تَنْشَعِبُ انشعابًا
إن تَرْغَبُوا لِيسَائِكُمْ
صَوْنا وعَيْشًا مسْتَطَابًا
فَدَعُوا السُّقُوْرَ لأهلِهِ
وأرْخُوا عَلَيْهِنَّ النِقَابًا

থামো, থামো!
এ কী করছ তুমি?
আলো আলেয়ার মরুভূমি—
এ যে ভ্রম, এ যে ধোঁকা!

দ্যাখো, দ্যাখো! ওখানে মানুষ অমানুষ, ওখানে পুরুষ পশু, হায়েনা; ওখানে চরিত্রের গিঁঠ ছেঁড়া ফাড়া; ওখানে মোহ, ওখানে মরীচিকা! চাও কি
মায়ের সম্মান,
বোনের সুরক্ষা,
সুন্দর সুখকর জীবন?
তবে থামো, আর ছুটো না,
আর ছুটে ছুটে ধুঁকে ধুঁকে মোরো না।

এ নগ্নতা বন্ধ করো পর্দাকে আঁকড়ে ধরো।

প্রিয় বোন,

আর কত ছুটবেন মরীচিকার পেছনে? এবার তো থামুন। এবার তো ফিরে আসুন। ফিরে আসুন আপনার প্রতিপালকের দিকে। ইসলামের ছায়াদার ফলদার ফুলদার বৃক্ষের নিচে। এখানে অবলোকন করুন একা সুন্দর পৃথিবী। এখানে উপভোগ করুন একটি সুন্দর জীবন।

জেনে রাখুন, এখানে কালের গর্ব আপনি, আপনি মুসলিম নারী এখানে সৃষ্টির অহংকার আপনি, আপনি মুমিন নারী। আপনারই ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে এখানকার উম্মাহর ভবিষ্যৎ—আমাদের নতুন প্রজন্ম। এবার অবিচল মনে আর একবার হৃদয়ে আওড়ান আমাদের প্রিয় প্রভূর মহা বাণী,

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَتَّ وَالْبَاطِلَ ﴿ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاءٌ ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْاَرْضِ * كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ

অর্থ : এভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন সত্য ও মিখ্যার। আবর্জনার
কেনা নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যা মানুষের জন্য উপকারী তা
ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ তুলে ধরেন সুন্দর দৃষ্টান্ত। −সূরা
রাদ : ১৭

ষোড়শ অধ্যায়

আমাদের প্রত্যাশা

যার প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হবে মুসলিমপরিবার। যার প্রতিটি সদস্য আল্লাহর আনুগত্যে হবে ঐক্যবদ্ধ। মা বাবার স্লেহ-ছায়া বিরাজমান

আমাদের প্রত্যাশা—পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ, পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সমাজ।

তাদের মাথার ওপর। তারা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যে উদ্বৃদ্ধ। মা বাবার ভালোবাসা তাদের ঘিরে থাকে সর্বক্ষণ। নতুন প্রজন্ম বেড়ে ওঠে

আগামী দিনের মহৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণে। তারা গড়তে চায় মুসলিম কীর্তিপ্রাসাদ। যা সুউচ্চ, শানদার। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে লা ইলাহা ইল্লাহর ঝাণ্ডাকে বলন্দ করার জন্য। ইসলামের হারানো গৌরর ও

ইলাহা ইল্লাহর ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করার জন্য। ইসলামের হারানো গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য। আমরা একটি মুসলিম সমাজ চাই। যেখানে ভালোবাসা হয় আল্লাহর

আমরা একাট মুসালম সমাজ চাই। যেখানে ভালোবাসা হয় আল্লাহর জন্য, রাস্লের জন্য এবং মুমিনদের জন্য। যেখানে মহান আল্লাহর এই বাণীর পাই সফল বাস্তবায়ন:

لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْتُرِيْدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطْنَا مُّبِيْنًا

অর্থ : হে ওই সব লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তোমরা কি নিজেদের

বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাও? –সূরা নিসা : ১৪৪

ফিরে এসো নীড়ে

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন,

لَيَّاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

অর্থ : হে ওই সমস্ত লোকেরা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আমার শক্র এবং তোমাদের শক্রদের বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না। তোমরা তাদেরকে ভালোবাসা দেখাবে? অথচ রাসূল যে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, তারা তা অস্বীকার করে। –সূরা মুমতাহিনা : ০১

আমরা এমন একটি সমাজ চাই যার মূল ভিত্তি হলো—আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসা। যা সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামিমুক্ত। মহান আল্লাহর বাণীর বাস্তবায়নে—

وَاغْتَصِهُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَانَقَذَكُمْ مِنْهَا كُذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْيِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ : তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরো। তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে একে অপরের শক্র। আল্লাহ তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করলেন। তার নেয়ামতে তোমরা হলে ভাই ভাই। স্মরণ করো, তোমরা ছিলে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে। তিনি তোমাদের রক্ষা করলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেন। হয়তো তোমরা দিশা পাবে। –সুরা আল ইমরান: ১০৩

প্রিয় রাসূলও বলেছেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ حَتَى تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا

অর্থ : ওই সন্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। তোমরা কিছুতেই ঈমান আনতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে ভালোবাসবে।

১. সহীহ মুসলিম।

আমরা একটি মুসলিম সমাজ চাই যা পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক মায়াবোধ এবং পারস্পরিক সম্পর্কবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুভূতি যেখানে জাগ্রত সদাসর্বদা—

ٱولُوا الْاَزْ حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُهْجِرِيْنَ اِلّآ اَنْ تَفْعَلُوٓا اِلَى اَوْلِيْئِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُوْرًا

অর্থ : যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক আছে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সাধারণ মুমিন মুহাজিরের চাইতে তারা একে অপরের প্রতি অধিক হকদার। তবে তোমরা বন্ধুবান্ধবের প্রতি যে সদাচার করবে, তা আল্লাহর কিতাবে অবশ্যই লিপিবদ্ধ থাকবে। –সূরা আহ্যাব : ০৬

আমরা এমন একটি সমাজ চাই যা সুন্দর সুনির্মল চরিত্রমাধুরী এবং সুউচ্চ সুমহান মূল্যবোধে ভাস্বর। সততা, সত্যতা, আমানতদারি, বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও বিসর্জন, বীরত্ব ও সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতা; আন্তরিকতা-একনিষ্ঠতা, কৃতজ্ঞতা-কৃতার্থতা, ক্ষমা ও মার্জনা এবং ন্যায় ও সুন্দরে সজ্জিত একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ। এমন একটি সমাজ, যাকে গতিশীল করে মহৎ গুণাবলি, উন্নত আদর্শ। যেখানে চরিত্রের পবিত্রতায় আরোপিত কড়া প্রহরা। যেখানে চরিত্রই ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রথম প্রহরী। কবির ভাষায় বলতে হয়,

فإنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُم ذَهَبُوا

অর্থ : যদি তাদের চরিত্র নষ্ট হয়, তা হলে তাদের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

আমরা একটি ইসলামী সমাজ চাই। যেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার নিশ্চিত। যেখানে জোর নেই, জুলুম নেই। অনিয়ম নেই, অনাচার নেই। যেখানে পারস্পরিক কর্ম ও লেনদেন সম্পাদিত হয় মহান আল্লাহর এই বাণীর সফল বাস্তবায়নে—

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُوْنُوا قَوْمِيْنَ بِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الَّا تَعْدِلُوا 'إِعْدِلُوا هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُوٰى "واتَّقُوا اللَّهَ 'إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

ফিরে এসো নীড়ে

অর্থ: হে ওই সমস্ত লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্য প্রদান করো। কারও প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের অন্যায়ে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়ের সাথে কাজ করো। সেটাই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিকয় আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। –সুরা মাইদাহ: ০৮

অপরাধপ্রবণতা নেই। লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতা নেই। যেখানে প্রত্যেকে ধর্মীয় নীতিমালা এবং উন্নত চরিত্রমাধুরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের, প্রকারান্তরে সমাজের কল্যাণকামী। যেখানে আমিতৃ, ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুগামিতা বিসর্জিত। যেই সমাজের প্রতি আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য অনিবার্য। যেমনটি মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

আমরা একটি পবিত্র ও সভ্য সমাজ প্রত্যাশা করি। যেখানে

وَعَنَ اللهُ الَّذِيْنَ المَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الشَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الَّذِي الْآرُضِ كَمَا السَّخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُعَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَظٰى لَهُمْ وَ لَيُعَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَظٰى لَهُمْ وَلَيْكَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَظٰى لَهُمْ وَلَيْكَ لَهُمْ وَيُنْهُمُ اللَّهُ مِنْ كَوْنَ بِنُ شَيْئًا مُ مَنْ كَفَرَ لِيُشْرِكُونَ بِنُ شَيْئًا مُ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِكِكَ هُمُ الفَيسِقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِكَ فَأُولِكَ هُمُ الفَيسِقُونَ

অর্থ : আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে, তিনি তাদেরকে জমিনে দান করবেন খেলাফত, যেভাবে খেলাফত দান করেছিলেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের। এবং প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের জন্য তার মনোনীত ধর্মকে। আর ভীতির পরিবর্তে তাদের দান করবেন স্বস্তি। তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু এরপরও যারা কুফরি করবে, তারাই পাপাচারী। –সূরা নূর: ৫৫

আমরা একটি ইসলামী সমাজ প্রত্যাশা করি। সেখানে কিছু প্রাণবন্ত ও উৎসাহী কর্মপুরুষ কামনা করি। যাদের রক্তে আছে আল্লাহর ভালোবাসা এবং ধর্মীয় আবেগ। ধর্মীয় চেতনায় যারা স্বতঃক্ষূর্ত। ইসলামের সম্মানে যাদের রক্ত টগবগ করে। সাহসিকতা যাদের বৈশিষ্ট্য। অগ্রগামিতা যাদের পরিচয়। যারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না। যারা তিরস্কারের পরোয়া করে না। কেননা, তারা এক আল্লাহয় বিশ্বাসী। তারা ভালো করে জানে, আল্লাহই রিজিকদাতা, লালনকারী; তিনিই অভিভাবক, রক্ষাকারী; তিনিই ব্যবস্থাপক, সাহায্যকারী।

আমরা এমন একটি সমাজ প্রত্যাশা করি, যার নেতৃত্ব দেবেন একজন মর্দে মুমিন। একজন সাচ্চাদিল মর্দে মুমিন। একজন জিন্দাদিল মর্দে মুমিন। যিনি বিপদের মোকাবেলা করতে জানেন নির্ভয়ে। যার মনোবল সুউচ্চ পর্বতের মতো অটল, অবিচল। চরম উত্তাল পাগলা হাওয়ায় যিনি ভেঙে পড়েন না। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী, চির কুশলী। রোমাঞ্চকর অগ্রযাত্রায় যিনি সফল নাবিক। হাজার ঝড়ঝাঁপটায় যার হৃদয়ের প্রদীপ্ত শিখা অনির্বাণ। যিনি কখনো অথৈর্য হন না। আল্লাহর ফায়সালার প্রতি যার মন প্রাণ চিরসমর্পিত, সর্বাবস্থায় সম্ভষ্ট। জীবনের অগ্নিপরীক্ষাকে যিনি মনে করেন হৃদয়াত্রার পরিশুদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ। যিনি অনুভব করেন, জীবনের কষ্ট ক্রেশ যেন প্রভাতশিশিরের মতো সুনির্মল, যা তাকে পৃথিবীর মায়া মোহ থেকে পবিত্র করে নিত্যদিন; কিংবা ডেইজি ও লিলি ফুলের মতো সুকোমল, যা হৃদয়ে প্রশান্তির শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দেয় নরম ছোয়ায় অষ্টপ্রহর; কিংবা মৃদুমন্দ পুবালি বাতাসের মতো নরম ও ফুরফুরে, যা হৃদয় ছুয়ে যায় অনির্বচনীয় প্রাণবন্ততায় ক্ষণে ক্ষণে।

আমরা একটি মুসলিম সমাজ প্রত্যাশা করি। যেখানে পুরুষ একজন স্নেহশীল পিতা। করুণার আধার। মমতায় ভরা। যার হৃদয় জুড়ে সন্তানের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। যিনি বুদ্ধিদীপ্ত। চিন্তাশীল। প্রজ্ঞাবান। সন্তানের জন্য যেন আলোর মশাল। বিজ্ঞ পথপ্রদর্শক। বিচক্ষণ তত্ত্বাবধারক। বিপদে আপদে সন্তানের ভরসা। মাথা গোঁজার নিরাপদ আশ্রয়।

আমরা একটি ইসলামী সমাজ চাই। যেখানে পুরুষ একজন বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গী। যার ভালোবাসা স্ত্রীকে ছুঁয়ে থাকে সর্বক্ষণ। যিনি নারীর দুর্ভেদ্য দুর্গ। প্রেমময় স্বামী। স্ত্রীর প্রতি ধেয়ে আসা যে কোনো বিপদকে তিনি প্রতিহত করেন প্রাণপণে। তাকে সুরক্ষিত রাখেন যে কোনো অত্যাচার, অনাচার থেকে। তাই অগাধ আস্থা, অগাধ ভক্তি, অগাধ ভালোবাসা ন্ত্রীর হৃদয়ে জাগায় স্বর্গশিহরণ। পূর্ণ অভয়, পূর্ণ শান্তি স্ত্রীর হৃদয়কে রাখে স্থির, প্রশান্ত।

যিনি সদাচারী। সদালাপী। যার সাহচর্যে ধন্য হয় নারী। ধন্য হয় নারীর জীবন। সে খুঁজে পায় অনাবিল শান্তি। অপার্থিব সুখ। দাম্পত্যজীবনের দায়ভারে যিনি স্ত্রীর প্রতি বাড়িয়ে দেন অবারিত সহযোগিতার হাত। তাকে দিতে চান সর্বোচ্চ সহজতা। যাতে মুসলিমপরিবার পায় পূর্ণতা। হয় দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ। যুগের ঝঞুাবায়ুতে সুস্থির। কুচক্রীরা ফিরে যায় ব্যর্থ মনোরথে।

মুসলিম যুবসমাজের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যাশা ঈমানী গুণ ও চারিত্রিক মাধুর্যে বিশিষ্ট একটি যুবসমাজ। যারা ইসলামের পরিচয় বহন করে। ইসলামের আদর্শ স্থাপন করে। এবং ইসলামকেই জীবনের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে। যারা বিশ্বাস করে,

وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِناً فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থ : যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে ধর্ম হিসেবে পেতে চায় তা হলে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হঞ্ ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। −সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

আমরা এমন একটি যুবসমাজ প্রত্যাশা করি, যারা ইসলাম ও ইসলার্ম বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয়ী। নিজের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি যারা গর্ব বোধ করে। কবির ভাষায়

> لَا تَسَلُ عَنْ جِنْسَيَّتِيْ عَنْ نَسَبِي إنَّمَا الإسلامُ أَ مِّي و أَبِيْ

কী মোর বর্ণ, কী মোর বংশ—না জানি। জানি, ইসলামই পিতা, ইসলামই জননী।

আমরা এমন যুবক প্রত্যাশা করি, যে কিতাবুল্লাহকে আঁকড়ে থাকে। রাসূলের আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন কামনা করে। যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। যার সমগ্র সন্তা জুড়ে তাকওয়া, খোদাভীতি, উত্তম চরিত্রমাধুরী। যে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত। অভাবী দুখীর সাহায্য সহযোগিতায় অবারিত। অত্যাচারীর ভয়। অত্যাচারিতের আশ্রয়। সময় সম্পর্কে সচেতন। কর্তব্যপরায়ণ। সে জানে, মানে, তার অনেক দায়; কিন্তু সময় সামান্য।

সে কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাসী। ঐশী বিধান অনুসারে নতুন করে ইসলামী জীবনযাপনের প্রত্যাশী। কর্ম ও চেতনায় মুক্ত স্বাধীন। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকর নয়। সে আল্লাহর বাণী ও রাসূলের আদর্শ অনুসরণে চলে নিজ পথে, নিজ মতে, আপন গতিতে; মহান আল্লাহর আলোয় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে। তিনিই তো আসমানসমূহ ও জমিনের আলো। তাই তো পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

اَللَّهُ نُورُ السَّلْوَتِ وَ الْاَرْضِ مُمَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الذُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوكَبُّ دُرِيٌّ يُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّلْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّةٍ 'يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ 'نُورٌ عَلى نُورٍ 'يَهْدِى اللَّا لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ لُو يَضْرِبُ اللهُ الْاَمْقَالَ لِلنَّاسِ لُواللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থ : আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের আলো। তার এ আলোর দৃষ্টান্ত—যেন একটি দীপাধার। যাতে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রাখা আছে স্বচ্ছ কাচের পাত্রে। কাচের পাত্রটি যেন কোনো উজ্জ্বল নক্ষত্র। জ্বালানি পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তেল। যা শুধু পূর্বের বা পশ্চিমের আলোকপ্রাপ্ত নয়। এ তেল এত স্বচ্ছ—যেন আগুনের স্পর্শ ছাড়াই জ্বলে উঠবে। এ তো আলোর ওপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এ আলোর দিশা দেন। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত। –সুরা নুর: ৩৫

এমন যুবক, যে জমিনে বিচরণ করে; কিন্তু তার হৃদয় থাকে আরশে আজিমে। কেননা, সে হৃদয়ে জাগ্রত জিহাদি চেতনা। ধমনীতে নেশা শাহাদাতের। ফিরিয়ে আনতে চায় আজানের সুর। আকসার আজানখানা থেকে যার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হবে কুদসের আকাশে বাতাসে। প্রকম্পিত করবে সারা পৃথিবীর তাগুতি তাকতের ভিত। আকসার মিম্বার, আকসার গমুজ আনন্দে ঝলমল করে উঠবে আবার। আবার উচ্চারিত হবে আল্লাহর নাম, প্রিয়তম মুহাম্মাদের নাম। ব্যথাভারাক্রাস্ত হৃদয়ে জ্বালাবে আশার আলো। ফিলিস্তিনের বিধবা, এতিমের মুখে ফোটাবে

বিজয়ের হাসি।

ফিরে এসো নীড়ে

এমন যুবক, যার হ্বদয় উৎসুক হয়ে আছে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে। যার দৃষ্টি প্রসারিত আসমানে। প্রত্যয়ে ছুয়ে যায় সুরাইয়া। রাতের ইবাদতগুজার। দিনের ঘোরসওয়ার।

এমন যুবক, যে বাস্তবতায় বিশ্বাসী। জ্ঞান ও যোগ্যতায় বিশ্বাসী। ভূলে যায় না যে, সে মায়ার পৃথিবীতেই আছে। সুতরাং কল্পনার ডানায় ভেসে বেড়ানো এবং দিবাম্বপ্লে বিভোর থাকার মানসিকতা তার নেই। সে শ্রমহীন ও সাধনাহীনভাবে নিছক অতীতের গুণকীর্তন করে জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে না। বরং নিজের সমগ্র শক্তি ও সামর্থকে ব্যয় করে কাজ করে। জ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে—যোগ্য নেতৃত্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে, ইসলামের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে, পৃথিবীতে পুনরায় মুসলিমজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। সে বিশ্বাস করে, পরিবেশ পরিস্থিতি সব সময় একই থাকে না। সময়ের ব্যবধানে প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন.

كَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ..

অর্থ : আর আমি মানুষের মাঝে উত্থান পতনের দিনগুলো অদলবদল করাতে থাকি। -সুরা আলি ইমরান: ১৪০

এমন যুবক, যে ঐক্যবদ্ধতা পছন্দ করে। আত্যুকেন্দ্রিক নয়। সে বিশ্বাস করে, নিখুঁতভাবে একা একা কাজ করার চাইতেও খুঁতসহই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা পরিণাম-বিচারে ভালো। সে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করে। মহান আল্লাহর দরবারে ঐক্যবদ্ধ প্রার্থনা জানায়,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

অর্থ : হে আল্লাহ আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। -সূরা ফাতিহা: 08

যেন উদার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র তারা। তারা সোনার হরফে লিখে দেয় ত্যাগের মহিমাগাখা। জাতিকে উপহার দেয় সুস্পষ্ট বিজয়। ইসলাম পুনপ্রতিষ্ঠিত হয় আপন মহিমায়। শক্ররা হাসে উপহাসের হাসি। ভাবে, এ অসম্ভব। কিন্তু সে আশায় বালি ঢালে ঈমানদীপ্ত অরুণ বরুণ তরুণেরা।

মুসলিমসমাজে একজন মুসলিম নারীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা— তিনি একজন আদর্শ মা হবেন। ঈমান ও বিশ্বাসে বলীয়ান। দৃঢ়চিত্ত, সুউচ্চ মনোবলসম্পন্ন। যিনি হযরত খানসা রাযিআল্লাহু আনহার আদর্শে উজ্জীবিত। যেই খানসা রাযি. টগবগে যুবক চার ছেলেকেই কাদিসিয়া যুদ্ধে সমবেত করে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এই বলে:

اِعْلَمُوْا أَنَّ الحَيَاةَ الدُنْيَا فَانِيَةٌ وَأَنَّ الآخرةَ خَيْرَ وَأَبْقَى فَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتَّقُوا اللهَ لعلَّكم تُفْلِحُون

অর্থ : তোমরা জেনে রেখো, এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। াখেরাতই উত্তম। আখেরাতই চিরস্থায়ী। সুতরাং ধৈর্য ধরো। ধৈর্যের তিযোগিতা করো। এবং শক্রুর মোকাবেলায় অবিচল থেকো।

যখন কাদিসিয়া যুদ্ধে চার সন্তানই শহীদ হওয়ার সংবাদ পেলেন তখন স্থিরচিত্তে হযরত খানসা রাযি. শুধু এ কথা বললেন,

ٱلحُمْدُ للهِ الذيْ شرَّفَنِيْ بِقَتْلِهِمْ فِي سبيلِ اللهِ وأرْجُو مِن اللهِ أَن يَجْمَعَنِيْ بِمِم فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি ফী সাবীলিল্লাহ আমার ছেলেদের শাহাদাতের সুধা পান করিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আশা করি, আমার আল্লাহ আমাকে এবং আমার চার সন্তানকে তাঁর রহমতের আশ্রয়ে আবার একত্রিত করবেন।

আমাদের প্রত্যাশা—মুসলিম নারী হবেন একজন রত্নগর্তা। যিনি কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী সন্তানের লালনপালন করেন। সাদ, খালিদ, তারিকের মতো মর্দে মুমিন জাতিকে উপহার দেন।

১. আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ : ৯৭।

ফিরে এসো নীড়ে

আমাদের প্রত্যাশা—মুসলিম নারী হবেন একজন বৈর্যশীলা কঠিন প্রত্যয়িনী বোন। বিপদে ভেঙে পড়েন না। যার সাহস আকাশচুমী। খাওলা বিনতে আযওয়ারের মতো। আজনাদাইনের যুদ্ধে দ্রাতা যিরারের বন্দি হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন তা মুসলিম নারীর প্রেরণা হয়ে থাকবে চিরকাল। সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বয়ং যিরারকে মুক্ত করতে গিয়েছিলেন যেখানে।

দিখিজয়ী বীর, মুসলিম সেনাপতি, আল্লাহর তরবারি—খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. মুসলিমবাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন তিরবেগে। হঠাৎ দেখা যায় অবগুণ্ঠিত এক অশ্বারোহী। অশ্ব হাঁকিয়ে ছুটে চলেছেন ধুলোধুসরিত দূর দিগন্তে। তিনি ছুটছেন তো ছুটছেন। পেছনে ভ্রুম্কেপ করছেন না। মুসলিমবাহিনীর পশ্চাদগমন লক্ষ করেও না। মুসলিমবাহিনী রোমসৈন্যদের ভিড়ে ঢুকে পড়ল এবং হামলা চালাল। মুসলিম লড়াকুদের সাথে অবগুণ্ঠিত অশ্বারোহীও কতল করে চলেছেন অগণিত রোমক যোদ্ধাকে। ...যুদ্ধ শেষ হলো।

মুসলিম যোদ্ধাগণ অবগুষ্ঠিত অশ্বারোহীর পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু তিনি চলে যাচ্ছেন। পেছনে ক্রুক্ষেপ করছেন না। এবার সেনাপতি খালিদ রাযি. কসম দিয়ে পরিচয় ব্যক্ত করতে বলেন। এবার ফিরে তাকান অশ্বারোহী। অবগুষ্ঠনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে তেজোদীপ্ত নারীকণ্ঠ। বলেন,

"হে মহামহিম সেনাপতি, আমি আপনাকে উপেক্ষা করে চলেছি শুধুমাত্র লজ্জায়। আপনি একজন মহিমান্বিত বীর সেনাপতি। আর আমি এক নগন্য অন্তঃপুরবাসিনী। পর্দানশীন। আল্লাহর কসম, আমার দগ্ধ হৃদয়ই আমাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করেছে।"

অবাক বিস্ময়ে সেনাপতি খালেদ রাযি. বলেন, "কে আপনি? কী আপনার বৃত্তান্ত?"

তিনি বলেন, "আমি খাওলা বিনতে আযওয়ার। আমি গোত্রের অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথেই ছিলাম। কিন্তু আমার দ্রাতা যিরারের বন্দি হওয়ার সংবাদ শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। তাই অশ্বে আরোহণ করে ছুটে এসেছি এবং যা করার করেছি।" সেনাপতি খালিদ চিৎকার করে বলেন, "বোন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আমাদের সমগ্র শক্তি দিয়ে হামলা চালাব। ইনশাআল্লাহ, আমরা আমাদের ভ্রাতাকে মুক্ত করে আনবই।"

মুসলিমসমাজে আমাদের প্রত্যাশিত মুসলিম তরুণী হবে ঈমান ও বিশ্বাসে গৌরবান্বিত। ধর্ম ও ধার্মিকতায় মহিমান্বিত। হবে মুক্তমনা। হবে স্বাধীনচেতা। তবে পাগলা হাওয়ায় ভড়কে যাওয়া বেচারি নয়। বেপর্দেগির সয়লাবে ভেসে যাওয়া খরকুটো নয়। ঈমান ও হেদায়েতের বাতায়নে দেখা শাশ্বতিকী। হাজার হাঁক-ডাক-হুইসেলে, সহস্র শোরগোল কোলাহলে—সুস্থির, সুবিবেচক, সজ্ঞান, আপন সত্যে অটল, আপন বিশ্বাসে অবিচল। মাধুরী তার ঈমান। মূলধন তার লজ্জা ও সৎ চরিত্র। হিজাব ও পর্দায় গর্বিত। নেকাব ও জিলবাবে অপূর্ব, অনুপম।

কবির ভাষায়,

يَيْهِيْ بِتَاجِكِ وارْتَدِيْهِ شِعَارًا يَا لِلْحَبِيْنِ مُتَوَّجًا بِخِمَارِهِ مُتَحَدِّيًا بأسَ الطُغَاةِ جِهَارًا لا خَافِضًا رأسًا ولا خُوَارًا

মর্যাদার তাজ মন্তকে ধারণ করে,
আত্মপরিচয় স্থদয়ে লালন করে,
অবগুণ্ঠিত কপালে কপোলে
কারুহীন কালো সরল আঁচলে
তুমি শক্রর ভয়, দুর্বিনীত দুর্জয়;
ব্যর্থ তোমাতে ষড়যন্ত্র,
ব্যর্থ তোমাতে তন্ত্র-মন্ত্র।

আমাদের প্রত্যাশা—সে হবে স্বামীর অনুগতা প্রেমময়ী। হবে বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গিনী। সুথে দুখে পাশে থাকে। বিপদে আপদে সাথে থাকে। ভাবে ভাষায় আনে অন্তরঙ্গতা। জীবনসাথীর হৃদয়ভূমিতে বপন করে তাকওয়ার

১. ফতৃহশ শাম লিল ওয়াকিদী : ১/৭০-৭১।

বীজ। জীবনে হয় তার সুখের ঠিকানা। কৃতজ্ঞ, কৃতার্থ। অপ্লেতুষ্ট, সংযমী। বিশেষ কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। আছে স্বামীর সুখ ও সেবার প্রবল বাসনা। দাস্পত্যের উদ্যানে একটি ছায়াদার ফলদার ফুলদার তরুর মতো। সুশীতল, সবুজ, প্রাণবস্ত। পত্রপল্লবে আচ্ছাদিত। যার ছায়ায় স্বামী উৎসাহ পায়। চলার প্রেরণা পায়। পায় সুখময় গতিশীল জীবনের সন্ধান। ঘুমোতে পারে চোখ বুজে নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে।

সবশেষে আমরা মুসলিম নারীকে কামনা করি একজন একনিষ্ঠ দাঈয়া হিসেবে, যিনি কাজ করবেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। যদি শিক্ষিকা হন, তা হলে শিক্ষার্থিনীদের হৃদয়ভূমিতে ঈমান ও আকীদার চাষাবাদ করুন। বিদ্যালয়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অব্যাহত রাখুন। সত্যের আওয়াজ তুলুন। যত বাধাই আসুক। যত বিপত্তিই ঘটুক। কল্যাণের বারিধারা প্রবাহিত করুন যেখানেই থাকুন। চেতনা জাগ্রত করুন নারীসমাজে। তাওহীদের কথা বলুন। রিসালাতের কথা বলুন। আথেরাতের কথা বলুন। জানাতে সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের ভয় দেখান। নতুন প্রজন্মকে রক্ষা কর ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী সকল অপতৎপরতা থেকে।

আমাদের প্রত্যাশা—এমন একজন মুসলিম নারী, যিনি চারপাশে ঘথে যাওয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্ব বিষয়ে সচেতন। যিনি জীবন ও জগতের বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারেন। নানামুখী সমস্যা, উৎপত্তি, উত্তরণ উপলব্ধি করতে পারেন। প্রয়োজনীয় ধর্মীয় এবং সাধারণ উভয়বিধ জ্ঞান ও যোগ্যতায় যিনি পারদর্শিনী। যিনি মুসলিম সমাজগঠনে একটি কার্যকর উপাদান হতে, সারা পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল জাতির নারীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে—সদা প্রস্তুত। যিনি বিশ্বে যত নারীসংস্থা ও নারী-আন্দোলন গড়ে উঠেছে ধর্ম, চরিত্র ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে আন্তর্জাতিক নারী-আন্দোলনকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করার প্রত্যাশী। কেননা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সর্ব বিষয়ের সুন্দরতম সমাধান দেয় ইসলামই। ইসলামই মানবতাকে রক্ষা করতে পারে মহাপতনের হাত থেকে। ফিরিয়ে আনতে পারে পতনোন্মুখ মানবতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ المَنُوا مِنْكُمْ وَ عَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّلِخُكَفَ الَّذِيْنَ المَنْوَا مِنْكُمْ وَ عَبِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَ الَّذِي الْرَتَظَى لَهُمْ وَ السَّتَخْلَفَ الَّذِي الرَّتَظَى لَهُمْ وَ السَّتَخْلَفَ الَّذِي الرَّيْفِي لَهُمْ وَ لَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي الرَّيْفُ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا أَوْ مَنْ كَفَرَ لَيُسْرِكُونَ فِي شَيْئًا أَوْ مَنْ كَفَرَ لَيْمُ الْفُسِقُونَ اللهِ اللهُ الله

অর্থ: আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে, তিনি তাদেরকে জমিনে দান করবেন খেলাফত যেভাবে খেলাফত দান করেছিলেন তোমাদের পূর্ববর্তীদের। এবং প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের জন্য তার মনোনীত ধর্মকে। আর ভীতির পরিবর্তে তাদের দান করবেন স্বস্তি। শর্ত হলো, তারা আমার ইবাদত করবে। আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। কিন্তু এরপরও যারা কুফরি করবে, তারাই পাপাচারী। –সূরা নূর: ৫৫

কবি বলেন,

خَسِىءَ الطَّلَامُ فَلَمْ يَزَلْ فَحْرُ الْهُدَى مِنْ أُفْقِ طَيْبَةٍ يُرْسِلُ الْأَنْوَازَا يُرْسِلُ الْأَنْوَازَا

কেটে যায় কালো ভোরের আভাসে, দিগন্তে হাসে উষার আলো

সমাপ্ত